বিশেষ সংখ্যা

ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

অক্টোবর ২০১৯ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ৩০

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার

স্বদেশি ও স্বরাজের মন্ত্রে দেশের উন্নয়ন
সুদর্শন আয়েঙ্গার

মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে গান্ধীর কাছে ফেরা
এম. পি. মাথাই

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী : পথ দেখাবেন গান্ধীজী
প্রেম আনন্দ মিশ্র

ফোকাস

গান্ধী : সমন্বয়-এর দিশারী
পি. এ. নাজারেথ

বিশেষ নিবন্ধ

স্বচ্ছাগ্রহের উজ্জ্বল শিখা
অক্ষয় রাউত

রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত ভাষণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি

(চিত্রসূত্র : পিআইবি)

৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রী থাওয়ারচন্দ গেহলোত, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অমিত খারে ও প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ড. সাধনা রাউতের উপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের নির্বাচিত ভাষণের ওপর দু'টি বই—'দ্য রিপাব্লিকান এথিক' (খণ্ড-২) ও 'লোকতন্ত্র কে স্বর' (খণ্ড-২)—প্রকাশ করছেন।

গত ৬ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লির প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের নির্বাচিত ভাষণের ওপর দু'টি বই—'দ্য রিপাব্লিকান এথিক' (খণ্ড-২) ও 'লোকতন্ত্র কে স্বর' (খণ্ড-২)—প্রকাশ করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রী থাওয়ারচন্দ গেহলোত, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অমিত খারে, প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ড. সাধনা রাউত, প্রমুখ।

এই নান্দনিক বিন্যাসে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংকলিত করার জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং প্রকাশন বিভাগকে সাধুবাদ জানান। উপ-রাষ্ট্রপতি জানান যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের পাশাপাশি তার নিজেরও অভিমত যে জননেতাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মূল্যবোধ ও নীতির আদর্শ তুলে ধরা। তিনি আরও জানান যে, তাদের দু'জনেরই দৃষ্টিকোণে দেশের জন্য অগ্রাধিকারের বিষয়গুলির অন্যতম "স্বচ্ছ ভারত, শিক্ষিত তথা দক্ষ ভারত, উদ্ভাবনী ভারত, সুস্থ (ফিট) ভারত এবং ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী ও ক্ষমতায়িত ভারত।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী থাওয়ারচন্দ গেহলোত বলেন যে বইয়ে সংকলিত ভাষণ থেকে প্রতিফলিত হয় যে রাষ্ট্রপতি সামাজিক ন্যায়ের প্রতি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি শ্রী রামনাথ কোবিন্দকে 'জনগণের রাষ্ট্রপতি' আখ্যা দেন। শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, সুষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতিসাধনের মতো বিষয়গুলি তার ভাষণে উঠে এসেছে বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন শ্রী গেহলোত। রাষ্ট্রপতি নিজের জীবনে যেসব সমস্যার মোকাবিলা করেছেন, তা নিয়েও আলোচনা করেন মন্ত্রী।

সব নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় সুনিশ্চিত করা নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাবনার কথা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে শ্রী কোবিন্দের নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধ্যানধারণা আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি; সেই সঙ্গে আছে সামাজিক পরিবর্তনে ভবিষ্যৎ-মুখী শিক্ষার ভূমিকার ওপর অগাধ বিশ্বাসও। এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রকাশন বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন শ্রী জাভড়েকর।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন একাধিক সাংসদ, বিদেশি কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের সচিব ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক।

অক্টোবর, ২০১৯

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : শামিমা সিদ্দিকী
উপ-অধিকর্তা : খুরশিদ এ. মালিক
সম্পাদক : রমা মন্ডল
সহ-সম্পাদক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
প্রচ্ছদ : গজানন পি. ধোপে

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- স্বদেশি ও স্বরাজের মন্ত্রে দেশের উন্নয়ন — সুদর্শন আয়েঙ্গার — ৫
- মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে গান্ধীর কাছে ফেরা — এম. পি. মাথাই — ১১
- হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী : পথ দেখাবেন গান্ধীজী — প্রেম আনন্দ মিশ্র — ১৫
- সার্ধশতবর্ষে মহাত্মার কথা — প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০
- প্রাতঃস্মরণীয় গান্ধী, বিস্মৃত তাঁর রাজনীতির ভাষা — কিংশুক চট্টোপাধ্যায় — ২৪
- মহাত্মা গান্ধী এবং শ্রমের মর্যাদা — রামচন্দ্র প্রধান — ২৭
- শান্তির পরিপ্রেক্ষিত : গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি — ডি. জন চেল্লাদুরাই — ৩০
- আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী গান্ধী — জি. এল. মেহতা — ৩৪
- জনসংযোগেও গান্ধীজী অদ্বিতীয় — ওয়াই. পি. আনন্দ — ৩৭
- জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথ — এ. আন্নামালাই — ৪২
- সমকালীন বিশ্বে স্বদেশির গুরুত্ব — নিমিষা শুক্লা — ৪৭
- ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন জোগাতে — বিনয় কুমার সাক্সেনা — ৫১
- গঠনমূলক কর্মসূচি : নারীসমাজের ভূমিকা — অপর্ণা বসু — ৫৪
- ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ : তাঁর দৃষ্টিতে — শলেন্দর শর্মা — ৫৭

বিশেষ নিবন্ধ

- স্বচ্ছাগ্রহের উজ্জ্বল শিখা — অক্ষয় রাউত — ৫৯

ফোকাস

- গান্ধী : সমন্বয়-এর দিশারী — পি. এ. নাজারেথ — ৬৩

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৬৮
- যোজনা কলাম — —ওই— — ৬৯
- আমাদের প্রকাশনা — —ওই— — ৭১
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৭২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৭৩
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৭৪

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

আস্থা

মহৎ মানুষদের জন্মবার্ষিকী পালন ব্যক্তিবিশেষের জীবন তথা সমাজ ও জাতির কাছে মাইলফলকের মতো। সংশ্লিষ্ট মহান ব্যক্তিবর্গের বাণী ও বার্তাকে, সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষিতে নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয় তা। সেই সূত্রে প্রয়োজনমাফিক ত্রুটি-বিচ্যুতি শুধরে এক উন্নততর ও সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সঠিক মার্গ চয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এধরনের মূল্যায়ন করা আদৌ কী যোগ্যতা আছে আমাদের? এক সঠিক মূল্যায়নের জন্য সম্ভবত প্রয়োজন এক ধরনের সর্বব্যাপিতা...সর্বকাল ও সর্বস্থানের সাপেক্ষে...এবং ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করতে হবে সমসাময়িক তথা ভবিষ্যৎকালের কথা মাথায় রেখে। সুতরাং, গান্ধীজীর এমত সার্বিক মূল্যায়ন করার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে একদিকে যেমন লবণ সত্যাগ্রহের সময়কার উচ্ছ্বাস, দেশভাগের আগের হিংসার নৈরাশ্যের গভীরে যেতে হবে; অন্যদিকে, বিবেচনায় রাখতে হবে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার, মালালা ইউসুফজাইয়ের মতো আমাদের সমকালীন দূরদ্রষ্টাদের মতাদর্শকে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ সেই ক্ষমতার অধিকারী নয়। কাজে কাজেই, মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোক পথ দিশারীর উপস্থিতিধন্য হওয়ার অর্থ কী, আর সর্বোপরি সমাজের পক্ষে, ঐতিহাসিক দৃশ্যপট থেকে তাঁর শূন্যস্থানের ব্যাঞ্জনাই বা কী, তার সার্বিক মূল্যায়ন করতে আণরা অপারগ। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এইসব মাইলফলক এই মহান ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করতে; নিজেদের জীবনকে মহিমান্বিত করতে সময়ের বালুরাশিতে তাঁদের পদচিহ্নকে নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ এনে দেয় আমাদের সামনে। সার্ধশতবর্ষে জাতির তরফে জাতির জনক গান্ধীজীকে স্মরণ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ কর্মকাণ্ডে এক ক্ষুদ্র অবদান রাখার প্রচেষ্টা থেকে যোজনার এই সংখ্যা সাজিয়েছি আমরা।

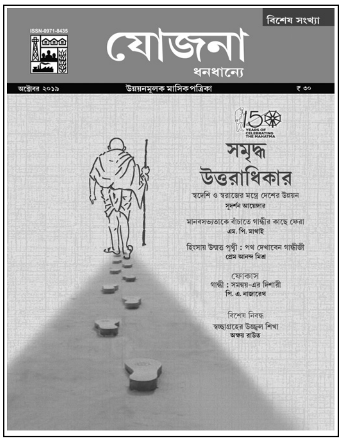

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, তৎকালীন প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে প্রেম, সত্য ও অহিংসার মতো অভিনব হাতিয়ার সম্বল করে সফল লড়াই চালাতে গান্ধীজী জাতিকে নেতৃত্ব দেন। যাহোক, সেই একই সময়পর্বে, দুনিয়া দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এবং মহাত্মা স্বয়ং আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর, আমাদের সমাজ বহু উৎকণ্ঠিত মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছে—ঠাণ্ডা যুদ্ধের থেকে শুরু করে শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ৯/১১; বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভে জ্বলে ওঠার বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। গান্ধীর সত্য ও অহিংসার বার্তা চিরায়ত থাকা সত্ত্বেও অবিচার, ঔদাসীন্য, অবিশ্বাস এবং বৈষম্যের একের পর এক ঘটনা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরে ঘটেই চলেছে।

যাহোক, আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এক যথাযথ এবং সুস্থায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শুভবুদ্ধির পক্ষে সওয়াল করতে হলে সার্বিকতার নিরিখে বিচার করতে হবে আমাদের। এইসব নৈরাশ্যের সাথে একইভাবে মূল্যায়ন করতে হবে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, নেলসন ম্যান্ডেলা অনুসৃত মার্গের প্রভাব; অ্যালভিন টফ্লার, এরিখ ফ্রম এবং আর্নস্ট ফ্রেডরিখ শুমাখারের মতো স্থিতধী পাণ্ডিত্যের কণ্ঠস্বরকেও। সুতরাং, সংগ্রাম জারি থাকবে, একই সঙ্গে জারি থাকবে, 'সত্যের জয় একদিন হবেই', এই আশাও। ধরণীর বুকে জীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে বইতে থাকবে বলে যদি আমরা বিশ্বাস রাখি, তবে সেই আশা রাখা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই এবং সেটাই সম্ভবত গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতার নির্যাস।

ঈশ্বর তাঁকে বিবিধ দিক ও অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতিমূর্তি হিসাবে গড়েছেন। তাই গান্ধীজীর বার্তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক তাৎপর্যবাহী নয়। সমগ্র মানবজাতির সুস্থ বিকাশের জন্য এক সার্বিক মার্গের সন্ধান দেয় তা। রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সত্যাগ্রহের নিয়মনীতি, গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, অছি বা ন্যাসরক্ষকের পদ ও তার দায়িত্বভার, স্বদেশি ও খালি, বুনিয়াদি শিক্ষা, সত্য ও অহিংসা, শান্তি ও মানবসভ্যতার সুস্থায়িত্ব, ইত্যাদি গান্ধীজীর এগারোটি সংকল্প-সহ সমস্ত কিছুই তাঁর স্বপ্নমাফিক এবং বিবেকসম্পন্ন, যথাযথ ও সহমর্মী সমাজ গঠনে অবদান রাখে। যোজনার এই সংখ্যায় নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা বিবিধ নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত বিষয়গুলি অনুধাবনের চেষ্টা চালিয়েছি।

শুরুতেই যেমন বলা হয়েছে যে, আমাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে অতীত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা, আত্মসমীক্ষা ও আমাদের সম্ভাবনার পরিমাপ করার সুযোগ এনে দেয় এমত সব মাইলফলক। যোজনার এই বিশেষ সংখ্যা, মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্য প্রকাশিত এমনই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। মহান আত্মা, জাতির জনকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'আমরা শান্তির বিশ্বে বসবাস করব' তথা 'আমরা করব জয়' হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত নিজেদের এই অটুট বিশ্বাসের এক দলিল তা।❑

স্বদেশি ও স্বরাজের মন্ত্রে দেশের উন্নয়ন

সুদর্শন আয়েঙ্গার

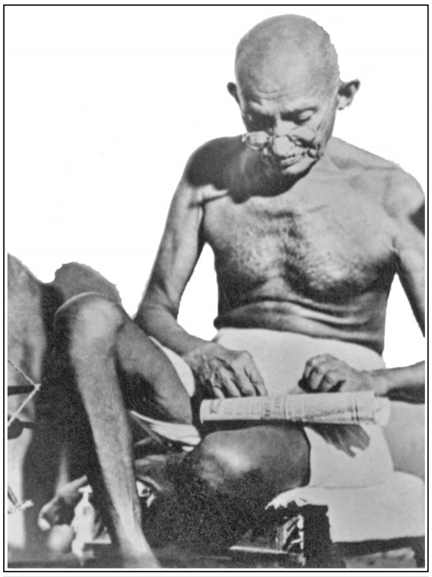

অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে সরকার আইন প্রণয়ন করে কর্পোরেট ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে তাদের মুনাফার দুই শতাংশ সমাজকল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে এবং এইভাবেই গান্ধীজীর 'তত্ত্বাবধান বা ট্রাস্টিশিপ' তত্ত্ব রূপায়ণের প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর চিন্তাধারার শিকড় রয়েছে আরও গভীরে। তিনি মনে করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যেসব মানুষ যুক্ত রয়েছেন সমাজের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। দেশগঠন তথা অহিংস ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে তাদের একটা অবদান থাকা উচিত।

হালফিলে কর্পোরেট জগতে 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি' বা 'CSR' কথাটি নিয়ে জোরদার চর্চা হচ্ছে। বাণিজ্যমহল বা সাধারণ মানুষের অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে সরকার আইন প্রণয়ন করে কর্পোরেট ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে তাদের মুনাফার দুই শতাংশ সমাজকল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে এবং এইভাবেই গান্ধীজীর 'তত্ত্বাবধান বা ট্রাস্টিশিপ' তত্ত্ব রূপায়ণের প্রশস্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আর, গান্ধীজী এই 'ট্রাস্টিশিপ' তত্ত্বকেই আজ 'CSR' নামে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর চিন্তাধারার শিকড় রয়েছে আরও গভীরে। ব্যবসাবাণিজ্যের নৈতিকতা নিয়েও গান্ধীজীর আলাদা বক্তব্য ছিল। তিনি মনে করতেন, ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে যেসব মানুষ যুক্ত রয়েছেন সমাজের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। দেশগঠন তথা অহিংস ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে তাদের একটা অবদান থাকা উচিত। বাণিজ্যমহলের কাছে তিনি এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, দেশগঠনের কাজে তাদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯১৯ সালের ২৯ জুন আমেদাবাদে একটি অনাথাশ্রম 'বনিতা বিশ্রাম'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন... 'এখানে একটা অভিযোগ করা হয়েছে বণিকদের শঠতায় আমেদাবাদ ভরে গেছে... বণিকদের মতো ধুরন্ধর বুদ্ধির পাশাপাশি একজন মানুষের আরও কিছু গুণ থাকা দরকার... যেমন উদ্যোগ গ্রহণের ইচ্ছা, জ্ঞান তথা দেশের সেবার জন্য আত্মনিয়োগের তৎপরতা... বণিকরাই দেশে সম্পদ সৃষ্টি করেন। নিজের বাণিজ্যিক দক্ষতাকে যিনি দেশের সেবায় কাজে লাগান তিনিই শ্রেষ্ঠ বণিক... প্রকৃত ধর্মবোধ না থাকলে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না... গীতায় যে সহমর্মিতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমি একটাই কথা বুঝি, চারপাশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কষ্টলাঘব করার জন্য আমাদের শরীর, মন ও সম্পদ পুরোপুরি উৎসর্গ করা উচিত'।

অন্য আরেক জায়গায় গান্ধীজী বলছেন... 'ব্যবহারিক বা ব্যবসার জগৎ এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান বা ধর্মের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা বলে আমাদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। আমরা মনে করি যে এই দুই জগৎ কখনওই একসঙ্গে এসে মিলতে পারে না। ব্যবসাবাণিজ্যে কখনওই ধর্মবোধ সঞ্চারিত করা যায় না। এটা করতে যাওয়াটাও একটা পাগলামি। কারণ একাজে আমরা কখনওই সফল হব না। কিন্তু এই ধারণা যদি মিথ্যে না হয় তা হলে আমাদের কাছে সত্যিই আর কোনও আশা নেই। ব্যবহারিক জীবনের এমন কোনও দিক নেই যেখান থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া যায়।'

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ (কমিউনিজম)-এর একটি বিকল্প পন্থা হিসেবে গান্ধীজী 'ট্রাস্টিশিপ'-এর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ১৯৯০ সাল থেকে এই বিশ্বের এক আমূল বদল ঘটেছে। কমিউনিজমের পরীক্ষানিরীক্ষা

[লেখক এমিরেটাস অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপাচার্য, গুজরাট বিদ্যাপিঠ, আমেদাবাদ। ই-মেল : sudarshan54@gmail.com]

প্রায় শেষের পথে। সবার মনে তখন একটাই বিশ্বাস যে পুঁজিবাদই এই মানবসমাজের রক্ষাকর্তা। এছাড়া আর কোনও গতি নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণাটা বোঝা খুব জরুরি। গান্ধীজী যখন এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন তখন তিনি একে এক তাত্ত্বিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

মূল ভাবনা

এই প্রসঙ্গে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল পুঁজিবাদই হোক বা সাম্যবাদ—এই দুয়েরই ভিত্তি হল হিংসা। পুঁজিবাদে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিংসা জন্ম নেয়, অন্যদিকে সাম্যবাদ সমতার কথা বললেও সেখানেও হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই দুই তত্ত্বের বিপরীতে 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণা দাঁড়িয়েই রয়েছে অহিংস নীতির ওপর। এই ধরনের ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকে যে পথে হাঁটতে হবে তার সঙ্গে হিংসার কোনও যোগ নেই। একটি সুস্থায়ী সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তত্ত্ব হিসাবে এই 'ট্রাস্টিশিপ'-এরই যে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি তা মনে করিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী। এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন অজিত দাশগুপ্ত... 'একটি তত্ত্ব, ভাবধারা তথা সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ হিসাবে 'ট্রাস্টিশিপ'-কে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি'... তিনি মনে করতেন এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গঠিত সমাজে... 'ধনীদের হাতে সম্পদ থাকবে। সেখানে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের পর ও ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করার পর বাদবাকি সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক বা 'ট্রাস্টি' হিসাবে কাজ করবেন। আর এই সম্পদ সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের দ্বারাই ব্যবহৃত হবে।'

এই তত্ত্ব পুরোটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাস্টির সততা ও সদিচ্ছার ওপর। তাঁর এই ধারণা অবাস্তব শোনালেও তা থেকে পিছিয়ে আসেননি তিনি। কারণ একটাই, তাঁর এই ধারণা নিহিত রয়েছে একটা তাত্ত্বিক মডেলের ওপর। অনেকেই তাঁর এই মডেলের নানান ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বনামধন্য চিন্তাবিদ অধ্যাপক দান্তওয়ালা মনে করেন যে... আর্থিক বিকাশ ও বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়টি থেকে ট্রাস্টিশিপ-এর নৈতিক ধারণাটিকে আলাদা করা উচিত। অন্যভাবে বলতে গেলে ট্রাস্টিশিপ-এর তত্ত্ব অনেকটা মানুষের অনুমান নির্ভর। এই তত্ত্ব থেকে কে কী অনুমান করে নিচ্ছে সেজন্য গান্ধীজীকে দায়ি করা উচিত হবে না। এই বিষয়টির ওপর আমাদের জোর দিতে হবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা মনে করেন যে 'ট্রাস্টিশিপ'-এর এই তত্ত্ব মোটেই কোনও ধ্রুবসত্য নয়। স্থান ও সময় বিশেষে ওঠা সমাজের চাহিদার নিরিখে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা বদলে যেতে পারে। তবে এই মত মানতে রাজি নন দান্তওয়ালা। তিনি মনে করেন যে, এই তত্ত্বেরই মূল নীতি একেবারে ধ্রুব-সত্য। তবে এর প্রয়োগ আপেক্ষিক হতে পারে। নৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার প্রস্তুতিটাই আসলে আপেক্ষিক। তাই কোনও তত্ত্বকে গোড়াতেই নাকচ করার বদলে 'তত্ত্বের জন্য যে তত্ত্ব' তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। অনেক পণ্ডিত ও দার্শনিক আবার মনে করেন যে গান্ধীজীর এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু গান্ধীজী তো এই তত্ত্ব কতটা প্রয়োগযোগ্য সে নিয়ে কোনও যুক্তি পেশ করেননি। তিনি শুধু 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণাকেই প্রচার করতে চেয়েছেন। ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই তত্ত্ব। এই ঐতিহ্য ত্যাগের... এই ঐতিহ্য অপরিগ্রহের। মানুষের মধ্যে যে অপরিগ্রহ বা কোনওকিছু কুক্ষিগত না করে রাখার যে আদর্শ নিহিত রয়েছে তাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। এই 'অপরিগ্রহ' নীতিই গান্ধীজীর এই তত্ত্বের ভরকেন্দ্র। তবে পজিটিভ ইকোনমিক্স (অর্থনীতির যে ধারায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ঘটনার কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়)-এ প্রকৃতির এই গুণকে অস্বীকার করা হয়। অপরিগ্রহ নীতি মানুষের আচার-আচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ঠিকই, কিন্তু একে একজন বিষয়ী মানুষের (ইকোনমিক ম্যান যিনি লাভ-ক্ষতির অঙ্ক ছাড়া এক পা-ও চলেন না) স্বভাবেরও একটা অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠতে হবে। বিষয়ী মানুষের এক 'অর্ডিনাল ইউটিলিটি' রয়েছে, অর্থাৎ তিনি শুধু সেই বিকল্পটাকেই গ্রহণ করেন যা অন্যটার চেয়ে ভালো। তাঁর এই ধারণা গুণগত এবং তা তুলনাযোগ্য। একজন 'অপরিগ্রাহী' ব্যক্তি, যিনি সম্পদ অর্জনে ইচ্ছুক হলেও তা কুক্ষিগত করে রাখতে চান না, তিনি নানাভাবে এই সম্পদকে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন পজিটিভ ইকনোমিক্স অনুযায়ী, তিনি এই সম্পদ আত্মসুখ ও নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করতে পারেন। এটা হল একটা দিক, আর অন্যদিকে, অন্যদের চাহিদা পূরণ করেই অনেকে তৃপ্তি পেতে পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি নিজের কাজ দিয়ে পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী, বৃহত্তর সমাজ, সর্বোপরি বিশ্বসংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। তাই অপরিগ্রহ আদর্শের উপযোগিতার দু'টি দিক রয়েছে। এই উপযোগিতার ধারণা একটু আলাদা এবং তার প্রকৃতি হল গুণগত, পরিমাণগত নয়। আর নিজেদের সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য এই বহুমাত্রিক উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। নিজের ভোগসুখ মেটানোর যে সহজাত প্রবৃত্তি বিষয়ী মানুষের রয়েছে শুধু তাকে বিবেচনা করলে হবে না। অপরিগ্রহ তত্ত্বের এই দিকটিকে যদি আদর্শ হিসাবে মূলস্রোতের অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় গ্রহণ করা যায়, তাহলে একজন অপরিগ্রাহী মানুষ গড়ে তোলাটা এক মস্ত বড়ো কাজ হয়ে দাঁড়াবে। গান্ধীজী মনে করতেন যে অপরিগ্রহের আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

বর্তমানের কর্পোরেট দুনিয়ায় পজিটিভ ইকনোমিক্স-এরই দাপট। এখানে আদর্শ, ন্যায়নীতির কোনও জায়গা নেই। অর্থাৎ, এখানে মূল্যবোধের বিষয়টিকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ রয়েছে। বাজারে ধস নামলে একজন ইকনোমিক ম্যান বা বিষয়ী মানুষের কাজের ব্যর্থতাও পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই বাস্তবে ইকনোমিক ম্যান বা বিষয়ী মানুষের ধারণাটা অলীক। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই এদের দেখা মেলে।

কর্পোরেট দুনিয়াতেও অনেক অযৌক্তিক ঘটনা ঘটে থাকে... শুধুমাত্র মুনাফার চেয়ে মূল্যবোধকেও অনেক সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি মূল্যবোধ অনুশীলনের এমন একটি ক্ষেত্র গড়ে তোলা যায়, তাহলে অপরিগ্রহের ধারণাকেও বাস্তবে প্রয়োগ করার পথ প্রশস্ত হবে। এই যুক্তির ওপরই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণা। এই বিষয়টিকে নিয়ে যদি আরেকটু এগোনো যায় তাহলে এর ব্যবহারিক দিকগুলিকে আমরা দেখতে পাব। অপরিগ্রহের ধারণাকে যদি সর্বত্র সঞ্চারিত করা যায় তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেও কী উৎপাদন করতে হবে এবং কতটা উৎপাদন করতে হবে সে বিষয়টিকেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালনা করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার যে প্রবণতা রয়েছে তা থেকে মুক্তির পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই সমস্যা সমাধানের একটা পথ অবশ্য রয়েছে... সেটা হল শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে অপরিগ্রহের আদর্শ মানুষের মনে গেঁথে দিতে হবে। তবে সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

অহিংসার ওপর ভিত্তি করে ট্রাস্টিশিপ

'ট্রাস্টিশিপ'-এর মূল ভিত্তি হল অহিংসা। আর অহিংসা মানেই যে সত্যাগ্রহ' সেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ধনবান ও পুঁজিবাদীরা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের ধনসম্পদ বিতরণ করতে না চায় তাহলে 'সত্যাগ্রহের' পথ অবলম্বন করতে হবে। 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণাকে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়ায় একথা বার বার বলেছেন গান্ধীজী। তাঁর মন্ত্র হল মানুষকে বোঝানো এবং তারপর অসহযোগ। ট্রাস্টি বা তত্ত্বাবধায়ক যদি প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক হয়ে উঠতে না পারে তাহলে কি রাষ্ট্র তাকে অস্বীকার করতে পারে? গান্ধীজীর উত্তর হল 'হ্যাঁ'... 'এই ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সব ধনসম্পদ কেড়ে নিতে পারে রাষ্ট্র আর আমি মনে করি যে, এ কাজে একটু-আধটু হিংসার পথ যদি অবলম্বনও করতে হয়, তাহলে ক্ষতি নেই।' এখানে একটা অভিনব বিষয় হল গান্ধীজী রাষ্ট্রের ভূমিকার কথাও ভেবেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে সীমিত সময়ের। দান্তওয়ালার মতে, এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা যদি স্পষ্ট না হয় বা রাষ্ট্র যদি নিজেই শোষণ ও দমন-পীড়নের নীতিতে বিশ্বাসী হয়... মানে যেটা সাধারণত হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আরও বিপদ। তখন এই মডেলের আওতাতেও রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদের জন্ম হতে পারে।

স্বাধীনতার পরে এই ট্রাস্টিশিপ নীতির একটা ভিন্ন রূপ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন বিনোবা ভাবে। তার কর্মকাণ্ড ছিল জমি নিয়ে, যা 'ভূদান' নামে জনপ্রিয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার ঠিক পরেই তেলেঙ্গানায় জমিদারদের খুন করে উগ্র বামপন্থীরা তাদের জমি জোর করে দখল করতে থাকে। এই সময় ভারত সরকারও ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করে, যেমন, 'জমিদারি বিলোপ আইন', 'জমির প্রজাস্বত্ব ও জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন' ইত্যাদি। বিনোবা মনে করতেন যে, এই সরাসরি হিংসার মাধ্যমে জমির এই জবরদখল খুন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর রাষ্ট্রও ঠিক একই কাজ করছে (জমি বাজেয়াপ্ত করা), তবে সেটা 'কানুন'-এর মাধ্যমে। তিনি মানুষের কাছে সরাসরি জমিদান করার আবেদন জানান আর সেই জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। তার আবেদন ছিল মানুষের নৈতিকতার কাছে, তিনি যাকে বলতেন 'করুণা'। কিন্তু গান্ধীজী এই 'করুণা'-র ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই জমিদারদের মনে যদি করুণা না জাগে, তাহলে তারা তাদের 'কর্তব্য' পালন করুক যা একদিন 'সত্যাগ্রহে' পরিণত হবে। ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে এদেশে কৃষিই ছিল জীবিকার প্রধান উপায়। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) কৃষির বিরাট অবদান ছিল। জমিই ছিল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম এবং জীবন ও জীবিকার জন্য জমির মালিকানা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। জমির মালিকানা নিয়ে অসাম্যের ফলে সম্পদ বণ্টন ও আয়ের ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছিল বিপুল বৈষম্য। সেসময় জমিদারেরা ছিলেন অসীম বিত্তশালী এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ছিল দেখার মতো।

শিল্পায়নের ফলে তৈরি হয় কর্পোরেট দুনিয়া। এই কর্পোরেট দুনিয়া যদি তত্ত্বাবধায়ক বা 'ট্রাস্টি' হিসাবে দায়িত্ব পালন না করতে পারে তবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে এবং তারপরে নিতে হবে 'সত্যাগ্রহের' পথ। এই বিষয়টা যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে না পারলে আর কর্পোরেট ক্ষেত্রের ওপর রাশ টেনে না ধরতে পারলে সমাজে বৈষম্যের মাত্রা আরও বাড়বে। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। কর্পোরেট দুনিয়া যদি তত্ত্বাবধায়ক ব্য 'ট্রাস্টি' না হয়ে উঠতে পারে তাহলে আবার দেখা দেবে হিংসা। আবার জোর করে সম্পদ জবরদখল আর তা বাজেয়াপ্ত করার পর্ব শুরু হবে। হিংসা আর খুনোখুনি নয়, গান্ধীজী চেয়েছিলেন কর্পোরেট দুনিয়া একজন 'ট্রাস্টি' হিসাবে কাজ করুক এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করুক।

ট্রাস্টিশিপে সম্পদ সৃষ্টির অনুমোদন

ট্রাস্টিশিপে আসলে বলা হয়েছে মানুষ কীভাবে সম্পদ অর্জন করবে আর কতটা অর্জন করবে? ট্রাস্টিশিপে সম্পদ সৃষ্টি বা সম্পদ উপার্জনের বিরোধিতা করা হয়নি, বরং এগুলোকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী আবার যখন আমেদাবাদে ফিরে আসেন সেসময় কাপড়কলগুলিতে ধর্মঘট চলছিল। ততদিনে পুরো শিল্পজগৎ একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। শ্রমিক সংগঠনও গড়ে উঠেছে। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও দরাদরিও শুরু হয়েছে, কিন্তু এই দু'পক্ষ একে অপরকে শত্রু বলেই মনে করত... যেন যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ। এই অবস্থার পরিবর্তন আনলেন গান্ধীজী। প্রচার করলেন 'ট্রাস্টিশিপ'-এর ধারণা... 'কাপড় কলের ধর্মঘটের এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের কাছ থেকে

একটা জিনিসই আশা করি যে, আপনারা আপনাদের অর্জিত সম্পদকে একটা ট্রাস্ট হিসাবে গচ্ছিত রাখবেন। যারা আপনাদের জন্য ঘাম ঝরাচ্ছে, যাদের কঠোর শ্রমের জন্য আপনাদের এত সম্পদ তাদের কল্যাণে আপনাদের অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করুন। আমি চাই শ্রমিকদের আপনারা নিজেদের সম্পদের সহ-অংশীদার করে তুলুন... আপনারা যদি শ্রমিকদের সহ-অংশীদার বলে ভাবতে না পারেন তাহলে ট্রাস্টিশিপের ধারণা আপনার জন্য নয়... আপনি নিজেই সংঘাতের পথ বেছে নিচ্ছেন।' কর্পোরেট জগৎ হয়তো গান্ধীজীর এই মতকে মেনে নেবে না। তারা শ্রমিকদের খামখেয়ালিপনার কথা বলে নিজেদের পক্ষে যুক্তি সাজাবে... ব্যবসার সুবিধার জন্য শ্রমিকদের ছাঁটাই-এর কথা বলবে। আর এখানেই হবে হিংসার সূত্রপাত। কারণ কর্পোরেট জগৎ শ্রমিকদের শুধুমাত্র উৎপাদনের একটা উপকরণ বলে মনে করে... এছাড়া তাদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই... শুধু একটা সংখ্যা মাত্র। নিও ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি অনুযায়ী, শ্রমিকদের মনে অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রমের মূল্য ঢুকিয়ে দেওয়া তথা উৎপাদনের খরচ কমানোর একটাই রাস্তা... তাদের ওপর শারীরিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে যাওয়া। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যা আসবে সেটা হল দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের দায়বদ্ধতা বাড়বে এমনটা আশা করা বোকামি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের কোনও অংশীদারি না থাকলে, উৎপাদন কেন্দ্র ও তার পরিবেশের ওপর শ্রমিক শ্রেণির কোনও মালিকানা না থাকলে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তারা আর কাজে কোনও উৎসাহ পাবে না। শ্রমিকদের সঠিক মজুরি না দেওয়ার কারণে পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটা নেতিবাচক বহিঃস্থ প্রভাব বা 'নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি' (পণ্য বা পরিষেবার উৎপাদন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি নেতিবাচক-ভাবে তৃতীয় পক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।) তৈরি হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও এই বহিঃস্থ প্রভাব এসে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাস্টিশিপের ধারণা প্রয়োগ করতে গেলে কর্পোরেট জগৎ-কে একজন তত্ত্বাবধায়ক বা ট্রাস্টি ও একজন উৎপাদক হিসাবে যে সহ-নাগরিকরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাদের সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে হবে। সম্মানজনক জীবন বলতে আমরা বুঝি এমন একটা জীবন যেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ। ট্রাস্টিশিপের মাধ্যমে মানুষের এই ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণ করা যায়। খাঁটি অর্থনৈতিক পরিভাষা অনুযায়ী গড় ব্যয় বা অ্যাভারেজ কস্ট-এর নিয়ম এখানে খাটবে না। সমাজের ওপর যে বহিঃস্থ প্রভাবগুলি কর্পোরেট জগৎ চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করতে হবে। বাজার বা চাহিদা ও জোগানের যে অদৃশ্য ক্ষমতা রয়েছে সেটি এই বহিঃস্থ প্রভাবের বিষয়টিকে বার বার এড়িয়ে গেছে। কোনও একটি নির্দিষ্ট সংস্থা হোক বা সমগ্র শিল্পজগৎ, এই বহিঃস্থ প্রভাবের বিষয়টি বরাবরই হিসাব-নিকাশের খাতায় অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই বিষয়টিকে সমাজ তথা রাষ্ট্রের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এরকম অবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজ— উভয়ের কাছেই দুর্নীতির বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। তাই শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়ায় মোট যে বহিঃস্থ প্রভাব তৈরি হয়, তা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক বহিঃস্থ প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বড়ো আকারে বহিঃস্থ প্রভাবের জন্ম দেবে।

প্রকৃতিতে ট্রাস্টিশিপ

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রকৃতি। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ও ধ্বংসের ফলে বর্তমানে দারুণ একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রকৃতির উপাদান ব্যবহৃত হয়। কর্পোরেট ক্ষেত্রের ভাবনা হল যেনতেনপ্রকারেণ কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় ও পরিবহণ ব্যয় তথা প্রাকৃতিক সম্পদের জোগানের অভাবজনিত ব্যয় যতদূর সম্ভব কমানো। কর্পোরেট দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের সহজাত মূল্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অ্যানথ্রোপোমরফিক ধারণা (যে ধারণা অনুসারে প্রকৃতির সমস্ত উপকরণকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়) অনুসারে, যেকোনও সম্পদের 'নন-ইউজ ভ্যালু' হল সেই মূল্য যা শুধু আমাদের উপকারেই কাজে আসে, অন্যদের নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের এই একই ভাবনা। আমরা প্রকৃতির সেইসব জিনিস নিয়েই মাথা ঘামাই যেগুলোতে শুধু আমাদের লাভ। প্রকৃতির লাভের কথা আমরা মাথাতেও আনি না। অথচ, এটা নিয়ে না ভাবলে আমাদের অস্তিত্ব নিয়েই সংকট দেখা দেবে, এটা আমরা হয়তো এখন বুঝতে পারছি না। কর্পোরেট দুনিয়ার লাভ-ক্ষতির মূল্যায়নে এই বিষয়টিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়। আর এই বিষয়টির বহিঃস্থ প্রভাবের দায় পুরোপুরি রাষ্ট্র, সমাজ বা প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বনাঞ্চলের উদাহরণই ধরা যাক। কাঠের চাহিদা থাকায় বনাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে যায়। এই কাঠের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয় তার মধ্যে শুধু কাঠ কাটা ও কাঠ পরিবহণের ব্যয় ধরা থাকে। এটা কিন্তু কাঠের প্রকৃত মূল্য নয়। গাছ কাটা মানেই বনাঞ্চল ধ্বংস। বনাঞ্চল পরিবেশ রক্ষা করে। বনাঞ্চলকে ঘিরেই আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ হয়। পরিবেশ রক্ষায় বনাঞ্চল যে অবদান রাখছে তার মূল্য কিন্তু কাঠের দামের মধ্যে ধরা হচ্ছে না। উপভোক্তাদেরও সেই মূল্য চোকাতে হচ্ছে না। এই মূল্য চোকানোর দায়িত্বও কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর বর্তাচ্ছে। গান্ধীজীর ট্রাস্টিশিপ তত্ত্ব অনুসারে কোনও ব্যক্তির নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ধরন অন্যরকম হতে পারে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। শিল্পমহল যদি যথাযথভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে চায় তাহলে যখন চাহিদা থাকবে ঠিক তখনই পণ্য উৎপাদন করা হোক। শুধু শুধু পণ্য উৎপাদন করে সমাজের ঘাড়ে তার মূল্য চোকানোর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে চলবে না। এই কারণেই দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্বন ট্রেডিং-এর

প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জঘন্য। তবু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। এখানে আরও যে বিষয়টির কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হল দূষণ। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আসে দূষণ। এখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত প্রযুক্তি বাছাই করেও একজন মানুষ ট্রাস্টির ভূমিকা পালন করতে পারেন।

গান্ধীজী যে যন্ত্রপাতির ঘোর বিরোধী ছিলেন সেকথা সবার জানা। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অত্যধিক ও বিবেচনাহীন ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। বিচারবিবেচনা করে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে বলেছিলেন তিনি... আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি। একেও এক ধরনের ট্রাস্টিশিপ বলা যায়। তাই উৎপাদন ব্যবস্থাতেও ট্রাস্টিশিপের অনেক সুযোগ রয়েছে।

উপভোগের ক্ষেত্রে ট্রাস্টিশিপ

সম্পদ ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের পরে আসে সদ্‌ব্যবহারের প্রশ্ন। এখানে বিল গেটস ও ওয়ারেন বাফেটের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-র তত্ত্ব ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ঠিকই কিন্তু এটাকে এখনও পরোপকার বলেই মনে করা হয়। পরোপকারের ঐতিহ্য ভারতের নিজস্ব। মানুষের মধ্যে নিজের কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার বাসনা বা 'লোকেষণা' থেকেই আসে জনহিতে দানের ইচ্ছা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বলা হয়ে থাকে সম্পদ অর্জনের পর তার বড়ো অংশই যদি দান করে দেওয়া যায়, তাহলেই সমাজের স্বীকৃতি মিলবে। বিল গেটস আর ওয়ারেন বাফেটের উদাহরণ দেওয়ার সময় আমাদের কিন্তু ভামাসা-র কথা ভুললে চলবে না। এই শ্রেষ্ঠী তার সব সম্পদ তুলে দিয়েছিলেন রানা প্রতাপের হাতে, যাতে তিনি তার রাজ্য উদ্ধার করতে পারেন। এই ধরনের লোকহিতৈষণা ও ট্রাস্টিশিপ-এর দৃষ্টান্ত ভারতেই রয়েছে। তাই গান্ধীজী যে পুরোটাই ভিত্তিহীন, অলীক কথাবার্তা বলেছেন এমনটা নয়। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন তিনি। তার এই ট্রাস্টিশিপ তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হচ্ছে ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রাস্টিশিপ-এর কথা।

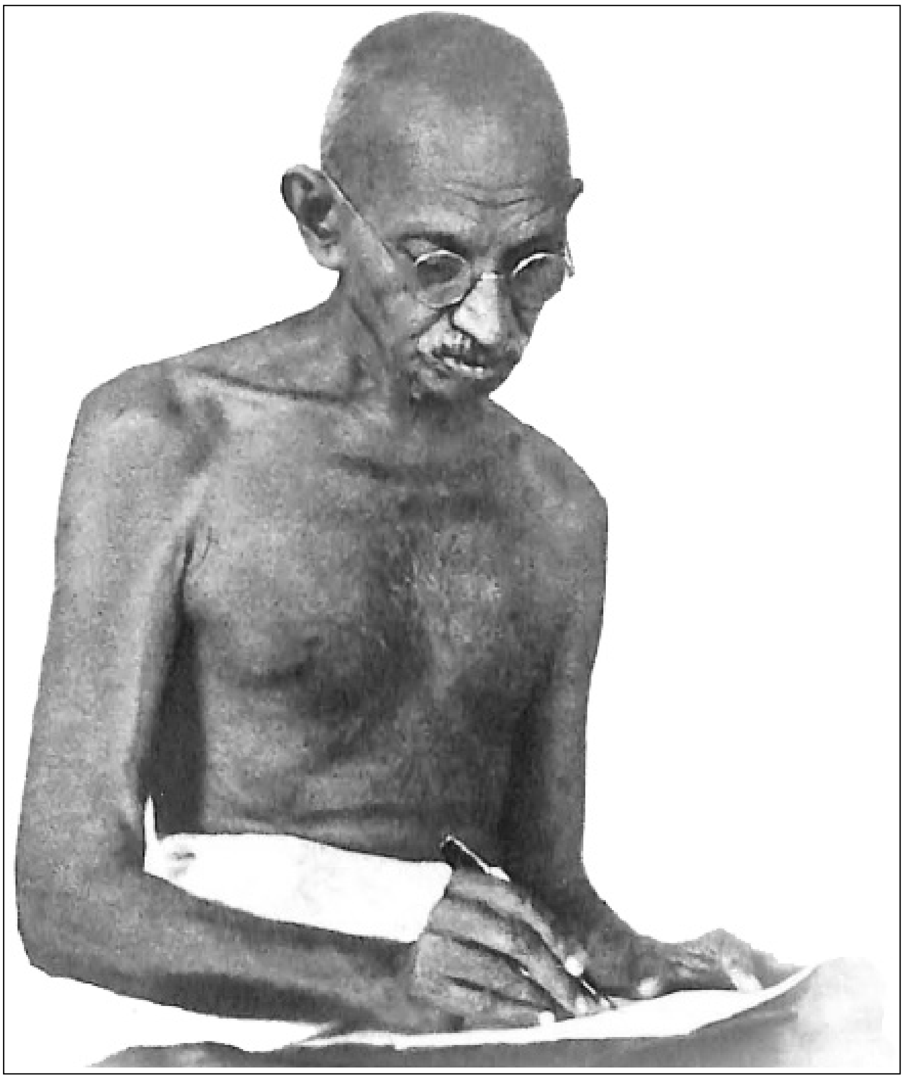

ভোগ হয় দু'টি স্তরে... একটা হল ব্যক্তিগত, অপরটা সামাজিক। ব্যক্তিগত স্তরে একজন ব্যক্তির ভোগের চাহিদা পূরণের মধ্যেই ট্রাস্টিশিপের ধারণা। এখানেও কাজে লাগাতে হবে অপরিগ্রহের আদর্শ। এই আদর্শ বলে, নিরর্থক ভোগবিলাসের কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে গান্ধীজী ভোগসুখের চাহিদায় রাশ টানার কথা বলেছেন। ভোগ-বিলাস সীমিত করা মানে কিন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটানো নয়। সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন সেসব মেটানোর পরে বাকি সম্পদ সমাজের উন্নতিতে ব্যয় করে দেওয়া উচিত বলে মনে করতেন তিনি। এখানেই উঠে আসে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের প্রশ্ন। করুণা-বশত দানধ্যান করার কথা বলেননি গান্ধীজী। একজন দাতা ও 'মহাজনের' মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। মূলত গুজরাট ও রাজস্থানেই জন্ম নিয়েছিল মহাজন প্রথা। মহাজন আসলে একজন ট্রাস্টি। নিজের যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করে জমিয়ে রাখেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন। তিনি নিজে কিন্তু অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। আর সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল কোনও কর্মকাণ্ডে তিনি তার সম্পদ ব্যয় করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাওয়ার বাসনায় এই দানধ্যান নয়। পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রোটেস্ট্যান্ট ভাবধারা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক, পরলোকের ধারণা মুছে গেছে। তাদের কাছে এই জগতই সত্য। গান্ধীজীও এই জাগতিক বিষয় নিয়েই ভাবনাচিন্তা করেছেন, তবে একটু ভিন্নভাবে। তাঁর ট্রাস্টি সামাজিক-ভাবে উৎপাদনশীল কাজে অর্থ ব্যয় করবে।

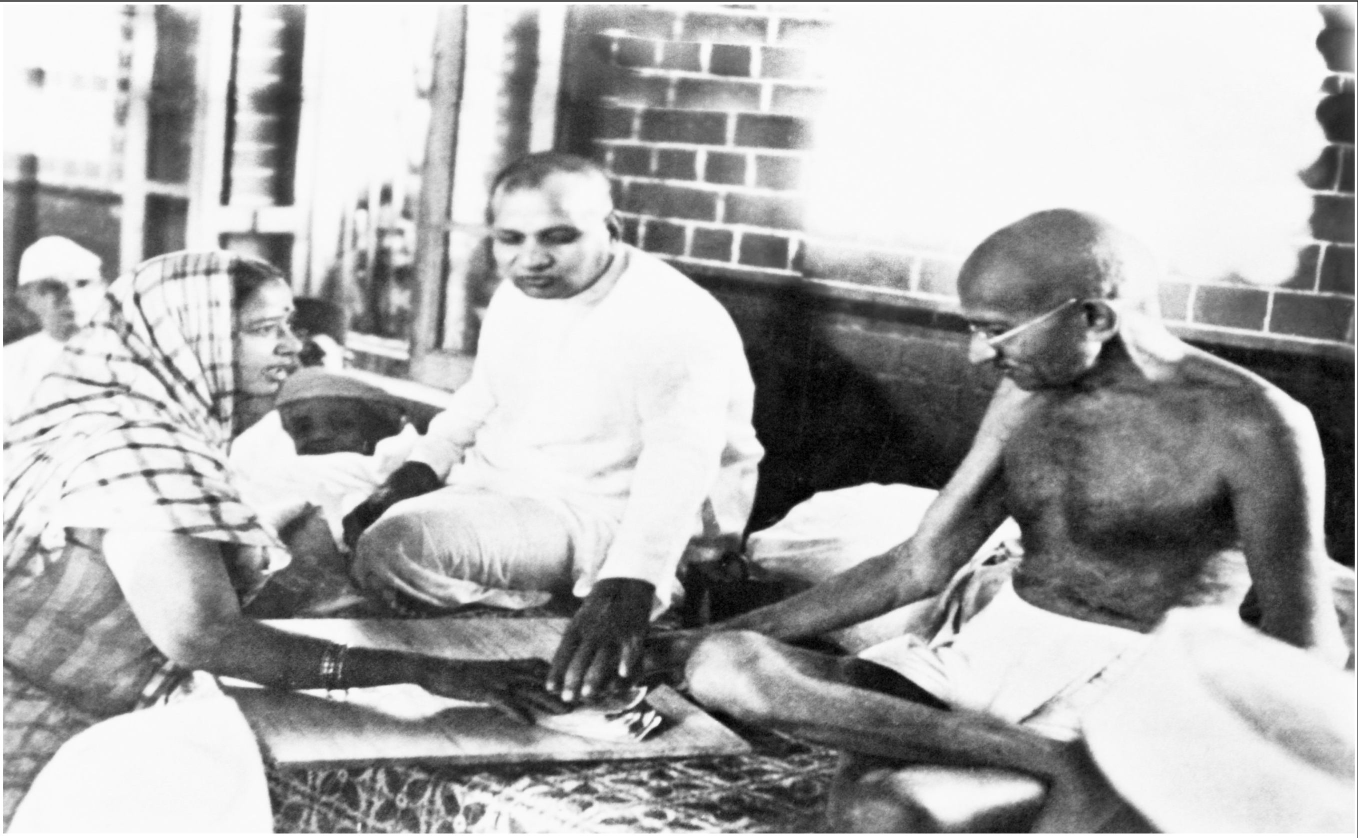

যমুনালাল বাজাজের সঙ্গে দিল্লিতে (১৯৪০)

সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল কাজ বলতে তবে কী বোঝায়? উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমস্ত বহিঃস্থ প্রভাবকে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার চেষ্টা ট্রাস্টি করবেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন কিছু বহিঃস্থ প্রভাব বা এক্সটার্নালিটি তৈরি হবে, যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এই ধরনের অনিচ্ছাকৃত বহিঃস্থ প্রভাবের কারণেই CSR-এর অবতারণা। সহায়সম্পদের অভাবে সমাজকল্যাণমূলক যে সমস্ত কাজে ব্যক্তিবিশেষ বা রাষ্ট্র উদ্যোগ নিতে পারছে না মহাজনেরা সেই কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে পারেন। গুজরাতের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র মহাজনদের অর্থে নির্মিত ও পরিচালিত। কিছু আগে পর্যন্তও এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিষেবার জন্য খুব একটা বেশি মূল্য নেওয়া হ'ত না। কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। এগুলি ক্রমেই বেসরকারি লাভজনক সংস্থা হয়ে উঠছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিও এক-একটা ট্রাস্ট এবং সামাজিকভাবে উৎপাদনশীল কাজেই তারা নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণ করছে। আজকের দিনে CSR-এর অর্থ হল ব্যবসার মুনাফার একাংশ সরিয়ে রেখে তা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা এবং বাকি সম্পদ হাতে নিয়ে নিজেরা সন্তুষ্ট থাকা। মহাজনের ঐতিহ্য কিন্তু এর চেয়ে আলাদা। এখানে ক্ষতির পরিমাণ একেবারে নগণ্য। বর্তমানে কর্পোরেট দুনিয়া যেকোনও সময়ে শ্রমিক ছাঁটাই-এর জন্য উপযোগী আইন চায়। তারা প্রকৃতি ও শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ শোষণ চালায়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল বেশি... আরও বেশি মুনাফা। এই প্রক্রিয়ার একমাত্র কর্পোরেট ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি অনিচ্ছাকৃত হতেও পারে... হতে পারে তা উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অঙ্গ। তবুও এই ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানোর জন্য শ্রমিক শ্রেণি ও প্রকৃতিকে আরও ভালো করে, সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। আর সেটাই হবে গান্ধীজীর ট্রাস্টিশিপ কাঠামোর মধ্যেই কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্ব পালন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গেলে নিজের চাহিদা, ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষাগুলির ওপর ট্রাস্টিকে লাগাম পরাতে হবে। তবেই সেটা সমাজের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত চাহিদা কমলে ধীরে ধীরে সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাগুলিও নিয়ন্ত্রণে আসবে। আর সেটা হবে ইতিবাচক বহিঃস্থ প্রভাব বা ইতিবাচক এক্সটার্নালিটির উদাহরণ। এতে প্রকৃতির ওপর চাপও অনেক কমবে।

অপরিগ্রহ নীতি মেনে ট্রাস্টি তথা সম্পদস্রষ্টা ও মালিকরা যদি ধনসম্পদকে নিজেদের কুক্ষিগত করে না রাখেন তাহলে পুরো সমাজের ওপরই একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই ধরনের সমাজে জীবন হবে সহজসরল, অনাড়ম্বর। যেসব প্রযুক্তি বস্তুত কার্যকরি বা যেগুলি ততটা কার্যকরি নয়, সেগুলির ব্যবহারও আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। শুধু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। একটি অহিংস সমাজ, স্বদেশি, বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও স্বরাজের যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখেছিলেন তার মধ্যেই লালিত হতে পারে ট্রাস্টিশিপের আদর্শ।❑

মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে গান্ধীর কাছে ফেরা

এম. পি. মাথাই

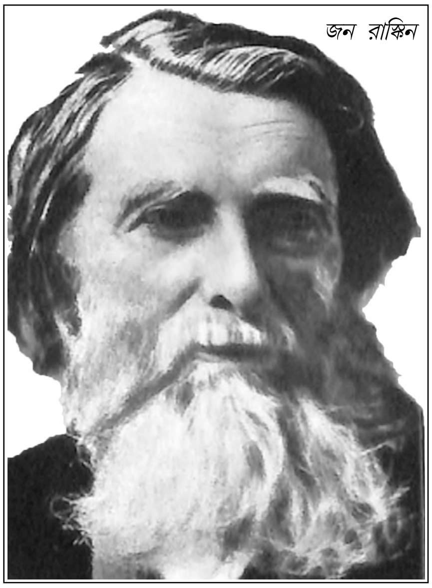
জন রাস্কিন

আজকের মানবসভ্যতা যে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটাই মাত্র পথ হল 'গান্ধীর কাছে ফেরা'। আগে আমরা যেখানে ছিলাম, যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম সেখানেই আবার ফিরে যাওয়া। এই অর্থে ধরতে গেলে 'গান্ধীর কাছে ফেরা' কথাটা হয়তো অতটা গ্রহণযোগ্য নয়। গান্ধীজীর নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তিনি আসলে ছিলেন একজন দূরদ্রষ্টা। তাই একটি সুষ্ঠু সুস্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলতে গেলে তাঁর মতবাদকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথেই চলতে হবে।

গান্ধীজী সম্পর্কিত যেকোনও আলোচনায় ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়... 'গান্ধীর কাছে ফেরা'। বিশেষত গান্ধীজীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন কথাটা একেবারে ক্লিশে হয়ে গেছে। গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্তরা এমনকি গান্ধী দর্শনের মনোযোগী ছাত্ররাও আজ বার বার একটা কথাই বলেন যে আজকের মানবসভ্যতা যে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটাই মাত্র পথ হল 'গান্ধীর কাছে ফেরা'। 'ফেরা' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? আগে আমরা যেখানে ছিলাম, যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম সেখানেই আবার ফিরে যাওয়া। এই অর্থে ধরতে গেলে 'গান্ধীর কাছে ফেরা' কথাটা হয়তো অতটা গ্রহণযোগ্য নয়। একটা কথা সর্বজনবিদিত যে গান্ধীজী যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন তার মূল লক্ষ্যই ছিল 'স্বরাজ' অর্জন ও 'সর্বোদয়' সুনিশ্চিতকরণ; যার অর্থ হল মানবসভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। গান্ধীজীর নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তিনি আসলে ছিলেন একজন যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক, একজন পথ প্রদর্শক এবং সর্বোপরি একজন দূরদ্রষ্টা। তাই একটি সুষ্ঠু সুস্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলতে গেলে তাঁর মতবাদকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথেই চলতে হবে।

আজকের মানবসমাজ এক বিষম সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এহেন বিপর্যয় এর আগে দেখা যায়নি। এই পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠছে। আধুনিক সমাজকে আমরা বলি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। এটা তথ্যের যুগ। ইন্টারনেট সংযোগ আসার পরে তথ্য আর তথ্যভিত্তিক জ্ঞান আজ সকলের হাতের নাগালে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা চলছে, তা আমাদের অবোধ্য, বর্ণনাতীত। আর সেই জন্যই তা অধিকাংশ মানুষের কাছেই ধোঁয়াশার মতো। মিচিও কাকু অ্যাভারের মতো বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, বায়ো-জেনেটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে তিনটি বিপ্লব এসেছে তাতে মানবসভ্যতার ছবিটাই বদলে গেছে। কিন্তু এতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ও সেখানে বসবাসকারী বুদ্ধিমান জীবদের জন্য কোন পরিণতি অপেক্ষা করছে তা বিজ্ঞানীরাও আগাম জানাতে পারছেন না। জ্যোতির্পদার্থবিদরা অনেক আগেই বলে গেছেন এই ব্রহ্মাণ্ড সর্বদাই প্রসরণশীল। কিন্তু এযুগের বিজ্ঞানীরা আবার এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে 'বিগ ক্রাঞ্চ'-ই হোক বা 'বিগ চিল'... এই ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু নিশ্চিত। 'বিগ ক্রাঞ্চ' হলে অনন্ত আগুনে এবং 'বিগ চিল' হলে বরফে ঢাকা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই ব্রহ্মাণ্ড।

[লেখক গুজরাট বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত এবং 'গান্ধী মার্গ' পত্রিকার সম্পাদক। ই-মেল : mpmathaie@gmail.com]

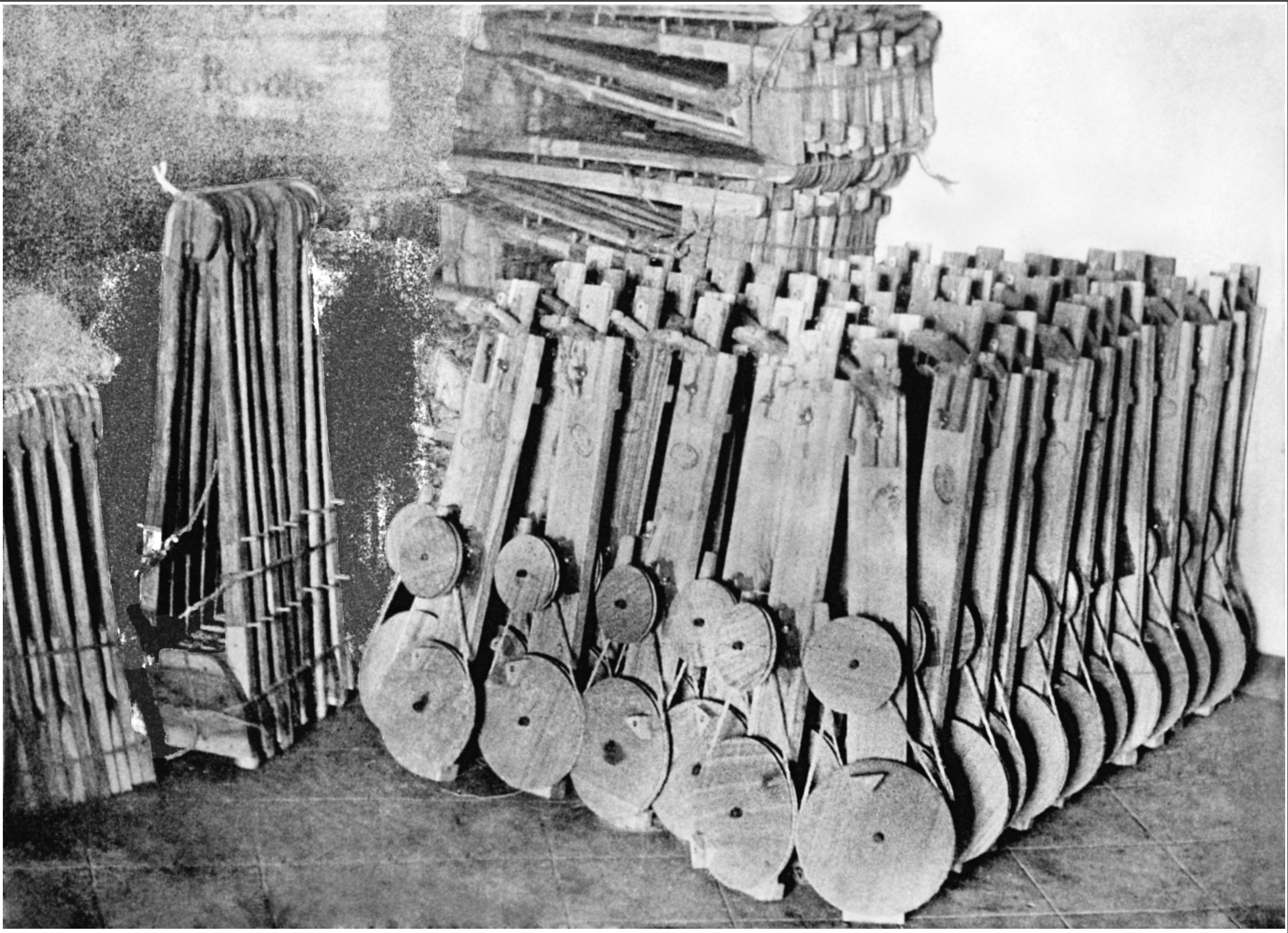

মহারাষ্ট্রের নলওয়াদিতে চরকা উৎপাদন—গ্রামীণ কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য মজুত করে রাখা

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা বলেন এইভাবেই এই ব্রহ্মাণ্ড এবং তাতে বসবাসকারী বুদ্ধিমান জীবেদের বিনাশ ঘটবে। এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথাও অবশ্য তারা বলেন। বিজ্ঞানের চতুর্থ স্তম্ভ টাইম-স্পেসের চলতি সমীকরণ বদলে দিয়ে বিভিন্ন তারামণ্ডলের মধ্যে সংযোগকারী গর্তগুলিকে প্রসারিত করে একটা সুড়ঙ্গ পথ বানিয়ে তার মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিশ্চিত বিনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারে মানুষ। সে অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতের কথা... কয়েকশো কোটি বছর পরের কথা। কিন্তু এই সময়ে যা ঘটছে তা নিয়েই সাধারণ মানুষের চিন্তা। কারণ এতে তাদের জীবন তথা জীবনদায়ী ব্যবস্থায় সরাসরি মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।

বর্তমানে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি তা বহুলাংশেই মনুষ্যসৃষ্ট। নিজেদের ক্ষমতার দম্ভে মত্ত মানুষ প্রকৃতির ওপর যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির ভাই-বোনেদের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে তারই ফলভোগ করছি আমরা। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও তার হাত ধরাধরি করে ইউরোপীয় সমাজের যে আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছিল তাতে মানব সভ্যতার সমস্ত স্তরে একটা বিরাট পালাবদল ঘটে গিয়েছিল। যে সনাতন চিন্তাভাবনা আগে মানুষের জীবনকে চালিত করত তার বদলে এল তথাকথিত নতুন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা। যেমন আলোকপ্রাপ্তির আগে যে সনাতন ধারণা চালু ছিল তাকে বলা হত আধ্যাত্মিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে... এক দৈবশক্তি মানবজীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এই পৃথিবীর মধ্যেও প্রাণ রয়েছে আর এই কথা মনে রেখেই মানুষ জীবনধারণ করবে। প্রকৃতির সব নিয়মকানুনকে সযত্নে লালন করে এবং তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মানুষ গড়ে তুলবে তার জীবনধারা। এরপর এল পদার্থবিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় প্রকৃতির সমস্ত রহস্যের ওপর থেকে পর্দা উঠে গেল। আর সঙ্গে মানুষের মনোভাবও গেল রাতারাতি বদলে। নতুন জ্ঞান অর্জন করে এই প্রকৃতি মাতাকে শুধু নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করতে শিখল মানুষ। এই আর নতুন তত্ত্বের গালভরা নাম দেওয়া হল উপযোগিতাবাদ। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাছে এই পৃথিবী বনে গেল নিছক একটা জড় সম্পদের ভাণ্ডার যা শুধু মানুষের

ভোগেই ব্যবহৃত হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষ প্রকৃতির ওপর ছড়ি ঘোরাবে... প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছেমতো চালনা করবে। মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হবে দেহের আরাম আর ইন্দ্রিয়সুখ। এভাবেই ধর্মীয় আর আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার বদলে এল জড়বাদ বা বস্তুবাদ। যে জ্ঞানকে আগে মনে করা হ'ত মানুষের কর্মসহায়ক; সেটাই এখন হয়ে গেল ক্ষমতা অর্জন ও আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার। স্যার ফ্রান্সিস বেকন তাই যথার্থভাবেই বলেছেন... 'জ্ঞানই শক্তি'। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূলমন্ত্রই হয়ে দাঁড়াল ভোগ আর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। মানুষের জীবন থেকে নীতিবোধ আর আধ্যাত্মিক চেতনা গেল মুছে। উপযোগিতাবাদের স্রোতে এগুলো খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। ধর্মকে বলা হল নিছক কুসংস্কার।

যেকোনও উপায়ে ভোগবাসনা চরিতার্থ করার এই নতুন মতবাদের নাম হল উন্নয়নবাদ। বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন একটা বিষয়ে তারা সবাই একমত... যেকোনও মূল্যে উন্নয়ন চাই। এই উন্নয়নবাদই হয়ে উঠেছে এক নতুন রাজনৈতিক ধর্ম এবং বেশিরভাগ ধর্মের মতো এটাও কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে ভরে উঠেছে।

একুশ শতকের এই চলতি দশকের গোড়া থেকেই আধুনিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী রূপটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত শতকের গোড়ায় কিন্তু ছবিটা এমন ছিল না। দেহসর্বস্বতা আর ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে একচক্ষু হরিণের মতো ছুটে চলার এই মতবাদ জন্মলাভ করেছে পশ্চিমি দুনিয়ায় এবং পশ্চিমের দেশগুলি বাকি দুনিয়ার ওপর জোর করে এই মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। গোটা দুনিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় এই দেহসর্বস্ব সুখেরই জয়গান গেয়েছে এবং তারা একথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে দেহের সুখই মানবজীবনের পরম মোক্ষ। অথচ এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, লিও তলস্তয়, জন রাস্কিন, আমেরিকার হেনরি ডেভিড থুরো, র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন-এর মতো পশ্চিমি দুনিয়ারই কয়েকজন চিন্তাবিদ যাঁরা কিনা 'অন্য পশ্চিম' মতবাদের প্রবক্তা বলে পরিচিত, এই ভোগসর্বস্ব সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, এই ভোগসর্বস্বতা আসলে একটা অসুখ। লন্ডনে পড়াশোনার সময় (১৮৮৯-১৮৯১) গান্ধীজী এঁদের অনেকের সান্নিধ্যলাভ করেছেন, তাঁদের রচনা পড়েছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে মতের আদান-প্রদানও বজায় রেখেছেন। আর এভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর বিশ্ববীক্ষা যার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'হিন্দ স্বরাজ' বা 'ইন্ডিয়ান হোম-রুল'-এ। এই বইটিকে অনেকে বলেন গান্ধী দর্শনের আকর। আবার অনেকে বলেন... 'গান্ধীজীর ইস্তেহার'

লিও তলস্তয়

একথা হয়তো অনেকেরই জানা যে 'হিন্দ স্বরাজ' বইটিতে আধুনিক পশ্চিমি সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছেন গান্ধীজী। হিংসাই যে আধুনিক সভ্যতার মূল অসুখ সেটি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। সরাসরিভাবেও (যেখানে এক শ্রেণির মানুষ অন্যদের মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করে) এই হিংসা বহুদূর অবধি শিকড় বিস্তার করেছে। এর ফলে হিংসা শুধু হিংসারই জন্ম দিচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমি সভ্যতায় যেভাবে মানবজীবন থেকে নীতিবোধ ও ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় বলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং শুধু ইন্দ্রিয়সুখের জয়গান গাওয়া হয়েছে তার বিপদগুলিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই ধরনের দেহসর্বস্বতাকে তিনি বলেছেন 'শরীরের কল্যাণ' (বডিলি ওয়েলফেয়ার)। মার্ক্সীয় তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দেহসর্বস্বতার তত্ত্বেও মানবসভ্যতার উৎকর্ষ বিচারের একটাই মাপকাঠি নির্ণয় করা হয়েছে। প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে প্রকৃতির ওপর যে যত বেশি রাজত্ব করতে পারবে সে তত উন্নত বলে পরিগণিত হবে। 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে এক সাবধান বাণী শুনিয়েছেন গান্ধীজী। প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষকে নিছকই একটা যন্ত্র বানিয়ে যে আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠছে তা শুধু 'নয় দিনের একটা ভেলকি' হয়েই থাকবে। মানসিকতার বদল না ঘটলে

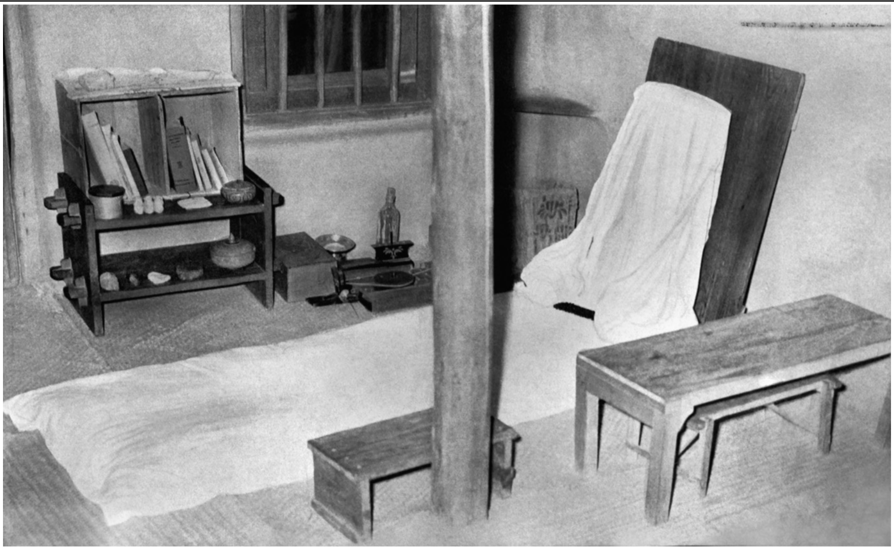

সেবাগ্রামে বাপু কুঠি

সেই সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। 'হিন্দ স্বরাজ'-এর পরবর্তী পর্যায়ে যে পড়াশোনা তিনি করেছেন, যে পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি চালিয়েছেন বা যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তাতে এটা বুঝেছেন যে 'হিন্দ স্বরাজ'-এ ভুল কিছু বলেননি। তাই জওহরলাল নেহরু-র মতো আরও যাঁরা 'হিন্দ স্বরাজ'-এর বক্তব্যকে অবৈজ্ঞানিক, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও কাল্পনিক বলে মনে করতেন তাঁদের তিনি নিজের অবস্থানের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালে জওহরলাল নেহরু-কে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান যে, যা তিনি বইতে লিখেছেন তা তিনি মন থেকে বিশ্বাস করেন। তাই এই বক্তব্য থেকে কিছুতেই সরবেন না। 'হিন্দ স্বরাজ'-এ তিনি যে বিকল্প বিভিন্ন পথের কথা বলেছিলেন তা নিয়ে বিশ্বের অনেক চিন্তাবিদই ভাবনাচিন্তা করেছেন। কেউ কেউ গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন, কেউ তা করেননি। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য মোটামুটি একই। এ প্রসঙ্গে, র‍্যাচেল কারসনের 'The Silent Spring' (১৯৬২), মেরিলিন ফার্গুসনের 'The Aquarian Conspiracy' (১৯৮০), ডেনিস মিডোস, ডোনেলা মিডোস ও জরগেন র‍্যান্ডার্সের 'The Limit to Growth' (১৯৭২), ই. এফ. শুমাখারের 'Small is Beautiful' (১৯৭৩) ও 'A Guide for the Perplexed' (১৯৭৭) এবং অ্যালভিন টফলারের *The Third Wave* (১৯৮০)-এর মতো রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি ও মানবজীবনের আরও অন্যান্য দিকগুলিতে যে যথেচ্ছাচার চলছে তার ফলে ঘনিয়ে আসছে এক ভয়াবহ বিপর্যয় যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এই অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করার পাশাপাশি এই লেখকেরা আগামী দিনের মানব-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যে সমস্ত বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন তার সঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্যের আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। গান্ধীজীর মতো এই লেখকেরাও মনে করেন যে বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি অত্যন্ত নড়বড়ে... যেকোনও দিন তা ভেঙে পড়তে পারে। আমরা যদি সচেতন হয়ে স্থায়িত্ব, অহিংসা, ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিতে এক বিকল্প সমাজ না গড়ে তুলতে পারি তা হলে বর্তমানের এই সভ্যতা গান্ধীজীর ভাষায় একটা 'নয় দিনের ভেলকি হয়েই রয়ে যাবে'... তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়াই যার ভবিতব্য।

গান্ধীজীর ভবিষ্যদ্বাণী আজ মিলে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে আজ পৃথিবী দাঁড়িয়ে। ইন্দ্রিয়সুখের মোহ এড়াতে না পারলেও আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ যখন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা বিষয় ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য (SDGs) নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল তখন বিশ্বের অনেক নেতাই গান্ধীজীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। একটি বিকল্প ও দীর্ঘস্থায়ী সমাজ গড়ে তুলতে গান্ধীজীর পরিকল্পনা, তাঁর কর্মসূচির কথা তখন বার বার উঠে এসেছে। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এবার থেকে মানুষ, এই গ্রহ, শান্তি ও সহযোগিতাকে কেন্দ্রবিন্দু করেই তৈরি হবে কর্মসূচি। বিভিন্ন সময় এই একই কথা গান্ধীজীও বলেছেন। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, স্থায়ী ও সুদৃঢ় সমাজ গড়ে তুলতে অবিলম্বে যে পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু আদতে বিভিন্ন চুক্তি, প্রোটোকল রূপায়িত করতে বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্রই কোনও আন্তরিক পদক্ষেপ নেয়নি। কিয়োটো প্রোটোকলের হাল কী দাঁড়িয়েছে তা তো সবার জানা।

আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্যে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষ এখনও লোভ, লালসার ফাঁদে আটকা পড়ে রয়েছে। এই কারণেই বোধহয় এই সভ্যতাকে গান্ধীজী বলেছিলেন 'নয় দিনের ভেলকি'। রাষ্ট্রসংঘ আমাদের সামনে একটা খুব সহজ প্রশ্ন তুলে ধরেছে—আগামী দিনের দেওয়াল লিখন পড়ে আমরা কি দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের পথে চলব না? ঠিক একই প্রশ্ন গান্ধীজীও তুলেছেন 'হিন্দ স্বরাজ'-এ। সুস্থায়ী মানব-সভ্যতা গড়ে তোলার মূল নীতিগুলিও তিনি বর্ণনা করেছিলেন এই বইতে। এবার তাঁর দেখানো পথে আমাদের চলতে হবে। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আর সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।❑

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী : পথ দেখাবেন গান্ধীজী

প্রেম আনন্দ মিশ্র

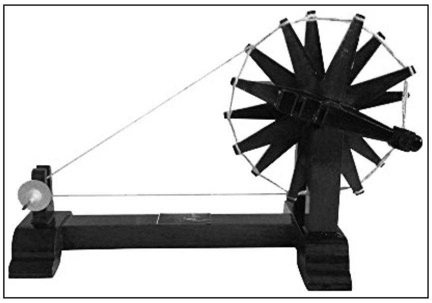

গান্ধীজী শুধুমাত্র হিংসার বাহ্যিক রূপটিকেই দেখেননি, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন মাত্রায় হিংসা যে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে সে ব্যাপারেও অবহিত ছিলেন তিনি। সমাজে যে শোষণ ও প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া চলে তাও এক ধরনের হিংসা। গান্ধীজীর মতে, শুধু কোনও হিংসাত্মক কাজ বা ঘটনাকেই হিংসা বলে না, বরং সমাজের কোনও জনগোষ্ঠী যদি সামাজিক-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হন বা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন, তবে তাও এক ধরনের হিংসা।

আধুনিক সভ্যতার কাছে আজ অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বব্যাপী হিংসা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে হিংসার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে আইনের ভাষাতেই[১] হিংসার বিচার করা হয়। তবে এই আইনের ভাষায় হিংসার অতিশয় জটিল রূপটিকে বর্ণনা করা যায় না। হিংসাত্মক ঘটনার জন্য আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু এতে হিংসাত্মক ঘটনাগুলোর অতি সরলীকরণ হয়ে যায়। ফুঁকো (Foucault) যথার্থই বলেছেন... 'যাকে খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় তা কিন্তু ততটা স্পষ্ট নয়'[২]। হিংসাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রেও এই কথাটি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। কারণ হিংসার ঘটনাকে যত সহজসরল, সোজাসাপটা বলে মনে করা হয় তা আদৌ নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক গভীর ব্যঞ্জনা। এই প্রসঙ্গে স্টাংকো (Stanko)-র সঙ্গে অনেকেই হয়তো সহমত হয়ে বলবেন যে 'যাকে আমরা হিংসা বলে যেকোনও তরলের মতো তারও কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই'[৩]। হিংসার ধারণা নিয়ে মতানৈক্য থাকলে জোহান গালটুং (Johan Galtung) হিংসার যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা দিয়ে মোটামুটি হিংসার ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। গালটুং-এর মতে হিংসা তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক[৪]। গান্ধীজীর অহিংসার তত্ত্ব দিয়ে এই তিনটি স্তরে হিংসার সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে তা নিয়েই এই নিবন্ধে আলোচনা করব।

প্রত্যক্ষ হিংসার মোকাবিলায় গান্ধীজীর শিক্ষা

গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল অদ্বৈত। আপন ও পরের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করেননি তিনি। অদ্বৈত আদর্শ মেনে নিজের অহিংসার নীতিতেও তিনি বলেছেন জগতে কেউ পর নয়... সবাই আপন। আপনার প্রকাশই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঘটে। তাই অপরের প্রতি হিংসা মানে নিজেকেই হিংসার জালে জড়িয়ে ফেলা। প্রত্যক্ষ হোক বা ব্যক্তিগত, সংগঠিত হোক বা বিচ্ছিন্ন... যে ধরনের হিংসার ঘটনা আমরা বর্তমান সমাজে, রাজনীতিতে লক্ষ্য করি তার উদ্ভব তখনই হয় যখন আমরা অপরকে প্রশ্নাতীতভাবে শুধুমাত্র 'অপর' বলেই মনে করি। এই ধরনের ধ্যানধারণাকে একেবারে নাকচ করে দিতে চেয়েছেন গান্ধীজী। তিনি এই 'অপরত্ব' (otherness)-কে একটি আপেক্ষিক ধারণা বলে বর্ণনা করেছেন; যেখানে অপরের বলিদানের চেয়ে আত্মবলিদানকে শ্রেয় বলে মনে করা হয়। *'হিন্দ স্বরাজ'*-এ তিনি বলেছেন... 'অপরের বলিদান নয়, আত্মবলিদানই হল সত্ত্বগুণের পরিচায়ক'[৫]। গান্ধীজির দর্শনে আপন সত্তা ও অপরের সত্তা কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা থাকে। এই কর্তব্য হল নীতিগত এবং এর প্রকৃতি পুরোপুরি অহিংস। এখানে একে-অপরে সত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত

[লেখক আমেদাবাদস্থিত গুজরাট বিদ্যাপীঠ-এর 'গান্ধীয়ান স্টাডিজ' বিভাগের অধ্যাপক। ই-মেল : premmishra93@yahoo.com]

হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। এই যুক্তি মেনেই বর্তমানে যেসব প্রত্যক্ষ হিংসার ঘটনা ঘটছে তার মোকাবিলায় তিনি সকলকে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। তারপর ব্যক্তিগত দুঃখযন্ত্রণা ভোগ এবং প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। এথেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা কথা বোঝা যায় যে, তাঁর অহিংসার বাণীতেই রয়েছে আত্মশুদ্ধির মন্ত্র। একজন অহিংস ব্যক্তির সামর্থ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে অহিংস নীতির শক্তি।

বর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় হিংসার আশ্রয় নেওয়ার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা কেন পরিহার করা উচিত সে যুক্তিও তিনি দিয়েছেন। কারণ হিংসার পথ কখনওই একজন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান ও মূল্য দেয় না। দ্বিতীয়ত, হিংসা কোনও বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে শেষপর্যন্ত নিজেকেই একরকম বৈধতা দিয়ে দেয়। হিংসার পথ মনে করে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেই সারসত্যটা তার জানা আছে এবং সেই অনুযায়ী কাকে শাস্তি দেওয়া হবে আর কাকেই বা মুক্তি দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র তারই। তৃতীয়ত, হিংসা যখন মানুষের অভ্যাসগত হয়ে পড়ে বা এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় তখন সমাজে যেকোনও বিবাদ নিরসনের একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়ায় এই হিংসা। গান্ধীজী আরও বলেছেন, এই হিংসার পথে সমাজের ক্ষতি বই লাভ হয় না। কারণ এই হিংসার নীতি এক অনন্ত দুষ্টচক্র গড়ে তোলে যার হাত থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই। তাই ব্যক্তিগত জীবনে অহিংস নীতিকে মেনে চলার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এবং জীবনের যেকোনও সমস্যায় এই অহিংস নীতিকে পরীক্ষা করে নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। তাঁর মতে, এই অহিংস নীতির কার্যকারিতার পরিচয় পেতে গেলে মানুষকে জীবনে কঠোর পরীক্ষা দিতে হবে।

লন্ডনের কিংসলে হলে মহাত্মা গান্ধী

আত্মনিগ্রহ এমনকি, মৃত্যু বরণের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই গান্ধীজীর অহিংস নীতি শুধুমাত্র একটা জীবন দর্শন বা বৌদ্ধিক তত্ত্ব নয়, বরং ব্যক্তিগত জীবনচর্যারও এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে যে গান্ধীজীর অহিংস নীতি শুধুমাত্র এক ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ নয় যা শুধু ব্যক্তিমানুষের আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বরং এই অহিংস নীতি আমাদের অস্তিত্বের ভিত, যা পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত, এই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বর্তমানের হিংসাদীর্ণ সমাজের প্রতি তাঁর একটাই বার্তা, সমস্ত রকম মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহিংসার পথ গ্রহণ করতে হবে। তাঁর কথায়... 'আমি অহিংসাকে শুধুমাত্র এক ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ বলে মনে করি না। এক সামাজিক সদাচার, যা অন্যান্য সদ্‌গুণের মতোই অনুশীলন করতে হবে। সমাজের পারস্পরিক বিভিন্ন আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় অহিংস নীতিই অবলম্বন করা হয়। একবার একে বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে'[৬]। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে অহিংসা মানুষের সহজাত গুণ এবং একমাত্র অহিংসার পথেই মানবসমাজ টিঁকে থাকবে।

কাঠামোগত হিংসার মোকাবিলায় গান্ধীজীর ভাবনা

কাঠামোগত হিংসা বলতে আমরা কী বুঝি? ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, ব্যাপক মাত্রায় শিল্পায়ন এবং এক শ্রেণির হাতে অন্য শ্রেণির শোষণের ফলেই কাঠামোগত হিংসার জন্ম। অহিংসা ও শান্তির প্রবক্তাদের মতে এগুলোই কাঠামোগত হিংসার নিদর্শন। গান্ধীজীর মতে, এগুলো হল মানুষের সহজাত নীতিবোধের অবমাননা যার ওপর বর্তমান সমাজ বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না। গান্ধীজীর 'অপরিগ্রহ' নীতি এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ 'অছি ব্যবস্থা বা ট্রাস্টিশিপ' এবং সেইসঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ এসময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অহিংস নীতির অনুগামী করে তুলতে পারলেই বর্তমানের নানা সংকটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনই এক ধরনের হিংসা বলে মনে করতেন তিনি। তাই সমাজে কাঠামোগত হিংসার ভয়াবহতা কমাতে শাসন প্রণালী (পঞ্চায়েতি রাজ) ও অর্থনীতির (গ্রাম স্বরাজ) বিকেন্দ্রীভবন ঘটানোর জোরদার সওয়াল করেছেন তিনি। এহেন সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন স্তরে নৈতিক নেতৃত্ব

দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যে সমাজে কোনও শোষণ থাকবে না, যেখানে কোনও মানুষকে প্রান্তিক করে তোলা হবে না, যেখানে কোনও কাঠামোগত হিংসা থাকবে না, তেমন এক সমাজ গড়ে তোলার জন্য নৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন বলে মনে করেন গান্ধীজী। একজনের মতবাদ অন্য সবার ওপর চাপানো নয়, বরং ব্যক্তিমানুষের জীবন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্তি ও ভালোবাসার প্রসার ঘটিয়েই নৈতিক নেতৃত্ব দান করতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচার বা আর্থিক বৈষম্যজনিত যে সমস্যাগুলি আজকের সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অহিংস উপায়েই তার মোকাবিলা করতে বলেছেন গান্ধীজী। অহিংস এই হাতিয়ার হল 'সত্যাগ্রহ'। 'প্রেমের নীতির' ওপর ভিত্তি করে যে সত্যাগ্রহের ধারণা গড়ে উঠছে যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আইন অমান্য, অসহযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে, কিন্তু এসবের লক্ষ্যই এক... যারা অন্যায় করছে তাদের মনে ন্যায়ের চেতনা জাগিয়ে তোলা। তবে গান্ধীজীর মতে, এই পথ সবার জন্য নয়, যারা নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও যারা নিজেকে বশে রাখতে পারে একমাত্র তাঁরাই এই আদর্শ অবলম্বন করতে পারবে। বর্তমান সমাজে নানা জাতিগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বড়ো প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ অহিংসও অভিনব উপায়ে এই সমস্ত বিবাদের নিরসন ঘটাতে পারে। একমাত্র তাঁর আদর্শই বিবদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে তাদের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে তুলতে পারে।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তি—আধুনিক শাসন ব্যবস্থার এই দু'টি প্রধান স্তম্ভের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়েও গান্ধীজীর একটি বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষই যাবতীয় ক্ষমতার আধার। রাষ্ট্র তথা সরকারের ক্ষমতার উৎসই হল জনসাধারণ। আমজনতার সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্র ও সরকার কখনওই টিঁকে থাকতে পারে না। তাই রাষ্ট্রযন্ত্র যখন মানুষের ওপর শোষণ চালায়, তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সাধারণ মানুষের একটাই কর্তব্য—অসহযোগ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে আর সহযোগিতা না করা। আর এভাবেই নৈতিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে রাষ্ট্রকে ন্যায়ের পথে আনতে হবে। আর এজন্য মানুষকে সবসময় রাজনৈতিকভাবে সচেতন থাকতে হবে এবং নৈতিক গুণগুলি অনুশীলন করতে হবে। তাঁর মতে, নীতিবোধ না থাকলে বা সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ পরিহার করতে না পারলে ব্যক্তি তথা সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা নেই।

সাংস্কৃতিক হিংসার মোকাবিলায় গান্ধীজীর ভাবনা

গান্ধীজী শুধুমাত্র হিংসার বাহ্যিক রূপটিকেই দেখেননি, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন মাত্রায় হিংসা যে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে সে ব্যাপারেও অবহিত ছিলেন তিনি। সমাজে যে শোষণ ও প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া চলে তাও এক ধরনের হিংসা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কোনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা সমাজে হিংসার বিভিন্ন মাত্রা ও দিক রয়েছে যেমনটা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে। হিংসার বহুমাত্রিকতার বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে অ্যালেন (Allen) বলেছেন, 'সমাজে কোনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ওপর অপ্রত্যক্ষভাবে যে মানসিক, ভাষাগত তথা সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হিংসা চলে তা কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা সমাজের কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে'[৭]। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় হানাহানির সময় এই হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে (যেমন, সন্ত্রাসবাদ)। গান্ধীজীর মতে, শুধু কোনও হিংসাত্মক কাজ বা ঘটনাকেই হিংসা বলে না, বরং সমাজের কোনও জনগোষ্ঠী যদি সামাজিক-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হন বা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন, তবে তাও এক ধরনের হিংসা। কোনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ওপর সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর আধিপত্যের ফলেই যেহেতু হিংসার উদ্ভব ঘটে, তাই একে একটি বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা হিসাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না বা এর সমাধানও করা যাবে না বলে মনে করেন গান্ধীজী। খণ্ড খণ্ড ঘটনা হিসেবে নয়, বরং এই হিংসাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। সেইসঙ্গে যে বিশ্বদর্শনে এই হিংসার জন্ম ঘটছে তাকেও বিশ্লেষণ করতে হবে।

হিংসা সম্পর্কিত সমসাময়িক আলাপ-আলোচনায় আমাদের প্রচলিত বিশ্বদর্শন বা তার প্রকৃতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয় না। এই প্রচলিত ধারণাকেই আমরা চূড়ান্ত, অখণ্ডনীয় ও প্রশ্নাতীত বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে অনেকেই বলেন যে আমাদের এই প্রচলিত বিশ্বদর্শনের মধ্যেই

হিংসা নিহিত রয়েছে। অ্যালেন-এর মতে, 'আমাদের বিশ্বদর্শন প্রকৃতিগতভাবেই সহিংস এবং আমরা এমনভাবে সমাজবদ্ধ ও শিক্ষিত হয়েছি যে এটাও আমরা বুঝতে পারি না যে অন্যদের প্রতি বা প্রকৃতির প্রতি আমরা কতটা হিংসাত্মক আচরণ করছি'[৮] আমাদের এই 'প্রচলিত বিশ্বদর্শন'-এ তথাকথিত 'প্রচলিত' ধারণার বাইরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলিকে গোপন রাখা হয় এবং সেগুলিকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা'-র তকমা দেওয়া হয় এবং চূড়ান্ত স্তরে একে বলা হয় 'সন্ত্রাসবাদ'। এই সহিংস বিশ্বদর্শন ও তার আদর্শ পন্থাগুলি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গান্ধীজী এবং সেইসঙ্গে জোর দিয়েছেন এক 'অহিংস বিশ্বদর্শনের' ওপর। তিনি বলেছেন আমাদের যে বিশ্বদর্শন-কে স্বাভাবিক বলে তুলে ধরা হচ্ছে তার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ এই স্বাভাবিক বিশ্বদর্শন প্রকৃতিগতভাবেই সহিংস। একটি অহিংস বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলার জন্য 'স্বদেশি' আদর্শে নতুনভাবে সামাজিকীকরণ ও সমাজে 'নয়ি তালিম'-এর মাধ্যমে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, এই ধারণাগুলির মধ্যে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা অন্যদের সঙ্গে আমাদের অহিংসার বন্ধনকে যেমন লালন করবে, তেমনিই এই বিশ্বকে আরও মানবিক করে তুলবে।

আমাদের বর্তমান সমস্যার অন্যতম প্রধান হল প্রকৃতির ওপর হিংসা, যাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক সংকট। বর্তমানে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক সংকটের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তা আদতে কোনও সমস্যা নয়, বরং মানুষ ও প্রকৃতির যে পারস্পরিক

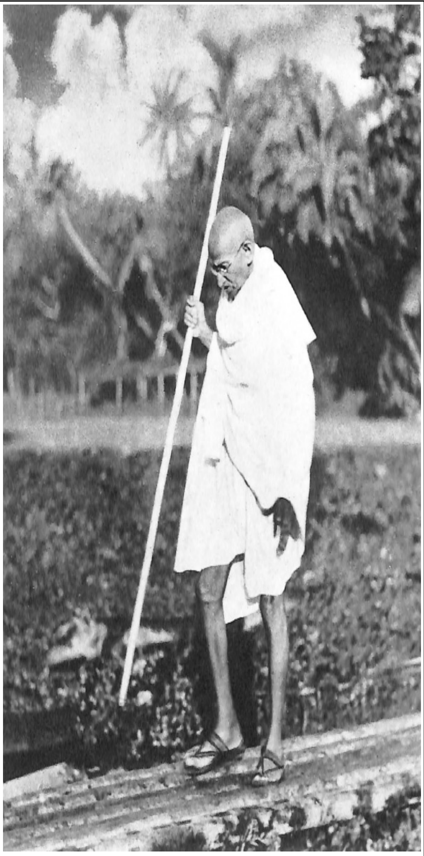

অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালির পথে (নভেম্বর, ১৯৪৬)

সম্পর্ককে আমরা ভুলবশত স্বাভাবিক বলে তুলে ধরছি এটা সেই ভ্রান্ত ধারণারই নিদর্শন। প্রকৃতিকে মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি গান্ধীজী। তাঁর মতে, মানুষের উচিত চারপাশের জীবজগতের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখা। নিজেদের ভোগসুখের জন্য প্রকৃতির ওপর শোষণ না চালিয়ে মানুষ যেন প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে।

বর্তমানে প্রকৃতির যে সংকট উপস্থিত হয়েছে তার মূল কারণটিকে উৎপাটিত করার কথা বলা হয়েছে গান্ধী দর্শনে। এজন্য তিনি যে দাওয়াই দিয়েছেন তাকে এ যুগে বলা হচ্ছে 'মানবিক বাস্তুতন্ত্র' (হিউম্যান ইকোলজি)। মুলাক্কাট্টু-র মতে, 'মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ওপর যা প্রভাব পড়ে বলতে গেলে সেটাই হল 'মানবিক বাস্তুতন্ত্র'। তিনি আরও বলেছেন যে 'আমরাও (মানুষ) সম্পদ উৎপাদন, সেই সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার, বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের বিকাশ এবং নিজেদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে উৎসাহী। আর এমন এক পরিবেশে এগুলি ঘটে যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। এর অর্থ হল আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে অন্য মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে গান্ধীজী পরিবেশের সংকটকে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখেননি। তিনি মানুষের গড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই প্রকৃতিকে দেখেছেন। মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান বলতে শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের পন্থাকেই বোঝায়। প্রকৃত স্বার্থে এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবন, তথা অর্থনীতিতে 'পরিবেশ-বান্ধব চিন্তাভাবনা' সঞ্চারিত করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও ছন্দ মেনেই উন্নয়নের মডেল গড়ে তোলার সওয়ালও করেছেন তিনি। একমাত্র তাহলেই প্রকৃতির ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব আমরা।❑

তথ্যসূত্র :

(১) Riches, D (Ed.). *The Anthropology of Violence*. Oxford : Basil Blackwell, 1986. p. 23.
(২) Foucault, M. *The Politics of Truth*. New York : Semiotext (e). 2007.p. 139.
(৩) Stanko, A.E (Ed.). *The Meaning of Violence*. New York : Routledge. 2003, p. 3.
(৪) Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means*. New Delhi : Sage Publication. 1998, p. 23.
(৫) Gandhi, M.K. *Hind Swaraj or Indian Home Rule*, Ahmedabad : Navajivan, 2008, p. 54.
(৬) The Collected Work of Mahatma Gandhi, (Vol. 68), New Delhi : The Publication Division, 1977, p. 278.
(৭) Allen, Douglous. *Comparative Philosophy and Religion in Times of Terror*. U.K : Lexington books. 2006. p. 24.
(৮) Ibid. p. 23.
(৯) Moolakkattu, John S. *Gandhi as a Human Ecologist*. J Hum Ecol, 29(3). 2010. p. 152.

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to ________________________ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. ______________________________ Date ____________________

Name (in block letters) __________________________

Category Student / Academician / Institution / Others

Address ____________________________

____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone ____________________________

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

সার্ধশতবর্ষে মহাত্মার কথা

প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বচ্ছ ভারত

স্বচ্ছতার পথে এক কদম

গান্ধীজী আজীবন যে সংগ্রাম করে গিয়েছেন, তা দেশের স্বাধীনতা আনার মধ্যেই সীমিত ছিল না। মানবমুক্তির মন্ত্র, উত্তরণের মন্ত্র তিনি শুনিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। এই পরিবর্তন তিনি এনেছেন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে (inner power) জাগ্রত করার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সেইভাবেই তিনি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর জীবনদর্শনের এটিই মূল সুর এবং তাতেই রয়েছে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্ধকারের মধ্যে আলো আনার দিশা। স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব রাষ্ট্রনেতা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাদেরও মননে গান্ধী রয়েছেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যিনি মহাত্মা অভিধায় ভূষিত তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষে দেশভর উঠেছে এক ব্যাপক নব-উন্মাদনা ও সচেতনতার লহরী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মোদ্যোগ, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য নেতৃত্বের ভূমিকা আবার নতুন করে আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং তাঁর বাণীর অমোঘ প্রাসঙ্গিকতা প্রকট হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তিন মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে গুরুদেব, ১৮৬৩-তে স্বামীজী ও ১৮৬৯-এ গান্ধীজী। এই তিনজনের যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ ভারতে ব্রিটিশ যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবহে যে জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা ভারতকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে সম্প্রতি যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে, তাহল মহাত্মাজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানটি। আজকের পৃথিবীতে তাঁর চিন্তা, আদর্শ ও মূল্যবোধের যে ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতা তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে ১৯৩-টি প্যানেল-সহ সৌরশক্তি পার্কের উদ্বোধন ও State University of New York Campus-এ গান্ধী শান্তি উদ্যোগে একশো পঞ্চাশটি বৃক্ষরোপণ তথা গান্ধীজীর উপর U.N. Comemorative Stamp Release উল্লেখযোগ্য।

ইউনেসকো (UNESCO) বলেছে, তাদের যে গোটা দুনিয়াজুড়ে ব্যাপীত কর্মকাণ্ড তার প্রায় সবই গান্ধীজীর জীবন, শিক্ষা ও অবদানের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রায় সব মুখ্য কর্মসূচি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও জনসংযোগ তথা জনকল্যাণ গান্ধীজীর চিন্তা-ধারারই অনুরূপ। UNESCO (ইউনেসকো) MGIEP বা Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development প্রতিষ্ঠা করেছে। যার উদ্দেশ্য দুনিয়ায় এক শান্তিপূর্ণ ও টেঁকসই সমাজ নির্মাণ।

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞান শুধুমাত্র জনকল্যাণ নয়, জাতীয় মূল্যবোধগুলিকেও সযত্নে রক্ষা করে। সর্ব অর্থেই বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত রেখে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যথাযথভাবে বজায় রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর একজন মহান জনসংযোগকারী নেতা হিসাবে মনে করা হয়। এও দেখা গেছে যে, তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছেন, যেমন, যুবশক্তি, মহিলা ও শিশু, নিপীড়িত, বঞ্চিত জনতা, সকলকে সঙ্গে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ গঠন, গান্ধীজী সেই উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন আজীবন।

গান্ধীজীর জীবন নানা কর্মপ্রবাহ ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'আমার জীবনই আমার বাণী' সার্থকভাবে ধরা পড়েছে তাঁর আত্মজৈবনিক বই, 'The Story

[লেখক প্রাক্তন মহানির্দেশক, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : bandyopk@yahoo.co.in]

of My Experiments With Truth'-এ, যেটি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক কমিটির বিচারে একশোটি সর্বোৎকৃষ্ট 'Spiritual Books of the 20th Century'-এর মধ্যে অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। মূলত, গুজরাটিতে লেখা দু'খণ্ডে প্রকাশিত বইটি মহাদেব দেশাই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এর কিছুটা অংশ দেশাই-এর বন্ধু ও সহকর্মী পেয়ারেলাল মহাশয় করেছিলেন। এই বইটি ও গান্ধীজীর অজস্র লেখায় তাঁর জীবন দর্শন ও কর্মের অনুপ্রেরণার উৎস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সব লিখিত রয়েছে। আত্মজীবনীর প্রথম অংশে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, কীভাবে নানা অন্যায় কাজ বা পাপকার্য থেকে তাঁর উত্তরণ হল, এ সবের মধ্য থেকে তাঁর জীবনের মূল কথাটি প্রতিভাত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর জীবনের যে অংশ কেটেছে তাতে জতিবিদ্বেষী সরকারি নীতি ও কার্যাবলির বিরুদ্ধে তাঁর নিরলস ও আপোশহীন সংগ্রামের কথা জানা যায়। নানা প্রভাব গান্ধীর উপর পড়েছিল। রাশিয়ান লেখক লিও টলস্টয়, জন রাস্কিনের 'Unto This Last', ভগবদ্‌গীতা ছাড়াও বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে 'Sermon on the Mount' বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। লিওর সহগামীদের জন্য পুরোমাত্রায় আত্মবিলোপ বা Self-denial-এর যে নীতি এবং গীতা থেকে প্রাপ্ত আত্মপরিপূর্ণতা বা Self-fulfilment-এর যে উচ্চতর রূপ তার দ্বারা গান্ধীজী যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভোগবাদী জীবনচর্চার একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে Self-denial বা Self-abstinence প্রসূত জীবনশৈলীর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজ করেছিলেন। আধুনিক ইংরেজ কবি T.S. Eliot-এর 'Murder in the Cathedral'-এ Thomas Becket-এর কথা মনে করিয়ে দেয় তা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম ও মানবমুক্তির ক্রিয়াকলাপের প্রথম পর্যায় পার করে, যখন ভারতে আসেন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর কার্যাবলি নানা দিক থেকে দেশকে তথা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও সহিষ্ণুতার নীতি, অসহযোগ আন্দোলন, ডাণ্ডি অভিযান, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং সর্বোপরি নিজের উপর গভীর আত্মবিশ্বাসের অনুশীলন, সর্বক্ষেত্রে ভারতবাসীকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে এক পরিণত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে এক বিরাট অবদান রেখে গিয়েছে।

গান্ধীজীর জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর কর্মজীবন বা মানবোন্নয়ন সাধনের পদ্ধতিকে সময় ও স্থানের নিরিখে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি দক্ষিণ আফ্রিকা পর্ব (১৮৯৩-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও দ্বিতীয়টি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্ব (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সংগ্রামের নেতৃত্বে আসীন ছিলেন)। গান্ধীজী একজন অনবদ্য জনসংযোগকারী নেতা ছিলেন। তাঁর বহুমুখী আন্দোলন জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ছিল। জাতি-ধর্ম, ধনী, নির্ধন, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণি সকলকে নিয়ে তাঁর কর্মসূচি। তাঁর ব্যাপকতর সংগ্রাম। ছ'টি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন ইংরেজি, গুজরাটি এবং হিন্দিভাষায়। পত্রিকাগুলি—Young India, Navjivan, হরিজন, হরিজন-সেবক, Indian Opinion এবং হরিজন-বন্ধু। তাঁর চিন্তাধারা ও মনের কথা যাতে সর্বসাধারণের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছয় সে ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছিলেন। এর ফলে একজন সার্থক জননেতার অতিরিক্ত, সার্থক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে একজন সার্থক নেতার ভূমিকা পালন করেছেন ও সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। সহজসরল ভাষায় 'Outpourings of heart and soul' প্রকাশ তাঁর নেতৃত্বকে এক মহান উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গান্ধীজীর লেখা থেকে তাঁর ধ্যানধারণার সম্যক পরিচিতি পাওয়া যায়। স্বাধীনতা, স্বরাজ—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, মানুষের মুক্তি, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সব বিষয়ে তিনি যে স্বচ্ছ মত পোষণ করতেন এবং প্রকাশ করেছেন তার ব্যাপকতর প্রচার ও যথাযথ জ্ঞান আবশ্যক। Hind Swaraj, Selections from Gandhi প্রভৃতি পুস্তক এব্যাপারে, যথেষ্ট সাহায্য করে। স্বরাজ ও দেশপ্রেম বুঝতে তিনি নির্দেশ করেছেন জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ। "By patriotism I mean the welfare of the whole people...by Swaraj I mean the Government of India by the vote of the largest number of the adult population, male or female, native born or domiciled who have contributed by manual labour to the service of the state and who have taken the trouble of having their names registered as voters. I hope also that real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused...It means the consciousness in the average villager that he is the maker of his own destiny, he is his own legislator through his chosen representatives." অর্থাৎ স্বরাজ বলতে গান্ধীজী বুঝিয়েছেন তেমন সরকার যা গঠিত হয় জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে। সাধারণ মানুষের গরিষ্ঠ অংশের নির্বাচিত সরকার। এতে গড়পড়তার সাধারণ মানুষও মনে করবে যে তার নিজের ভাগ্যবিধাতা এবং তার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তার হয়েই নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করছে।

পূর্ণ স্বরাজ বলতে তিনি বলেছেন, "full economic freedom for the toiling millions. It is no unholy alliance with any interest for their exploitation" অর্থাৎ পূর্ণ স্বরাজ তখনই আসবে যখন লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জন্য আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হবে এবং নিপীড়ন অন্তর্হিত হবে। খাদি, গ্রামোদ্যোগ ও কুটির শিল্প, চরকার প্রতি আগ্রহ গান্ধীজীর এই জন্মজন্মান্তরের অত্যাচার নিপীড়িত দলিতবর্গের উত্থানের পক্ষে সুচিন্তিত দিকনির্দেশনার কথাই বলে। শুধু ভারতে নয়, দেশের বাইরে বিশ্বস্তরে যে সমস্ত পথ সুস্থায়ী বা টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলির রূপায়ণের ব্যাপারেও এই পথ নতুন বার্তা বহন করছে। সুষম উন্নয়ন, যা পরিবেশ-বান্ধবও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্য রক্ষার যেসব কথা বলা হচ্ছে, তার সঙ্গে গান্ধীজীর চিন্তাধারার সাযুজ্য সঠিক অর্থে প্রাসঙ্গিক এবং তা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের

এক আদর্শ মসীহারূপে যেন তিনি বিরাজ করেছেন। ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে এর আবেদন সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা সকল মানুষের কাছে। ১৯২০-এর দশক থেকে সত্যাগ্রহ প্রভৃতি আন্দোলন চালিয়েছেন, তিনি লিখলেন, "My religion has no geographical boundaries... Isolated independence is not the goal of the world states. It is voluntary interdependence...There is no limit to extending our services to our neighbour across state-made frontiers"...অর্থাৎ, আমার ধর্মের বা নীতির কোনও ভৌগোলিক সীমা নেই। গান্ধীজী সাধারণ অর্থে এক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন না। সবার উপরে তিনি একজন বিশ্বচেতনায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানবতাবাদী চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

হুমায়ুন কবিরের ভাষায়, "Gandhiji's deep sense of spirituality forged a new weapon of political warfare. He realised that violence can provoke only greater violence... Gandhiji will always be remembered as perhaps the first non-violent liberator of a nation." অর্থাৎ, অহিংসা ও আধ্যাত্মিকতাকে এক নতুন অস্ত্র হিসাবে গান্ধীজী সফল প্রয়োগ করেছিলেন। তিনিই সম্ভবত একটি দেশে অহিংসার মাধ্যমে মুক্তি এনে দিয়েছিলেন।

এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার প্রমুখ নেতা গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

এক সার্থক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিশ্বাসে ভরপুর গান্ধীজীর বাণী আজকের বিশ্বায়নের যুগে অত্যন্ত সঠিক ও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any." Globalisation বা বিশ্বায়নের আবহে Glocalisation বা স্থানিক সংস্কৃতির প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টেঁকসই বা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য (Sustainable Development Goals or SDGs) রিও-ডি-জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের সম্মেলনে স্থির করা হয়। পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত দেশগুলি তার সফল মোকাবিলা করার জন্যেই এই রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়। দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক সমস্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কিত সমস্যার দূরীকরণ যে Millennium Development Goals বা MDGs যা ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয় তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে। এর পরই SDGs উদ্দেশে কাজ শুরু হয়। MGGs-এর অনেকগুলিই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে এক বিলিয়নের বেশি লোকের দারিদ্র্য মুক্তি, HIV-AIDS-এ পীড়িতদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশভাগ হ্রাস করা, স্কুলছুট পড়ুয়াদের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমানো প্রভৃতি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল। এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে যে SDGs-এর সূচনা তার মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতি, শিক্ষার যথাযথ বিস্তার প্রভৃতি রয়েছে এবং দ্রতিগতিতে কাজ চলছে। এখানে স্মরণ করা দরকার যে, গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের সঙ্গে এই SDG উদ্দেশ্যগুলি অনেক সময় পরিপূরক। যাইহোক, যে সতেরোটি লক্ষ্য SDG-এর মধ্যে রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) পৃথিবীর সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ।

(২) ক্ষুধা নিরসন, খাদ্য সুরক্ষা বিধান, উন্নত পুষ্টি এবং টেঁকসই কৃষি বিকাশ।

(৩) সব বয়সের মানুষের স্বাস্থ্যবিধান ও শারীরিক মঙ্গলের ব্যবস্থা করা।

(৪) সব বয়সের মানুষের কাছে সুষ্ঠু ও গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষার সুযোগ বিস্তার করা।

(৫) লিঙ্গবৈষম্য দূর করা এবং সমগ্র বিশ্বের মহিলা ও কন্যাসন্তানদের ক্ষমতায়ন।

(৬) পর্যাপ্ত জল সরবরাহ ও সকলের জন্য স্বচ্ছতর পরিবেশ প্রভৃতির সংস্থান।

(৭) সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য, ব্যয় সাশ্রয়ী সুস্থায়ী ও আধুনিক শক্তির ব্যবস্থা করা।

(৮) সুস্থায়ী আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা যাতে সকলের সঠিক ও পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়।

(৯) সুদৃঢ় পরিকাঠামো নির্মাণ, সুস্থায়ী শিল্পায়নের মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে সব শ্রেণির মানুষের অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব হয় এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনার সম্ভাবনা থাকে।

(১০) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসাম্য যেন ক্রমে হ্রাস পায়।

(১১) এমনভাবে নগরায়ণ এবং মানুষের বাসস্থান নির্মাণ করা যায়, যাতে সেখানে সকলকে স্থান দেওয়া যায় এবং সেটি নিরাপদ ও টেঁকসই হয়।

(১২) উৎপাদন এবং উপভোগ যেন সমভাবে করা যেতে পারে সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া।

(১৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও এর কুফল থেকে মুক্ত থাকার জন্য সম্যক ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৪) নদী, সমুদ্র, মহাসাগর, সর্বক্ষেত্রে জলজ সম্পদের ব্যবহার যাতে যথাযথ হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(১৫) পৃথিবীর পরিবেশ ও বনসম্পদ রক্ষা, মরু ভূমির প্রসার রোধ, ভূমির ক্ষয় ও অবনমন বন্ধ করা, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরি পদক্ষেপ।

(১৬) শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন যেখানে সকলের স্থান থাকবে, সকলের জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা ও সর্ব স্তরে কার্যকরি জবাবদিহির সংস্থান-সহ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, এ সবের ব্যবস্থা করা।

(১৭) সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণের বিধান-সহ বিশ্বস্তরে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য এক সুষ্ঠু পরিকাঠামো নির্মাণ, এ সবই SDG-র মূল লক্ষ্য।

যেমন, আগে বলা হয়েছে সুস্থায়ী উন্নয়নের যে জগৎব্যাপী কর্মকাণ্ড চলছে মহাত্মার চিন্তাধারার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। রাষ্ট্রপিতার মহাপ্রয়াণের ৭১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, তিনি ও তাঁর আদর্শ, মূল্যবোধ, কর্মপন্থার দিশানির্দেশ কি এখনও প্রাসঙ্গিক? তিনি একজন নিছক কর্মযোগী ছিলেন, তা নয়। তাঁর বাণী, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সব লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন বড়ো মাপের Communi-

cator ছিলেন। কালের কষ্ঠিপাথরে ধ্যানধারণা ও কর্মসূচি সব যাচাই করা যায়। মহাত্মার জীবন এক অতল মহাসমুদ্রবিশেষ। তাঁর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড এতই গভীর এবং ব্যাপক যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, তাঁর 'দিনের সকল নিমেষ ভরা আকাশের ধাম।'

গান্ধীজীর জীবনের সমস্ত কাজের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তা তিনটি মূল বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক, অহিংসা, দুই, সত্যাগ্রহ, তিন ভক্তিভরে অমোঘ মানবসেবা। এই তিনটি স্তম্ভ সময়কাল পেরিয়ে আজও যেকোনও কর্মযোগীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে ততদিন এর গুরুত্ব কমবে না। এই আপোশহীন মনোভাবই গান্ধীজীকে এক মহান উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। এখানে কোনও দ্বিধা নেই, ধোঁয়াশা বা অস্বচ্ছতা কোনওটাই নেই। জনসংযোগের অজস্র মাধ্যম ও নানা সময়ে তাঁর ভাষণে তিনি এবিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনের প্রভাব দেশকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল। নেলসন ম্যান্ডেলা ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের উদাহরণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে

আজকের যুগ ও যুগধর্মের দিকে তাকালে অনেকে বলবেন, এই সংস্কৃতি অনেকাংশে জড়বাদী, ভোগবাদী এবং নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একেবারে মোড়া। বলা যায়, সর্বব্যাপী নেতিবাচক আবহ। এই অবস্থায় গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? মার্টিন লুথার কিং গান্ধীজীর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, "If humanity is to progress, Gandhi is inescapable. He lived, thought and acted, inspired by the version of a humanity evolving towards a world of peace and harmony. We may ignore him at our own risk." অথবা, মানুষকে যদি উন্নতি করতে হয়, তবে গান্ধী অপরিহার্য। শান্তি ও সম্প্রীতির আবহ তৈরি করার জন্য গান্ধীজী কাজ করেছেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করলে মানবজাতির সমূহ ক্ষতি। ড. রবীন্দ্র কুমারের ভাষায়, "For Gandhi, non-violence is an active, pure and all-timely value. It is the best means to reach the truth. In other words, only through Ahimsa can life be made meaningful. Gandhi had the firm opinion that except non-violence there is no other means to reach a goal. Without Ahimsa, one can not know the absolute Truth. In this regard Gandhi wrote the following in Young India—

'Means are after all everything. As the means so the end. There is no wall of separation between the means and the end.' Non-violence is the nucleus in Gandhi's ideas. In other words, his views revolved around Ahimsa and as mentioned it is the only means to achieve Truth, and to achieve Truth is the goal of one's life or to get completenes of life." অর্থাৎ, গান্ধীর জীবনদর্শনে অহিংসা, সত্য ও উপায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসা গান্ধীজীর সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় তাঁর সব কাজে এবং মতামতে একটা গতিশীলতা ছিল এবং সেটি বিভিন্ন সময়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এবারে আন্তর্জাতিক স্তরে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গান্ধীজীর চিন্তাধারার অনুরণন শোনা গেল। স্বচ্ছ ভারত থেকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও Single Use প্ল্যাস্টিক বর্জন নিয়ে ভারতে যে গণ-আন্দোলনের প্রকল্পগুলি সেগুলিকে গান্ধীদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীজীর দর্শন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, "Today the definition of democracy has a limited meaning that the people should choose the government of their choice and the government should work according to the expectations of the people. But Gandhiji had stressed the real strength of democracy. He taught people to the self-reliant and not to depend on government...Gandhiji never wanted to create influence through his life but his life itself became the reason for inspiration. Today we are living in an era of 'How to Inspire' but Gandhiji's vision was 'How to Inspire'...I believe that as long as Gandhiji's philosophy remains embedded in humanity, he will remain relevant and continue to inspire us."

অর্থাৎ, গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র শুধুমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন নয়। সরকারের উপর নির্ভরতার বদলে আত্মনির্ভর হতে হবে। জনগণের অংশীদারিত্ব গণতান্ত্রিক সরকারের মূল কথা।

ওই আলোচনা সভায়, যার শিরোনামে ছিল, "Leadership Matters—Relevance of Mahatma Gandhi in the contemporary world", রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ ছাড়াও বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, জামাইকা, নিউজিল্যান্ড, ভুটান প্রভৃতি দেশের সরকার-প্রধানরা অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী একধাপ এগিয়ে বললেন, সন্ত্রাসবাদ, সংঘাত, আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা, আর্থিক অসাম্যের মতো বিষয়গুলি রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রভাবিত করছে। এসবের মোকাবিলা করতে যথার্থ নেতৃত্ব জরুরি। গান্ধীর দর্শন ও মূল্যবোধ সেই নেতৃত্বের সুদৃঢ় নৈতিক ভিত গড়ে দেবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব গান্ধীজীর চিন্তাধারার গুরুত্ব সম্বন্ধে বললেন, দুনিয়াভর ক্ষমতায়ন ও সাম্যের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে গান্ধীর আদর্শ অমূল্য পাথেয়। স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব রাষ্ট্রনেতা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাদেরও মননে গান্ধী রয়েছেন।

গান্ধীজী আজীবন যে সংগ্রাম করে গিয়েছেন, তা দেশের স্বাধীনতা আনার মধ্যেই সীমিত ছিল না। মানবমুক্তির মন্ত্র, উত্তরণের মন্ত্র তিনি শুনিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। এই পরিবর্তন তিনি এনেছেন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে (inner power) জাগ্রত করার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। সেইভাবেই তিনি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর জীবনদর্শনের এটিই মূল সুর এবং তাতেই রয়েছে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্ধকারের মধ্যে আলো আনার দিশা।❑

প্রাতঃস্মরণীয় গান্ধী, বিস্মৃত তাঁর রাজনীতির ভাষা

কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

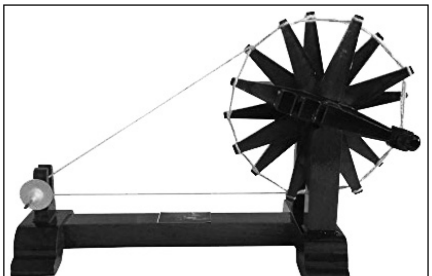

রাজনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ, রাজনীতির ভাষা সবই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর। গান্ধী জীবনে ভোটে দাঁড়াননি, সরকারি ক্ষমতা ভোগ করেননি, কতকটা সেই কারণেই হয়তো তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থে বৃহত্তর কোনও লক্ষ্য বিসর্জনও দেননি। গণ-রাজনীতির সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে তিনি রাজনীতির যে ভাষার সৃষ্টি করেন তাও পরিস্থিতি সাপেক্ষে কার্যকর। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির আঙিনায় আলাপ-আলোচনা আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে যেকোনও বিষয় নিষ্পত্তি করার যে পরিসরটি থাকে সেটিকেই যথার্থ ব্যবহার করার পথ দেখিয়েছিলেন গান্ধী। সরকারের কর্তব্য প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করা, সেই কারণেই প্রকৃত গণতন্ত্রে সরকার এবং নাগরিকের পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং মতান্তরকে মনান্তর মনে না করে ভিন্ন মতের জন্য জায়গা করে দেওয়াও গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২০১৯ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা ভারতে সরকারি উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পরের সাত দশকে ভারতের প্রায় সব শহরেই প্রধান রাজপথগুলি, বিভিন্ন সরকারি ভবন, উদ্যোগ এবং কর্মসূচি তার নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তাঁর প্রতি এই সম্মান দলমত নির্বিশেষে দেখানো হয়ে এসেছে। গত পাঁচ বছরে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির পুরোভাগেও গান্ধীকে রাখা হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারতবাসীর কাছে গান্ধীর আবেদন এবং প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গান্ধী আজ শুধু একটি প্রতীক হয়েই থেকে গিয়েছেন। তাঁর আদর্শ তো আগেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছিল, তাঁর রাজনীতির ভাষাও আজ প্রায় বিস্মৃত।

১

গান্ধীবাদ বা গান্ধীয় আদর্শ অতি জটিল বিষয়, এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার আলোচনা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এই নিবন্ধের উপজীব্য গান্ধীয় রাজনীতির ভাষা, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বের দরবারে গণ-আন্দোলনের এক অভিনব দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক বিরোধিতার ভাষাটাই বদলে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পিছু হঠতে বাধ্য করার এই রাজনৈতিক ভাষা ভারতে কার্যত বিস্মৃত হলেও বিশ্বের অন্যত্র; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ ব্যবস্থা বিরোধী রাজনীতি বা ইজরায়েল-অধিকৃত প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রাম—সর্বত্রই অহিংস গণ-আন্দোলন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে।

গান্ধীবাদী রাজনীতি তৎকালীন ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক পন্থার থেকে স্বতন্ত্র ছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের মতনই গান্ধীও দীর্ঘদিন স্বরাজের পরিবর্তে স্বশাসনের কথাই বলেছিলেন; ১৯৩০ পর্যন্ত গান্ধী ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার কথাই বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। রাজনৈতিক লক্ষ্য নরমপন্থীদের মতো হলেও আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে তিনি চরমপন্থীদের মতো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করেন। নরমপন্থী উদ্দেশ্যের সঙ্গে চরমপন্থী উপায়ের সমন্বয়সাধন করেই সৃষ্টি হয় গান্ধীবাদী রাজনীতি, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গান্ধীর "সত্যাগ্রহ" এবং "অহিংসা"।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। কারণ গান্ধী মনে করতেন রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশকে ব্যাহত করে। লেভ (লিও) তলস্তয়, জন রাস্কিন এবং হেনরি থোরোর রচনা পড়ে এবং বিলেতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী উপলব্ধি করেন যে বিশ্বজুড়ে যে আধুনিকতা এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রসার ঘটে চলেছিল, যার দুই মূলস্তম্ভ হল আধুনিক রাষ্ট্র এবং শিল্প ব্যবস্থা, তাতে মানবিক মূল্যবোধগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। আধুনিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে গান্ধী অনাড়ম্বর জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালেই গান্ধী এহেন জীবনযাত্রার সন্ধানে তলস্তয় এবং ফিনিক্স নামক দু'টি আশ্রম পত্তন করেন। ভারতে ফিরে সেই ধারণাকেই আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে পত্তন করেন সাবরমতী আশ্রমের। সেখানে গান্ধী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু অনুগামী শিল্প সভ্যতাকে যথাসম্ভব বর্জন করে একটি স্বনির্ভর

[লেখক অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেল : kchat18@gmail.com]

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করেন। গান্ধীর মতে এই গোষ্ঠীবদ্ধ, অনাড়ম্বর জীবনের মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব এবং সত্যের সন্ধান পাওয়াই মানবজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সত্যের অনুসন্ধান সংক্রান্ত এই ধারণাই ছিল গান্ধীবাদী দর্শনের মূল। গান্ধীর মতে, যাই ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তা কার্যত সত্যের পথে অন্তরায় সাব্যস্ত হবে। সেক্ষেত্রে সেই অন্তরায়কে দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসা বা পেশীশক্তির আশ্রয় নেওয়া যতটা অনৈতিক ততটাই অকার্যকর। উদ্দেশ্যসাধনে হিংসার আশ্রয় নিলে প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তিক্ততা আসে তা সমস্যার সমাধান না করে আরও জটিল করে তোলে। তাছাড়া সত্যের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে না জানা থাকায় নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সত্যের পরিপন্থী। এই যুগে গান্ধীয় রাজনীতির এই বৈশিষ্ট্যের প্রাসঙ্গিকতা যতটাই বেড়েছে ততই তা বিস্মৃত হয়ে চলেছে।

গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল তত্ত্ব ছিল ''সত্যাগ্রহ''। অর্থাৎ, সত্যের প্রতি আগ্রহ বা নিষ্ঠাজনিত যে শক্তি। সত্যাগ্রহ বলতে গান্ধী বুঝতেন আলাপ-আলোচনা এবং প্রয়োজনে অহিংস-কিন্তু-সক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তনের নিরলস চেষ্টা। গান্ধীর জীবনদর্শনে মনে করা হ'ত যে, ব্যক্তি মূলগতভাবে কখনও অশুভ শক্তির আধার হতে পারে না। কোনও ব্যক্তি সত্যের পথে তখনই অন্তরায় সৃষ্টি করে যখন সে সত্যের স্বরূপ জানে না। একজন সত্যাগ্রহীর কর্তব্য প্রতিপক্ষকে সত্যের স্বরূপ জানানো এবং তাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা।

যেকোনও কারণে প্রতিপক্ষ সত্যের স্বরূপ বুঝতে অপারগ হলে একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কারণ সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা গেলেও কোনও কিছুর জন্যেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু গান্ধীর মতে, সক্রিয় প্রতিরোধ মানে সহিংস আন্দোলন নয়। মানুষ হিংসার আশ্রয় নেয় তখনই যখন সে প্রতিপক্ষের শক্তিকে ভয় পায় এবং বাহুবলে তাকে পরাজিত করে নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজেকেই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষ যেই জিতুক না কেন, আসলে জয়ী হয় পশুশক্তি, পরাজিত হয় সত্য, মানবিক মূল্যবোধ। পরাজিত পক্ষ নিজের চ্যুতি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন না হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং এই বিদ্বেষ পরে আরও জটিল সমস্যার বীজ হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, গান্ধীর মতে অহিংস প্রতিবাদ হলে, পেশীশক্তি বা পশুশক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে, প্রতিপক্ষের মনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সত্যাগ্রহী শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর আদর্শে এবং বক্তব্যে অবিচল থাকলে প্রতিপক্ষের মনে তার নিজের আদর্শ এবং অবস্থান নিয়ে দ্বিধা জন্মাবে। ফলে হিংসার পরিবর্তে বাদানুবাদ সম্ভব হবে এবং প্রতিপক্ষ শেষ অবধি সত্যের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে গান্ধীর মতে অহিংস আন্দোলন মানে ''নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'' নয়। সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ সক্রিয় না হলে কার্যকর হবে না এটা গান্ধী মানতেন। তাঁর অহিংস চেতনা কখনও দুর্বলতাপ্রসূত ছিল না। সত্যের বলে বলীয়ান সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল প্রতিপক্ষের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা। শাসনকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তাঁর শাসনের অধিকারকে আক্রমণ করলে সচরাচর যে নৈতিক ভিত্তির ওপর শাসনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সেই ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। এহেন প্রতিরোধ অহিংস হলেও সক্রিয়, গান্ধীবাদী রাজনীতির হাতিয়ার ছিল এই অহিংস কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধ।

সক্রিয় প্রতিরোধের উপায় হিসাবে গান্ধী শাসকের নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশেষ বিশেষ কিছু আইন অমান্য করার ওপর জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন যে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে শাসককে বুঝিয়ে দিতে পারে যে শাসকের দেওয়া শাস্তিকে সে ভয় পায় না, অর্থাৎ আইন যে ভীতির ওপর নির্ভর করে কার্যকর হয়, একজন সত্যাগ্রহী সেই ভয়কে জয় করেই এগিয়ে চলে। এছাড়া, গান্ধী প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসহযোগের কথা বলতেন। শাসকের কর্তৃত্ব কায়েম থাকতে গেলে শাসিতের সহযোগিতা ছাড়া তা কায়েম থাকতে পারে না। শাসিত এই সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিলে কর্তৃত্ব ভোগকারী শক্তি বাধ্য হবে তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে রফায় আসতে। এই অসহযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ এবং প্রয়োজনে হরতাল। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই পদ্ধতি দু'টি এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে গণ-রাজনীতির গান্ধীয় পরিভাষাটি আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত— আজ জন-সমাবেশ হয় ব্যক্তি বা দলের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, কোনও রাজনৈতিক অভিমত সরকারের সামনে রাখার জন্য নয় এবং তাঁর থেকেও বড়ো কথা আজকের দিনে সমাবেশগুলি অনেক সময় শাসক পক্ষেরই আয়োজন করা।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পন্থাগুলি ছাড়াও সত্যাগ্রহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নিরন্তর আলাপ-আলোচনা তথা আপোশ মীমাংসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব। গান্ধী সব সময়েই আপশের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে গান্ধী শুধু আপশের স্বার্থেই আপোশের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে কোনও ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহী তাঁর মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে আপোশ করতে পারে না। কিন্তু মৌলিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যেকোনও গৌণ বিষয় নিয়ে আপোশের চেষ্টা করার প্রয়োজন হলে সেই আপোশ সমর্থনযোগ্য।

২

বলা বাহুল্য গান্ধীর এই রাজনৈতিক দর্শন তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আলাদা মাত্রা দিলেও খুব অল্প রাজনীতিবিদই এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগের ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অহিংস রাজনীতির সামগ্রিক প্রভাব অনস্বীকার্য। এই প্রভাবের মূল কারণ গান্ধীবাদ কোনও রাজনৈতিক দর্শন নয়, গান্ধীবাদী রাজনীতির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ওই সন্ধিক্ষণে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়।

রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধী যে আবেদনের সঞ্চার করেছিলেন এবং যে জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছিলেন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন, কারণ তাঁর আবেদন রাজনৈতিক বা সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার করে পৃষ্ঠপোষকতার প্রলোভন দেখিয়ে নয়। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে গান্ধী যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তাঁর তুল্য স্বীকৃতি যৌথভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও বোধকরি উপভোগ করেননি। এর একটা বড়ো কারণ গান্ধীর রাজনৈতিক ভিত উপমহাদেশের প্রাদেশিক বিভাজন অতিক্রম করার প্রবণতা দেখিয়েছিল। গান্ধীর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রায় সব রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে এবং তাদের ক্ষমতার ভিত প্রাদেশিক রাজনীতিতে থাকার জন্য তাদের প্রভাবও প্রধানত একটি বিশেষ প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকত, যেমন, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালব্য, বালগঙ্গাধর তিলক, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ভারতের কোনও প্রদেশে না হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সান্নিধ্যে এসে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধী প্রাদেশিকতার সীমা গোড়াতেই অতিক্রম করে ফেলেন। তাই ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে গুজরাতের আঞ্চলিক রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধী সুদূর বিহারের চম্পারণে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদানের আগেই গান্ধীর নেতা হিসাবে যে পরিচিতি গড়ে উঠেছিল তা এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য যেকোনও নেতার থেকে আলাদা ছিল। তিনি ছিলেন সারা দেশের নেতা, প্রাদেশিক অস্মিতার কোনও আঁচ তাঁর রাজনীতিতে কখনও পড়েনি।

গান্ধীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন লোকেদের সমর্থন পাবার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাধারণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঘটানো, লোককে বিভ্রান্ত করা বা লোক খ্যাপানো নয়। এই ক্ষেত্রেও গান্ধী ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছিলেন। গান্ধীর আগে রাজনীতির গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন দল ও সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে। তৎকালীন রাজনীতির বিস্তৃতি ছিল মূলত নগরাঞ্চলে, সমাজের উচ্চবিত্ত তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র সংগঠন ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রাদেশিক এবং জাতীয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ভারতীয়দের উপস্থিতি বাড়ানো। তাই আঞ্চলিক দলগুলি এবং কংগ্রেস উভয়েই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত বা মনোনীত ভারতীয় সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানাতেন। শহরের বিত্তশালী এবং পেশাজীবী শ্রেণিভুক্ত লোকের চাহিদা রাজনৈতিক দাবিদাওয়ায় ধরা পড়লেও বৃহত্তর ভারতের সামাজিক বাস্তবতার কোনও ছোঁয়াই এই দাবিসমূহ ধরা পড়েনি। ফলে ভারতের সাধারণ মানুষও এই রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি।

রাজনীতির সঙ্গে জনসাধারণের যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাজনীতির ব্যাকরণই পালটে দিয়েছিলেন গান্ধী। গান্ধী কোনও বিমূর্ত রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেন না। সাধারণত বিশেষ বিশেষ উত্তেজক পরিস্থিতিতে গান্ধী এমন কোনও বিষয় কেন্দ্র করে আন্দোলন করতেন যার তাৎপর্য হ'ত সহজবোধ্য। সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় গান্ধী যতবার আন্দোলনের ডাক দেন, প্রত্যেকবারই তিনি এমন কোনও বিষয় বেছে নিয়েছিলেন যা সারা ভারতে সব শ্রেণির মানুষই সহজে বুঝতে পারবে। সীমিত, শহরবাসী কিছু শ্রেণির অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক চাহিদা নয়, গান্ধীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনজনিত ভারতীয় সমাজের দুর্দশা দূর করা। তাই ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন বা ১৯৩০ সালে লবণ আইন মূলত রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন গান্ধী, যাতে ব্রিটিশ আইনের দমনমূলক চরিত্রের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্যের সহজবোধ্যতার মতোই গান্ধীর রাজনৈতিক পন্থাও ছিল সহজবোধ্য। সংবিধান সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে গান্ধী রাজস্বের চড়া হার, কৃষিশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ওপর ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রভাব, শ্রমিকদের সমস্যা প্রভৃতি দৈনন্দিন বাস্তবিকতার কথা বলাই শ্রেয় বলে মনে করতেন এবং এই শোষণমূলক ব্রিটিশ ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে তুলে ধরেন অন্য এক সমাজজীবনের চিত্র, যেখানে আধুনিক সভ্যতার কুফলগুলি অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত, নিরক্ষর গ্রামবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে গান্ধী রামরাজ্যের কথা বলতেন। রামরাজ্য বলতে গান্ধী কোনও হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলতেন না। রামরাজ্য তাঁর মতে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যা দাঁড়িয়ে ছিল সত্য এবং ন্যায়ের মতো সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধের ওপর। হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম, সর্বত্র আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ সত্য এবং ন্যায় হওয়াতে রামরাজ্যে অ-হিন্দু ব্যক্তিদের অসুবিধার কোনও অবকাশই থাকত না। তাই হিন্দুদের পাশে পেতে রামরাজ্যের কথা বলার পাশাপাশি মৌলানা আব্দুল বারি, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ নেতার সাহায্যে মুসলিম সমাজের সমর্থন চেয়ে হাত বাড়ান। গান্ধী বুঝেছিলেন যে আদতে ধর্মপ্রাণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত লক্ষাধিক ‘‘মূক’’ ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে গেলে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ভাষা বিসর্জন দিতে হবে। মানুষকে আহ্বান জানাতে গেলে রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করলে চলবে না; রাজনীতির স্বার্থেই ধর্মকে আহ্বান করতে হবে।

তবে বলা বাহুল্য গান্ধীর কাছে ধর্মের উপযোগিতা ছিল সামাজিক মূল্যবোধের আধার হিসেবে, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, মানুষকে মানুষের থেকে ধর্মের নামে পৃথক করে দেওয়া নয়। গান্ধীর রাজনীতির এই মূল্যবোধ-কেন্দ্রিকতার জন্য তিনি পাশে পেয়েছিলেন মৌলানা আজাদের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষকে যারা পাশ্চাত্যমুখী প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারতেন না। এদের কাছে গান্ধী রাজনীতির এক অন্য অর্থ বহন করে এনেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, রাষ্ট্রনির্মাণ যেখানে সমাজকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। রাজনীতিতে মূল্যবোধকে এরকম প্রাধান্য দেওয়াতে অগুনতি ভারতবাসীর মনে হয়েছিল এই সংগ্রাম আসলে তাঁর সংগ্রাম, কারণ গান্ধী যে মূল্যবোধের কথা বলেছেন সেটি আসলে তারই মূল্যবোধ। এইভাবেই গান্ধীর ছত্রছায়ায় ভারতে শুরু হয় গণ-রাজনীতির যুগ।

পুনশ্চ

রাজনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ, রাজনীতির ভাষা সবই পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর। গান্ধী জীবনে ভোটে দাঁড়াননি, সরকারি ক্ষমতা ভোগ করেননি, কতকটা সেই কারণেই হয়তো তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থে বৃহত্তর কোনও লক্ষ্য বিসর্জনও দেননি। গণ-রাজনীতির সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে তিনি রাজনীতির যে ভাষার সৃষ্টি করেন তাও পরিস্থিতি সাপেক্ষে কার্যকর। প্যালেস্টাইনে অহিংস রাজনীতি কতটা কার্যকর সাব্যস্ত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতির আঙিনায় আলাপ-আলোচনা আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে যেকোনও বিষয় নিষ্পত্তি করার যে পরিসরটি থাকে সেটিকেই যথার্থ ব্যবহার করার পথ দেখিয়েছিলেন গান্ধী। তাঁর বোধে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিপুল ভোটে নির্বাচনে জিতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে সরকারি নীতি প্রণয়ন করলে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন সম্ভব নয়। সরকারের কর্তব্য প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করা, সেই কারণেই প্রকৃত গণতন্ত্রে সরকার এবং নাগরিকের পরস্পরের সঙ্গে নিরন্তর আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং মতান্তরকে মনান্তর মনে না করে ভিন্ন মতের জন্য জায়গা করে দেওয়াও গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর জন্মের ১৫০ বছর পূর্তির সময়ে গণতন্ত্রের সেই পরিসরটিকে খর্ব হতে না দিলেই গান্ধীকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব, নচেৎ নয়।❑

মহাত্মা গান্ধী এবং শ্রমের মর্যাদা

রামচন্দ্র প্রধান

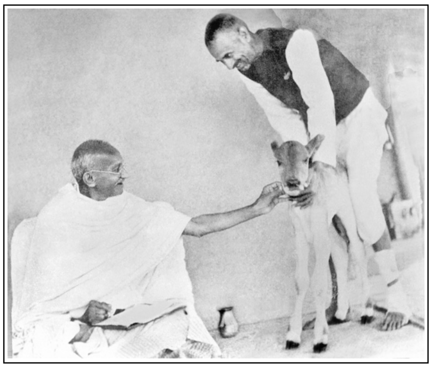

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে গান্ধীজীর অবদান নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, ততটা হয়নি দেশ ও সমাজ পুনর্গঠনে তাঁর ধ্যানধারণা নিয়ে। ভারতের ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সদাসচেতন ছিলেন তিনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ইতিবাচক প্রবণতাগুলির পাশাপাশি সময়ে সময়ে বেশকিছু অনভিপ্রেত বিষয়ও এসে মিশেছে একথা অস্বীকার করেননি কোনওভাবেই। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভিত্তিগত সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে দেশকে পুরোনো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া।

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বহু-মাত্রিক। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে চলা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তিনি ব্যক্তিমানুষ সংক্রান্ত, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে চাইতেন। বিশেষভাবে, তাঁর মন ও আত্মা নিয়োজিত ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রশ্নে ভারতের পুনর্নির্মাণের ব্রতে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি 'সত্য' এবং 'অহিংসা'-র সনাতন পথকে অবলম্বন করেছিলেন। এ থেকেই উন্মেষ 'সত্যাগ্রহ'-এর। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্র বহুলাংশেই প্রস্তুত হয়েছিল মহাত্মার নেতৃত্বে জন-আন্দোলনের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমি ধ্যানধারণার বিপরীত মেরুতে ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। চূড়ান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থই মানুষ ও সমাজের চালিকাশক্তি বা মানুষের সীমাহীন চাহিদা সভ্যতার ধারক ও বাহক, এমন মতবাদ তাঁর দর্শনের পরিপন্থী। মানুষের 'প্রয়োজন' এবং 'চাহিদা'-র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখা টেনেছিলেন মহাত্মা। সামাজিক বিন্যাসের ভরকেন্দ্রে 'ন্যূনতম চাহিদা'কেই রেখেছিলেন তিনি। 'অছি ব্যবস্থা' সম্পর্কে মহাত্মার ধ্যানধারণার মধ্যেই তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন মিশে যেতে চেয়েছে। সোজা কথায়, বস্তুবাদের অতিরিক্ত গুরুত্ব খারিজ করতে চেয়েছেন জাতির জনক। একমাত্রিক বস্তুকেন্দ্রিকতা ব্যক্তিমানুষের যথার্থ বিকাশের অন্তরায়, এমনটাই বলতেন তিনি। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসরে গান্ধীজীর অবস্থান ছিল সর্বধর্ম সমাভব বা সব ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদায়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র পশ্চিমি ব্যাখ্যা, অর্থাৎ রাজনীতি ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ তিনি মানতেন না। রাষ্ট্রশক্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না মহাত্মার। নাগরিক সমাজ, সংগঠন ভিত্তিক ব্যবস্থার কথা বলে গেছেন বার বার। এক্ষেত্রে, সামাজিক বিবর্তন ও প্রস্তুতির তিনটি পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন তিনি : একাদশ ব্রত, গঠনমূলক কর্মসূচি এবং সত্যাগ্রহ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে গান্ধীজীর অবদান নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, ততটা হয়নি দেশ ও সমাজ পুনর্গঠনে তাঁর ধ্যানধারণা নিয়ে। ভারতের ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সদাসচেতন ছিলেন তিনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ইতিবাচক প্রবণতাগুলির পাশাপাশি সময়ে সময়ে বেশকিছু অনভিপ্রেত বিষয়ও এসে মিশেছে একথা অস্বীকার করেননি কোনওভাবেই। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভিত্তিগত সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে দেশকে পুরোনো উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া। এই সংস্কার না হলে ভারত চিরকাল 'ইংলিশস্তান' রয়ে যাবে, কখনই 'হিন্দুস্তান' হতে পারবে না, একথা তিনি বলেছেন

[লেখক গান্ধী গবেষক, বর্তমানে ওয়ার্ধাস্থিত 'ইনস্টিটিউট অব গান্ধীয়ান স্টাডিজ'-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : pradhanramchandra1@gmail.com]

'হিন্দ স্বরাজ'-এ। নিজেকে 'সনাতনী হিন্দু' বললেও জাতির জনকের প্রেক্ষিত ছিল 'উদার হিন্দুত্ব'। তাঁর জন্মভূমি সৌরাষ্ট্র হল অন্তর্ভুক্তিমূলক 'হিন্দুত্ব'-এর ভূমি। স্বামী প্রাণনাথ এবং তাঁর অনুগামী গোষ্ঠী প্রণামীপীঠ-এর প্রভাব সেখানে যথেষ্ট। গান্ধীজীর মাতা পুতলিবাঈ-এর সঙ্গে প্রণামীপীঠ-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর পিতাও ছিলেন উদারপন্থী হিন্দু। কাজেই গোঁড়ামিমুক্ত পরিবেশেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। তার ওপর, তিন বছরের ইংল্যান্ড প্রবাস (১৮৮৮-১৮৯১ সন) তাঁর উদারপন্থী চিন্তাভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। ওই সময়ে তিনি অন্য নানা ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন। শিল্পবিপ্লব এবং গোঁড়া ক্রিশ্চান পন্থার প্রভাবে তৈরি হওয়া রীতিনীতির সমালোচকদের সংস্পর্শেও আসেন। কিন্তু, তাঁর চিন্তাভাবনা স্পষ্ট রূপ পায় দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন থাকার সময় (১৮৯৩-১৯১৪ সন)। ওই সময়ে Phoenix Settlement (১৯০৪) এবং Tolstoy Farm (১৯১০)-এ গান্ধীজীর কায়িকশ্রম (খাদ্য সংস্থানের লক্ষ্যে শ্রম), সর্বধর্ম সমাভব (প্রতিটি ধর্মের সমমর্যাদা) বা স্পর্শভাবনা (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ)-এর মতো বিষয়গুলির চর্চা শুরু হয়। এরপর ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ফিরে আসেন ভারতে। মুখোমুখি হন তখনকার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের। দেখলেন, চতুর্বর্ণ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে মানসিক ও কায়িক (menial) শ্রমের মধ্যে উঠেছে স্পষ্ট ভেদরেখা। উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণরা কায়িক শ্রম থেকে বিরত। সে কাজের দয়িত্ব শুদ্রদের। এসব মানতে পারলেন না মহাত্মা। ১৯১৫-এ সাবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠার সময় সূচনা করলেন একাদশ ব্রতের, যা সকল আশ্রমবাসীর অনুসরণীয়। এগুলি হল সত্য, অহিংসা, চৌর্যবৃত্তিতে শামিল না হওয়া, ব্রহ্মচর্য, সম্পত্তি দখলে না রাখা, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ, নির্ভয় হওয়া, অস্পৃশ্যতা পরিহার করা, খাদ্যের জন্য পরিশ্রম, স্বদেশ এবং সব ধর্মের সমান মর্যাদা। এর মধ্যে স্পর্শভাবনা (অস্পৃশ্যতা পরিহার) এবং কায়িকশ্রম (খাদ্যের জন্য শ্রম) সরাসরি শ্রমের মর্যাদার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কায়িকশ্রম : সোজা কথা হল বাঁচতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। শারীরিক শ্রমের বিনিময়েই কেবলমাত্র কোনও মানুষ খাদ্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। কেউ মানসিক ক্রিয়ায় শামিল হতেই পারেন, কিন্তু রুটির জন্য কিছু শারীরিক শ্রম তাকে প্রদান করতেই হবে। এই মতবাদের প্রবক্তা রুশ নেতা T.M. Bondarek। পরে তলস্তয় তা জনপ্রিয় করেন। ভারতীয় সমাজে শ্রমের মর্যাদার অনুপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন গান্ধীজী। এই জন্যই একাদশ ব্রতের মধ্যে রেখেছিলেন শ্রমে মর্যাদাকে। সবরমতী এবং সেবাগ্রামের আশ্রমে তিনি নিজে কঠোরভাবে এই ব্রত অনুসরণ করতেন। কায়িকশ্রম-এর ধারণাটিকে ভগবদ্‌গীতার 'যজ্ঞ'-এর ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন গান্ধীজী। গীতায় বলা হয়েছে যেকোনও অবদান (যজ্ঞ) না সম্পন্ন করে খাদ্যগ্রহণ চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ভুক্ত। ১৯৩০ সালে ইয়েরওয়াড়া জেলে (গান্ধীজী একে মন্দির বলতেন) থাকার সময় সাবরমতীর আশ্রমিকদের লেখা চিঠিতে কায়িকশ্রমের স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি পেশ করেন গান্ধীজী। এক, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কায়িকশ্রম জরুরি। দুই, কায়িকশ্রমের ব্রতে শামিল হলে কায়িক শ্রমের তুলনায় বৌদ্ধিক বা মানসিক শ্রম শ্রেয়, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। তিন, এই ব্রত পুঁজি এবং শ্রমের বিরোধিতা নির্মূল করে এবং সেজন্যই ধনীরা তা অনুসরণ করলে নিজেদেরকে নিজেদের সম্পত্তির অছি বলে ভাবতে শিখবেন। চার, নিজের শৌচালয় সাফাই সংক্রান্ত কাজকর্ম নিজে সম্পন্ন করা শ্রেষ্ঠ কায়িকশ্রম কারণ তা অস্পৃশ্যতা দূর করে সব মানুষকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। মহাত্মার হাজার হাজার অনুগামী শামিল হতে থাকেন কায়িকশ্রমের ব্রতে।

বৌদ্ধিক (মানসিক) এবং কায়িক শ্রমের সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে চরকা এবং করঘা (বয়নযন্ত্র)। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই বিষয় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তুলো থেকে সুতো তৈরি করে তা দিয়ে নিজেদের পোশাক বানানোর মাধ্যমে মানুষ এগোবেন স্বনির্ভরতা এবং স্বরাজ-এর দিকে, এমনই চিন্তাধারা ছিল গান্ধীজীর। 'খাদি' এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্মের ধারণাগত ভিত্তি এখানেই।

স্পর্শভাবনা (অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ) : প্রথম থেকেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। নির্দিষ্ট কোনও বর্গের মানুষের সংস্পর্শে বর্ণহিন্দুরা অপবিত্র হয়ে যাবেন এরকম ভিত্তিহীন ধারণাকে স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা করেছেন তিনি। অচ্ছুৎদের দেখলেও অপবিত্র হতে হবে, এমন উদ্ভট ধারণাও চালু ছিল এদেশে। গান্ধীজী মনে করতেন অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক। তা দূর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। একাদশ ব্রতের অন্যতম হল স্পর্শভাবনা। এবিষয়ে গান্ধী এতটাই কঠোর ছিলেন যে, দু'-দু'বার (একবার দক্ষিণ আফ্রিকা এবং একবার সাবরমতী আশ্রমে) নিজের পত্নী কস্তুরবাকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন, যখন কস্তুরবার আচরণে কোনওভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন দলিতদের প্রতি বিভেদমূলক মনোভাব। শুধু তাই নয়, ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকারের ধর্মভিত্তিক ভোটাধিকার (Communal Award) প্রস্তাবে দলিতগোষ্ঠীকে হিন্দুদের থেকে আলাদা করার সংস্থান খারিজের দাবিতে বসেছিলেন আমৃত্যু অনশনে। পরে, ভারতের মাটি থেকে অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য রীতিকে দূর করতে শুরু করেন জোরালো অভিযান। তৈরি করেন হরিজন সেবক সংঘ। প্রকাশ করেন 'হরিজন' পত্রিকা। প্রথমত, জন্মসূত্রে কাউকে অস্পৃশ্য বলে বিচার করা পাপ বলে মনে করতেন মহাত্মা। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মে এর কোনও ভিত্তি নেই, বলতেন তিনি। তৃতীয়ত, প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের সন্তান অতএব সমপর্যায়ের এবং ভ্রাতৃপ্রতিম, এই ছিল তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়। অস্পৃশ্যতা দূর করার উদ্যোগ প্রেম ও অহিংসা এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করার সাধনা বলে মহাত্মা মনে করতেন। আবর্জনা সাফ করা মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বলতেন জাতির জনক। কিন্তু এই কাজের দায়িত্ব নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর কাঁধে থাকলে শ্রমের মর্যাদাহানি করে বলে তিনি মনে করতেন। এই জন্যই মানুষকে নিজের রেচনজাত পদার্থ নিজেই সাফ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

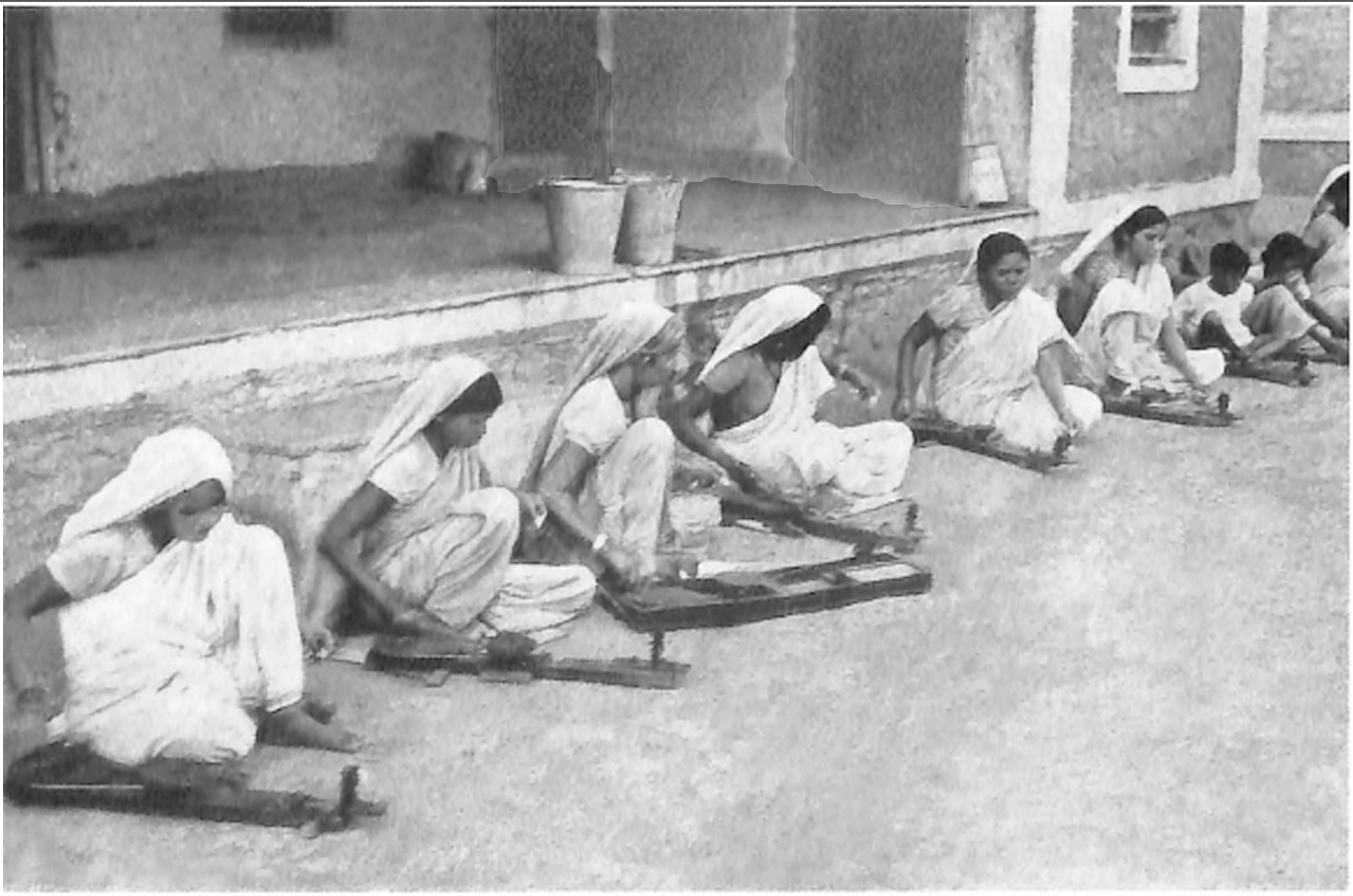

দত্তপুরে সেবাগ্রাম আশ্রম পরিচালিত কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয়স্থলে মহিলা আবাসিকরা চরকা কাটছেন

বর্তমান সময় গান্ধীজীর স্পর্শভাবনা এবং কায়িকশ্রমের ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এসংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে অনেকটাই এগিয়েছে এই দেশ। ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ওই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। আইনগত দিক থেকে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে অনেক আগেই। শ্রমের মর্যাদা এবং এসংক্রান্ত সামাজিক মূল্যবোধ তৈরির প্রচেষ্টাও হয়েছে এবং হচ্ছে। জয় আসন্ন। তবে লড়াই শেষ হয়নি এখনও। বাপু এবং অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বপ্ন দেখেছেন তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পথ হাঁটতে হবে এখনও অনেকটাই।

সবশেষে গান্ধীজীর লেখা থেকে তিনটি উক্তি :

কায়িকশ্রম এবং অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে

১। প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ বা রমণের মতো ব্যক্তিকে কায়িকশ্রমে শামিল হতে আমরা বলব কেন? তা কি অপচয় নয়? মাথার কাজ যারা করেন তাদের কায়িক শ্রমে শামিলদের সঙ্গে এক সারিতে রাখা হবে না কেন? সকলেই তো সমাজে অবদান রেখে চলেছেন?

উত্তর : বৌদ্ধিক মনন গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনে তার জায়গা নিঃসন্দেহে রয়েছে। আমি কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি। কোনও মানুষই এই দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেন না বলে আমার মনে হয়। কায়িক শ্রম বৌদ্ধিক মননসম্পন্ন মানুষের কাজের উৎকর্ষ আরও বাড়াবে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা শরীর ও মন উভয়কেই কাজে লাগাতেন বলে আমার অনুমান। যদি তা নাও হয়, বর্তমান সময়ে কায়িক শ্রমের গুরুত্ব প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আমি টলস্টয়ের কথা বলব। তার দেশের কৃষক বনদারেফ-এর প্রস্তাবিত কায়িকশ্রম-এর ধারণাকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।—হরিজন, ২৩/০২/১৯৪৭, ৩৬।

২। চরকায় সুতো কাটার জন্য উপযোগী এবং জীবনদায়ী শিল্প প্রক্রিয়াকে পরিত্যাগ করার কথা আমি বলছি না। ভারতে কোটি কোটি মানুষের যথার্থ কর্মসংস্থান নেই। এজন্যই চরকা প্রাসঙ্গিক। যদি সেরকম কোনও মানুষ না থাকেন তাহলে চরকার কোনও জায়গাই থাকে না।—ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৭/৫/১৯২৬, ১৯১।

৩। প্রাচীন বলে পুরোনো দিনের সবকিছুই ভালো এমন আমি মনে করি না। পুরোনো ঐতিহ্য বা রীতিনীতির সামনে মানুষের ঈশ্বর প্রদত্ত যুক্তির ক্ষমতা পরাস্ত হোক, একথাও আমি বলব না। প্রাচীন কোনও বিষয় অনৈতিক হলে তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শিশুদের বৈধব্য, বাল্যবিবাহ এবং আরও নানা ভয়াবহ রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে কেউ প্রাচীন ঐতিহ্য ভাবতে পারেন। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এসবকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতাম। কাজেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান করা অর্থে আমি কী বলি তা এখন আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন।—ইয়ং ইন্ডিয়া, ২২/৯/১৯২৭, ৩১৯।❑

শান্তির পরিপ্রেক্ষিত : গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ডি. জন চেল্লাদুরাই

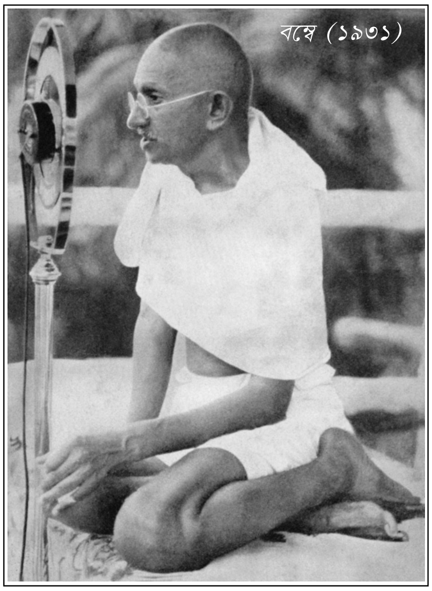

যা কিছু জীবনকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে বা তার সংরক্ষণ করছে, তা শান্তিরই নামান্তর। এগুলিকে গান্ধীজী অহিংসা বলতেন। অন্যদিকে, যা কিছু জীবনকে ব্যাহত করে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, গান্ধীজী তাকেই বলতেন হিংসা। জীবনের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য, সত্য অর্জনের পথ হল অহিংসা। এটাই আবার শান্তিরও অনুভব এনে দেয়। তাই গান্ধীজী 'অহিংসা' ও 'সত্য'-কে সমার্থক বলে মনে করতেন। শান্তি হল অহিংসার উপজাত অনুভব। একেও তাই সত্য ও অহিংসার সঙ্গে একই বন্ধনীতে ফেলা যায়।

শান্তির বিষয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্যক জানতে হলে জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা বুঝতে হবে, যার মূল ভিত্তি হল 'সত্য'। তাঁর শান্তি প্রকৃত অর্থেই জীবনকেন্দ্রিক, যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন 'অহিংসা'-র মধ্য দিয়ে। গান্ধীজীর কথা অনুযায়ী, অহিংসা এমন এক পন্থা, যার মধ্য দিয়ে সুস্থিত জীবনের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব।

সত্য

গান্ধীজীর কাছে সত্য হল জীবনের মূল ভিত্তি। সারা জীবন ধরে সত্যের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই একজনের জীবনে শান্তির উদ্ভাস ঘটে। সত্যকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "প্রতিটি প্রাণী ও জীবন্ত বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছে অমোঘ অপরিবর্তনীয় এক নিয়ম। অমোঘ হলেও এই নিয়ম কিন্তু অন্ধ নয়। কারণ জীবিতদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা কোনও অন্ধ আইনের পক্ষে সম্ভব নয়।" মহান বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেছিলেন, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তাকে উদ্ধৃত করে গান্ধীজী বলেছিলেন, "যে নিয়ম সবার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মই ঈশ্বর।" এই নিয়মকেই তিনি সার্বভৌম ও চিরকালীন নীতি—সত্য বলেছিলেন। তাঁর কাছে সত্যই ছিল ঈশ্বর, জীবনের একমাত্র ও অন্তিম উদ্দেশ্য।

সত্য শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'সৎ' শব্দ থেকে। এর অর্থ 'যার অস্তিত্ব আছে।' অর্থাৎ যা কিছু আছে, সবই সত্যের অংশ—গান্ধীজী এভাবেই ভাবতেন।

জীবন

গান্ধীজী বলতেন, "সত্য সব সময়েই কল্যাণকর। মৃত্যুর মাঝেও জীবন, অসত্যের মাঝেও সত্য, অন্ধকারের মাঝেও আলোর অস্তিত্ব আমি দেখতে পাই। সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর (সত্য) হলেন জীবন।" অর্থাৎ সূত্রের মতো সাজালে, জীবনই ঈশ্বর।

একজন আদর্শবাদীর চোখে গান্ধীজী জীবনকে সত্য অথবা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ হিসাবে দেখেছিলেন। তাই তাঁর মতে, সর্বত্র পরিবেষ্টিত সত্য বা ঈশ্বরের কাছে পৌছবার একমাত্র উপায় "ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে খোঁজা এবং তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। সবার সেবার মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। নিজেকে সম্পূর্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাবা দরকার।" গান্ধীজী বলেছিলেন, "আমি তাঁকে মানুষের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না।"

অহিংসা

গান্ধীজীর কাছে সত্য ছিল গন্তব্য, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর অসংশয়িত মাধ্যম ছিল অহিংসা। গান্ধীজী বলতেন, "অহিংসা

[লেখক ডিন, গান্ধী রিসার্চ ফাউন্ডেশন, জলগাঁও (মহারাষ্ট্র)। ই-মেল : dr.chelladurai.john@gandhifoundation.net]

আমাদের অভিজ্ঞান আর পশুদের ধর্ম হল হিংসা। মানুষের মর্যাদাবোধই তাকে এই উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের আসনে বসিয়েছে।” জীবন আর সত্য যেহেতু একাকার, তাই যা কিছু জীবনকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে বা তার সংরক্ষণ করছে, তাকেও গান্ধীজী সত্যের উপাদান বলে ভাবতেন। এগুলিকে তিনি অহিংসা আখ্যা দিতেন। অন্যদিকে যা কিছু জীবনকে ব্যাহত করে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত, গান্ধীজী তাকেই বলতেন হিংসা।

এই অহিংসা কোনও ব্যক্তিবিশেষের গুণমাত্র নয়, এ হল যৌথ জীবনযাপনের এক পদ্ধতি। “উপচে পড়া ভালোবাসায় একে অপরের দুঃখ দূর করার” দৃষ্টিভঙ্গি এটি। জিন শার্প একে কোনও সঠিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে স্বার্থহীন আত্মনিবেদন, আত্মত্যাগ এবং ভালোবাসা বলে বর্ণনা করেছেন। শার্প বলেছেন, গান্ধীজীর অহিংসা আসলে এমন এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা সবাইকে যথাযথ মাধ্যম, কাঠামো, পদ্ধতি ও অভিমুখ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে জীবনযাপনের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ করে দেয়।

গান্ধীজীর সত্যানুসন্ধান যেসব উজ্জ্বল অহিংস ধারণার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল সেগুলি হল : স্বরাজ (সৎ ও বিবেকবান জীবনযাপন), সর্বোদয় (সকলের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ দেখা), স্বদেশি (প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রাণবন্ত সম্পর্ক), খাদি (পারস্পরিক অস্তিত্ব), সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি (বৈচিত্র্যের প্রতি সহিষ্ণুতা) এবং নই তালিম (সর্বাত্মক জীবনযাপনের যে শিল্প তার শিক্ষা)। এগুলি হল গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যের বৃহত্তর ধারণার প্রকাশ। তাঁর সত্যাগ্রহ এমন এক সার্বিক প্রক্রিয়া যেখানে বিজেতা এবং বিজিত—দু'পক্ষই জীবনে জয়ী হয়। তিনি ভারত এবং মানবতাকে সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অহিংসার এই সার্বিক ধারণা সুস্থিত জীবনের সহায়ক, আর তাই গান্ধীজী বলতেন, অহিংসা পরমধর্ম।

শান্তি : জীবনের অভিজ্ঞতা

গান্ধীজীর কাছে শান্তি ছিল জীবনের এক অভিজ্ঞতা। তার প্রকাশ প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনায়। তৃপ্তি, আনন্দ, সুখ, আরাম, ভারমুক্তি (এগুলি মানুষের কাজের ফল), বিনিময়, সহযোগিতা, পারস্পরিক সহায়তা (এগুলি মানুষের কাজ), ভালোবাসা, সহানুভূতি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা (অতিরিক্ত গুণাবলী), বোঝাপড়া, অনুভব, চেতনা (জ্ঞানসংক্রান্ত গুণাবলী), এই সবকিছু, প্রতিটি স্বতন্ত্র এবং সম্মিলিতভাবে জীবনে শান্তির অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

আনন্দ ও সুখকে শান্তির সব থেকে ঘনিষ্ঠ নির্দেশক বলে মনে করা হয়। এই ধারণা ঠিকই, তবে কোনও অসামাজিক ব্যক্তিও অন্যদের বঞ্চিত করে আনন্দ ও সুখ পেতে পারেন। তাই শান্তি বলতে আমরা কী বুঝি, তার একটা মূলগত ভিত্তি থাকা দরকার। গান্ধীজীর সত্যের ধারণায় আমরা সর্বব্যাপী সত্যের স্বরূপ বুঝতে পারি, বিশেষত জীবনে তার প্রকাশ অনুভব করি এবং শান্তির অবিসংবাদিত সার্বিক ধারণা আমাদের মনে দানা বাঁধে।

শান্তি : জীবনের সাধনা

শান্তির কথা বলতে গেলে যেহেতু জীবনের কথা বলতে হয়, তাই শান্তি জীবনের ওপর নির্ভরশীল। যেখানে জীবন নেই, সেখানে শান্তিও নেই। জীবননিরপেক্ষ শান্তিকে বলা যায় ‘শ্মশানের শান্তি’। জীবন যখন মসৃণভাবে চলে, তখন সেই অভিজ্ঞতাকে বলা হয় শান্তিপূর্ণ। আবার জীবন নানা সমস্যার মধ্যে থাকলে তখন তাকে আমরা অশান্তি বলি।

অসংখ্য ছোটো ছোটো কাজের মধ্য দিয়ে জীবনকে আমরা অনুভব করি। আমাদের প্রতিটি কাজের নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য থাকে ঠিকই, (যেমন আমরা যখন খাই তখন তার উদ্দেশ্য হল শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করা, যখন ঘুমাই তখন তার উদ্দেশ্য হল ক্লান্তি দূর করা) কিন্তু এই প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে একটি বৃহত্তর সর্বজনীন অভিন্ন লক্ষ্যপূরণের যাচনাও থাকে, যাকে বলা যেতে পারে ‘জীবনযাপন’। যখন কোনও কাজ সেই লক্ষ্যপূরণ করতে সমর্থ হয়, তখন আমরা আনন্দ পাই, আমাদের তৃপ্তি হয়, আমরা শান্তি অনুভব করি।

সেইভাবেই যা কিছু জীবনকে রক্ষা করে, উৎসাহ দেয়, সংরক্ষণ করে অথবা জীবনের সুস্থিতি সুনিশ্চিত করে, তাতেই আমরা শান্তি অনুভব করি। খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে জীবনে শক্তি সঞ্চিত হয়। তাই খাদ্যগ্রহণ আমাদের তৃপ্তি ও শান্তি দেয়। মেলামেশা মানুষের সামাজিক জীবনকে পরিতৃপ্ত করে। তাই একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি অনুভব করি।

শান্তি যেহেতু জীবনের সাপেক্ষে অধিষ্ঠান করে, সেজন্য জীবনবিমুখ যেকোনও কাজকেই আমরা অশান্তি বলে অভিহিত করতে পারি। তাই খাদ্য বা বাসস্থানের অভাব, আত্মপরিচয়ের সঙ্কট বা মর্যাদাহানি, এই সব কিছুই জীবনের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। একইভাবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অদক্ষতা প্রভৃতিকে অশান্তির নানা রূপ বলা যায়। সেদিক থেকে দেখলে খাদি, গ্রামীণ শিল্প ইত্যাদি নিয়ে গান্ধীজীর গঠনমূলক চিন্তাভাবনা জীবনসহায়ক শান্তিকামী উদ্যোগ।

শান্তির অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জীবনের অন্যতম প্রধান বিপদ হল যুদ্ধ, যাকে বলা যায় চরম অশান্তি। যুদ্ধ না থাকার অর্থ হিংসা, দ্বন্দ্ব, হতাশারও অনুপস্থিতি। সেইদিক থেকে দেখলে, যুদ্ধ না থাকাকালীন সময়কেও শান্তি বলে অভিহিত করা যায়। যুদ্ধ ও হিংসা না থাকলে জীবন বিকশিত হতে পারে।

শান্তির এই সংজ্ঞাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে জীবনরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে ভালো করে ভাবলে বোঝা যাবে, এখানে আসলে ‘পরোক্ষ শান্তি’-র কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক ঠিকই , কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধ না থাকলেই জীবন বিকশিত হয়ে উঠবে, এমন ধারণাও সঠিক নয়।

জীবনে শান্তি আসলে এক পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা, যাকে বলা যায় ইতিবাচক শান্তি। সৃজনশীল, গঠনমূলক, সুস্থিত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে জীবনে শান্তি অনুভব করা যায়। যেমন ধরুন, কেউ যদি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পান, তাহলে তার উপশম হলে তিনি শান্তি পাবেন। গান্ধীজীর কাছে শান্তির অর্থ ছিল সত্য আধারিত জীবন। খাদ্যগ্রহণ, নির্মাণ বা কাউকে আলিঙ্গন আপনাকে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে শান্তি বলা যাবে তখনই, যদি তা জীবনের সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রসারের কাজে আসে। জীবনের প্রয়োজন ছাড়া এই কাজগুলি করা হলে তাকে নিছক ইচ্ছাপূরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দেহের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও খাদ্যগ্রহণ, কারও সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া স্রেফ দেখা করার জন্যই দেখা করা, নিজের থাকার জায়গা থাকা সত্ত্বেও আরও একটি গৃহ নির্মাণ, এইসবই আমাদের আনন্দ দিলেও এগুলি নিছক ইচ্ছাপূরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট সম্পদ প্রকৃতির থাকলেও একজনেরও লোভ মোটানোর ক্ষমতা তার নেই।’’

অন্যদিকে, শান্তির আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি কাজ করে। ঠিক যেমন, সুখাদ্য প্রাথমিকভাবে আনন্দ দিলেও ক্রমাগত সেই খাবার খেয়ে গেলে তার উপযোগিতা ক্রমশ কমতে থাকে। যেকোনও জিনিসই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে গেলে তার উপযোগিতা ঋণাত্মক হতে থাকে। অত্যধিক ধর্মমোহ উন্মাদনার জন্ম দেয়। অত্যধিক ধনসম্পদ অর্থনৈতিক মেদবৃদ্ধির মতো, যা ব্যক্তিমানস ও তার পারিপার্শ্বিককে ধ্বংস করে দেয়। এইজন্যেই গান্ধীজী অপরিগ্রহের কথা বলেছিলেন। অপরিমিত সম্পদ বা ক্ষমতা এক অসেতুসম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করে, যা অসত্যের ওপর আধারিত এবং সেজন্যই শান্তিবিরোধী। গান্ধীজী বলতেন, ‘‘একজন সত্যান্বেষী, ভালোবাসার নীতিতে বিশ্বাসী মানুষ কখনওই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে যেটুকু প্রয়োজন, তার থেকে বেশি কিছুতে সে আগ্রহী নয়।

সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ, মিউরিয়েল লেস্টার, মহাদেব দেশাই, মীরাবেন, প্যায়ারেলাল এবং এক ইংরেজ বন্ধুর সাথে

নানা অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। একভাবে দেখতে গেলে, শান্তির অর্থ জীবনের এইসব অভাব পূরণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, তবে কোনওভাবেই অন্যের অভাব পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি না করে। গান্ধীজীর স্বরাজের ধারণা শান্তির এক আদর্শ পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করে। এর অর্থ এমন এক স্বশাসন, যা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলে, কিন্তু অন্যের জীবনের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে না।

সমাজ আসলে ব্যক্তির এক সমষ্টি, যারা সমবেত লক্ষ্য, অভিন্ন মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে জীবনের সঙ্গে বিধৃত। সমাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল তার সদস্যদের জীবনের প্রয়োজনগুলি পূরণ করা। এজন্য সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি ও কাঠামো নির্মাণ করেছে, সেগুলি পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম ও নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে (ব্যক্তিমানসের জীবনের চাহিদা পূরণ) এই পদ্ধতি ও কাঠামোগুলি যদি মসৃণভাবে কাজ করতে পারে, তাহলে তাকেও শান্তি বলা যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ অথবা অর্থনৈতিক ন্যায়বিধানে যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে গান্ধীজীর যে ধারণা ছিল, তার মূল কথা হল, সমাজের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এমন সাযুজ্যপূর্ণ পদ্ধতি ও কাঠামো গড়ে তোলা, যাতে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারেন। কিন্তু তার বেশি বা কম নয়।

জীবনসহায়ক এইসব পদ্ধতি ও কাঠামো যেকোনও সমাজের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, আর তাই এগুলিকে শান্তির পূর্বশর্ত হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গতিশীলতা বুঝে সমাজের সদস্যরা যত বস্তুনিষ্ঠভাবে এর ব্যবহার করতে পারবেন, পদ্ধতি ও কাঠামোগুলির কার্যকারিতা ততই বাড়তে থাকবে। সদস্যদের এগুলির সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান ও দক্ষতা (পদ্ধতি এবং তার সুবিধাভোগী উভয়ের সম্পর্কেই) থাকাও শান্তির অন্যতম পূর্বশর্ত।

অর্থাৎ, শান্তির অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জীবনে নির্দিষ্ট কিছু সুস্থিত উপাদান থাকা প্রয়োজন। চাহিদা পূরণ, সামাজিক সম্পর্ক গঠন, চাহিদা পূরণের উপযোগী পদ্ধতি ও কাঠামোর উপস্থিতি, সেইসব পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা এবং অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি না করার চেতনা প্রভৃতি

হল সেইসব উপাদানের উদাহরণ, যেগুলি সমবেতভাবে জীবনে শান্তি সুনিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে গান্ধীজীর সর্বোদয় বা সবার কল্যাণের ধারণাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সবার সঙ্গে সমন্বয়

গান্ধীজীর সর্বব্যাপী সত্যের ধারণা এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগে সবার কল্যাণের আদর্শ থেকে বোঝা যায়, তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। একইসঙ্গে তিনি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছিলেন, সত্যের এই ক্রমপরিবর্তিত রূপ "আমাকে অসংখ্য ধরনের বাস্তবতায় বিশ্বাসী করে তুলেছে।" এই অর্থেই বেদ ব্রহ্মকে বলেছে, অবাঙ্মনসগোচর। উলটোদিক থেকে এর অর্থ দাঁড়ায়, সর্বভূতেই তিনি বিরাজমান। "আগে আমি আমার বিরোধীদের অজ্ঞতায় বিরক্ত হতাম। আজ আমি তাদের ভালোবাসতে পারি, কারণ অন্যরা যে চোখে আমাকে দেখে, আমিও সেই চোখে নিজেকে দেখতে পারি এবং এর উলটোটাও ঘটে। এই শিক্ষা থেকেই আজ একজন মুসলমান ও একজন খ্রিস্টানকে তাঁদের নিজস্ব অবস্থান থেকে বিচার করতে আমার অসুবিধা হয় না।"

সংকট মেকাবিলা কৌশল

ব্যক্তি জীবনকে অনুভব করে সমাজের মধ্য দিয়ে। সমাজ আসলে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন ব্যক্তি যেহেতু আরেকজন ব্যক্তির থেকে আলাদা, তাই এই সম্পর্কে টানা-পোড়েন আসা খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। অন্যায়, জীবনের (অর্থাৎ, সত্যের) পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাই তার মোকাবিলা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু অন্যায়কারী যেহেতু বাস্তবতার (বা সত্যের) অংশ, তাই তাকে দূরে সরিয়ে দিলে চলবে না। একে বলা যায় বিজ্ঞানসম্মত শল্যচিকিৎসামূলক বিশ্লেষণ (একজন চিকিৎসক রোগের বিরুদ্ধে লড়েন, রোগীকে বাঁচাবার জন্য, যদিও রোগ এবং রোগী একইসঙ্গে তার কাছে আসে)। এটাই সত্যের বৃহত্তর বাস্তব। এই অর্থেই গান্ধীজী বলেছিলেন, "পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।" এই আদর্শের নামই তিনি দিয়েছিলেন, 'সত্যাগ্রহ'।

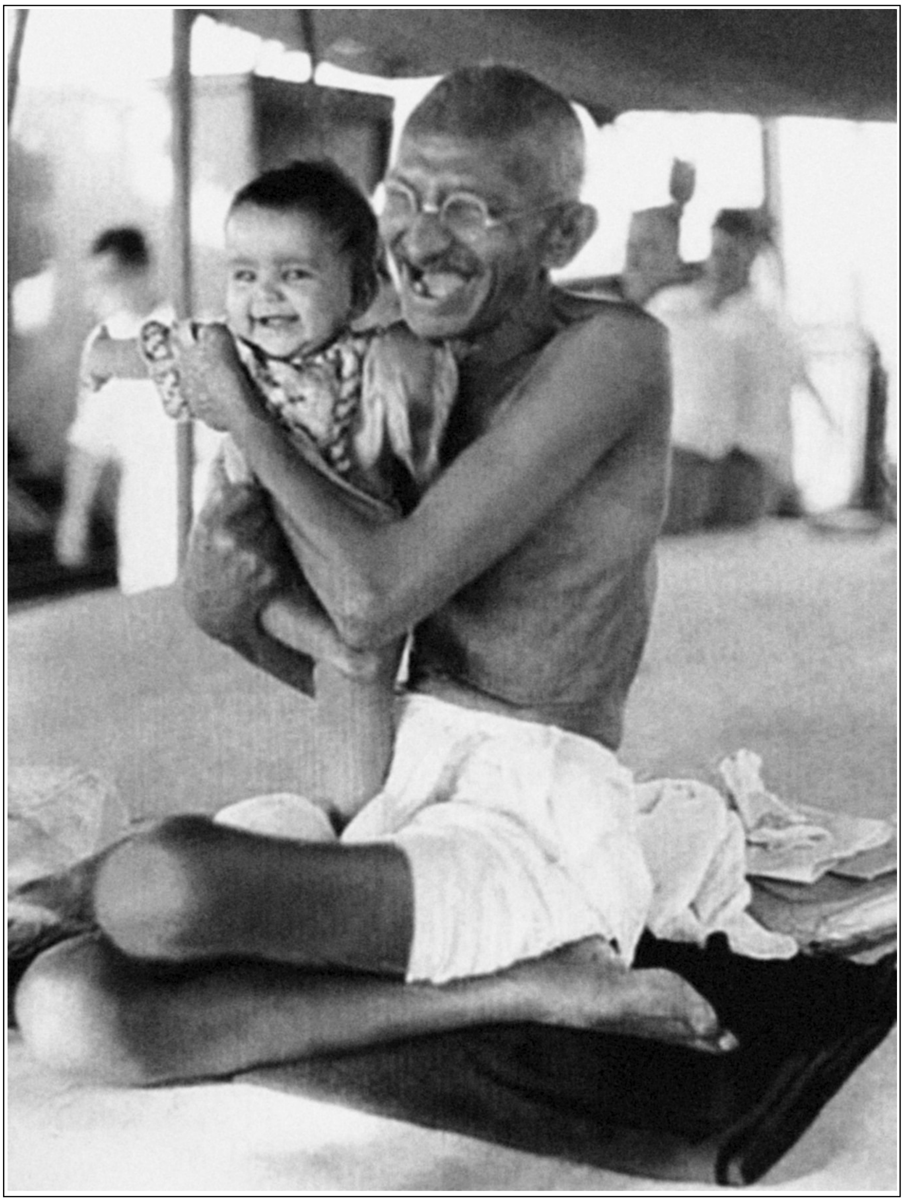

উপসংহার

গান্ধীজীর জীবনকেন্দ্রিক সত্যের সাধনা আমাদের শান্তির অভিমুখে নিয়ে যায়। যা কিছু জীবনকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে বা তার সংরক্ষণ করছে, তা শান্তিরই নামান্তর। এগুলিকে গান্ধীজী অহিংসা বলতেন। অন্যদিকে, যা কিছু জীবনকে ব্যাহত করে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, গান্ধীজী তাকেই বলতেন হিংসা। জীবনের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য, সত্য অর্জনের পথ হল অহিংসা। এটাই আবার শান্তিরও অনুভব এনে দেয়। তাই গান্ধীজী 'অহিংসা' ও 'সত্য'-কে সমার্থক বলে মনে করতেন। শান্তি হল অহিংসার উপজাত অনুভব। একেও তাই সত্য ও অহিংসার সঙ্গে একই বন্ধনীতে ফেলা যায়। অহিংসাশ্রয়ী জীবন হল শান্তির জীবন। সত্য-আধারিত জীবন হল শান্তির জীবন। আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, নিতান্ত জাগতিক ও ব্যবহারিক অর্থেই।❑

আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী গান্ধী

জি. এল. মেহতা

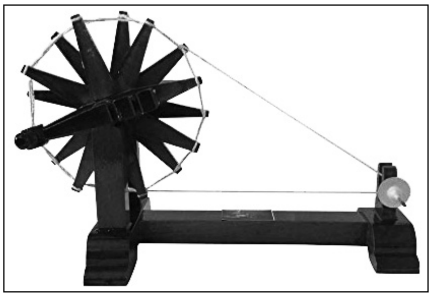

গান্ধীজী যখন জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন, ভারত তখন মুক্ত ও স্বাধীন দেশ ছিল না। কাজে কাজেই ভারতের মানুষজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেসময় কোনও কার্যকর অবদান রাখতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, অর্ধশতক আগেই আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং ভবিষ্যতে এতে ভারতী কী ভূমিকা পালন করবে সেবিষয়ে গান্ধীজীর নিজস্ব স্পষ্ট ধ্যানধারণা ছিল। জাতীয়তাবাদকে তিনি অশুভ বলে মনে করতেন না; কিন্তু সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বতন্ত্রতা আধুনিক জাতির বিনাশ ডেকে আনে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

"আমার কাছে দেশভক্তি আর মানবতা সমার্থক"।

প্রায় ৫০ বছর আগেই গান্ধীজীর মধ্যে এই বোধের উপলব্ধি ঘটে। "ভারতের সেবা করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমি বৃহত্তর অর্থে মানবজাতির সেবার নিয়োজিত।" বিশ্ব সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টি-ভঙ্গির নির্যাস এই কথা ক'টি। যা বয়ান করে যে না তো জাতীয়, আর না আন্তর্জাতিক, গান্ধী ছিলেন কেবলমাত্র মানবতাবাদী। তাঁর কাছে, 'মানবতা' এবং 'মনুষ্যজাতি'-র মতো শব্দবন্ধ শুধুমাত্র ভাসা ভাসা একে বিমূর্ত ধারণা নয়; গোষ্ঠী-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে অষ্টেপৃষ্টে সম্পৃক্ত তা।

সব ব্যক্তিমানুষকেই এক বৃহত্তর পরিবারের সদস্য হিসাবে দেখতেন তিনি। প্রতিটি মানুষের জন্য গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবিত হতেন। কারণ, তারা মানুষ, তাঁর নিজের থেকে ভিন্ন নয়। মানুষের মর্যাদার উপর কোনওরকম আঘাত নেমে আসলে তাঁর আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। তা দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বৈষম্যের এবং সমাজের মূলস্রোত থেকে উপজাতি গোষ্ঠীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াসের ক্ষেত্রেই হোক বা তাঁর স্বদেশে অস্পৃশ্যতার মতো অবমাননাকর প্রথার বিরুদ্ধেই হোক। ফিনিক্স, সাবরমতী, সেবাগ্রাম সর্বত্রই তাঁর আশ্রম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হয়ে ওঠে।

গান্ধীজী যখন দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন, ভারত তখন মুক্ত ও স্বাধীন দেশ ছিল না। কাজে কাজেই ভারতের মানুষজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেসময় কোনও কার্যকর অবদান রাখতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, অর্ধশতক আগেই আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং ভবিষ্যতে এতে ভারত কী ভূমিকা পালন করবে সেবিষয়ে গান্ধীজী নিজস্ব স্পষ্ট ধ্যানধারণা ছিল।

১৯২৫ সনে "ইয়ং ইন্ডিয়া"-এ তিনি লিখেছিলেন, "জাতীয়তাবাদী না হয়ে কারও পক্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে ওঠা অসম্ভব। জাতীয়তাবাদ যদি এক সত্য (fact) হয়ে ওঠে তবেই আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্ভব; আর সেই সত্য হল, যখন মানুষ নিজেদের সংগঠিত করে একক ব্যক্তি হিসাবে কাজ করতে সমর্থ হবে"। জাতীয়তাবাদকে তিনি অশুভ বলে মনে করতেন না; কিন্তু সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বতন্ত্রতা আধুনিক জাতির বিনাশ ডেকে আনে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার তাগিদে বিপথে চালিত হয়ে ভারত নিজেকে খণ্ডিত করুক, এ তিনি কখনও চাননি। "বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা বিশ্ব মর্যাদার লক্ষ্যমাত্রা নয়", ১৯২৫ সনে এমনটাই লেখেন গান্ধী। একে "স্বেচ্ছায় পারস্পরিক নির্ভরশীলতা"-র তকমা দেন। প্রকৃতপক্ষে, কেউ বলতেই পারেন যে, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের পিছনে সুনির্দিষ্টভাবে এই

[লেখক জি. এল. মেহেতা (১৯০০-১৯৭৪), একজন বিশিষ্ট প্রশাসক তথা কূটনীতিবিদ। ১৯৫২-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৫৯ সালে পদ্মবিভূষণ পান। এই সংখ্যায় তাঁর লেখা এক পুরোনো নিবন্ধ পুনঃমুদ্রিত হল।]

লন্ডনে চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে (১৯৩১)

উদ্দেশ্যই কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার জন্য ভদ্রস্থ পন্থা হল আপোশ এবং সালিশি; ব্যাপক নরমেধ এবং ধ্বংসযজ্ঞ নয়। রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রতি অটল আনুগত্য এবং আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারালয়ের (International Court of Justice) নিঃশর্ত স্বীকৃতি শান্তির প্রতি দায়বদ্ধতার পাকাপোক্ত সাবুদ পেশ করে।

অন্য কথায় বলতে গেলে, আইনকানুনের নামে জোরাজুরি, হিংসার কারণ, অন্ধ গোঁড়ামির সঙ্গে বোঝাপড়া এই সমস্ত কিছুর বিকল্প গান্ধীজীর আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোনও জাদুমন্ত্র বলে বা সহজ সূত্র মারফত শান্তি হাসিল করা যায় না। এক জটিল নৈরাজ্যবাদমূলক আন্তর্জাতিক এই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ধৈর্য সহকারে আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, করতে হবে ত্যাগ স্বীকার এবং সমন্বয়সাধন তথা সাহায্য নিতে হবে ধীরে ও সতর্কভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের।

গান্ধীজীর উপলব্ধি এবং আশা ছিল যে, এক স্বাধীন ভারত উদাহরণ পেশ তথা সিদ্ধি অর্জন করে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নৈতিক বোধের এক অনন্য ধারণা সঞ্চার করবে। ‘‘আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা’’, তিনি লিখছেন ১৯২৪ সনে, ‘‘ভারতের উদ্যোগে এক নৈতিকতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বিষয় উপস্থাপন করা হচ্ছে, এমনটা চাক্ষুষ করার থেকে বিন্দুমাত্র কম নয়’’। তাঁর চিন্তায়, প্রতিবেশীদের জন্য আমাদের সেবাকর্মের হাত প্রসারিত করার সময় কোনও সীমারেখা থাকতে পারে না; রাষ্ট্র চিহ্নিত সীমান্তের বাধা পেরিয়েও এগিয়ে যেতে হবে এক্ষেত্রে। ‘‘ঈশ্বর কোনও দিন এই সীমান্তরেখা টানেননি’’, বলেছেন গান্ধীজী। কিন্তু, হায়! মানুষ নিজেই জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পুরস্কার হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশেই আর একটি সীমান্তরেখা টেনে দিল। এভাবেই মানুষের কার্যকলাপের দরুন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তীব্র ঘৃণা ও সংঘাতের কারণে উচ্চ মতাদর্শের বিনাশ ঘটেছে। যাহোক, গান্ধীজীর যুক্তি ছিল, ব্যক্তিবিশেষ যদি পরিবারের স্বার্থে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, তবে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর নিজের গ্রাম, জেলা, প্রদেশ মায় দেশ পর্যন্ত চারিয়ে যায়। ‘‘তেমনই গোটা বিশ্বের উপকার সাধনে, প্রয়োজন পড়লে কোনও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে বলি চড়াতে দ্বিধা ত্যাগ করতে হবে’’। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা ও ধ্যানধারণার ভিত্তি আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা নয়;

জাতিগত বিদ্বেষের কোনও ঠাঁই ছিল না তাতে। আদতে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল নিছক স্বাধীনতা প্রাপ্তির থেকে অনেক বড়ো মাপের। ভারতের মুক্তির মধ্যে দিয়ে পশ্চিমী শোষণের পাহাড়প্রমাণ নিপীড়নের হাত থেকে বিশ্বের তথাকথিত দুর্বল জাতিগোষ্ঠীগুলিকে উদ্ধার করার পথ খোঁজেন তিনি। তাঁর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, বলা যেতে পারে অনেকাংশেই পূরণ হয়েছিল। শান্তির পথে হেঁটে তথা পারস্পরিক সদিচ্ছার মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বহু রাষ্ট্রের কাছেই অনুপ্রেরণা এবং উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইংল্যান্ডে মহিলা মিল কর্মীদের সাথে (১৯৩১)

গুরুত্বপূর্ণ অবদান

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়ে আলোচনায় এবার আসব আমরা। অর্থাৎ, তাঁর দর্শন এবং অহিংস প্রতিরোধের রণকৌশল। তিনি স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় একে 'সত্যাগ্রহ' বা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' তথা ভারতে 'অসহযোগ' এবং 'আইন অমান্য আন্দোলন' বলে বর্ণনা করেছেন। তা ছিল আসলে এক পরাধীন দেশ ও তার বহিরাগত শাসকবর্গের মধ্যে সম্পর্কের টানা-পোড়েন নিরসনে জাতীয় আকারে নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ। এই তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ধরন, দুই-ই ছিল অভূতপূর্ব; মানুষ আগে কখনও তা চাক্ষুষ করেনি। দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তা ছিল ভারতীয় সংগ্রামের মুখ্য হাতিয়ার; এবং শেষাবধি, তার লক্ষ্য অর্জনেও সাহায্য করে। তবে তাই সব নয়। আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় হাজার হাজার মানুষকে তা প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত করে।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যখন পরমাণু বোমা ব্যবহার করা হয়, গান্ধীজী গভীর মর্মপীড়া অনুভব করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ''গণহারে নারী, পুরুষ ও শিশু নিধনে পরমাণু বোমার প্রয়োগ'' ছিল ''বিজ্ঞানের সবচেয়ে নারকীয় ব্যবহার''। তাঁর ভাবনায়, শান্তির একমাত্র বিকল্প হল মানবজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে, ক্রমশ আরও বেশি মাত্রার মারক ও ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক হাতিয়ারসমূহ এবং ব্যালেস্টিক মিসাইল উদ্ভাবনের দৌলতে গোটা বিশ্ব চরম বিপর্যয়ের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। রাসায়নিক এবং জীবাণু সমরাস্ত্র সম্ভারের কথা তো বাদই দিলাম। উভয় মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে শত বিরোধ সত্ত্বেও, এক ''আতঙ্কের ভারসাম্য''-ই ঠেকিয়ে রেখেছে এক পারমাণবিক গণনিধন যজ্ঞ। এই পরিস্থিতিতে, গান্ধীজী পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভারের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি তথা নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এক একক রাষ্ট্রের দ্বারা একতরফা নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

পালটা যুক্তি দেখানো হয় যে, কৃষ্টির প্রসঙ্গ যদি ওঠে, গান্ধীজী ছিলেন সংস্কার ও প্রগতির বিরোধী; আমাদের দেশে ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চাইতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসে লেখা তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ'-এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু ছিল পশ্চিমী সভ্যতার মূল্যবোধের প্রায় পূর্ণত প্রত্যাখ্যান। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা, তা ত্রুটিপূর্ণ হলেও হতে পারে, তা সত্ত্বেও আমাদের একান্ত নিজস্ব এবং বিভিন্ন উৎসমূল থেকে আগত তথা ভিন্ন ভিন্ন জীবনযাপন-শৈলীর মানুষজনের মার্গ ও পন্থা নকল করার পরিবর্তে আমাদের উচিত একেই অতীব মূল্যবান বলে গণ্য করা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরার পর কৃষ্টির প্রশ্নে গান্ধীজী বারংবার এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, তা তার উৎস যাই হোক না কেন, তিনি বিরুদ্ধমত পোষণ করতেন না। আর শুধুমাত্র সুপ্রাচীন, এই দোহাই দিয়ে কোনও আদিম লোকাচার গ্রহণের পক্ষেও সওয়াল করতেন না। তাঁর বলা এই কথাগুলি অতীব প্রসিদ্ধ, ''আমার ঘরের চারদিকে দেওয়াল গেঁথে তুলতে চাই না, আর না তো আমার জানালাগুলোকে রুদ্ধ করে রাখতে চাই। চাই সমস্ত ভূখণ্ডের সংস্কৃতি আমার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত যথাসম্ভব বাধাহীনভাবে ভেসে আসুক। তবে কোনওভাবেই নিজের পায়ের নিচের জমি হারিয়ে ভেসে যেতে আপত্তি আছে আমার। অন্য মানুষের ঘরে অনাহূতজন, ভিক্ষুক বা ক্রীতদাসের মতো বাস করতে আমার তীব্র অমত''। অন্য কথায় বলতে গেলে, তাঁর অভিমত ছিল, মানুষ বুদ্ধিবিবেচনা করে গ্রহণ করুক; নাকি বাছবিচারহীনভাবে। সত্য ও আলোর সন্ধানে, তিনি কোনও জাতীয় সীমানাকে কখনও স্বীকার করে নেননি।❑

জনসংযোগেও গান্ধীজী অদ্বিতীয়

ওয়াই. পি. আনন্দ

'এশিয়ান রিলেশানস্ কনফারেন্স', নয়াদিল্লি, মার্চ, ১৯৪৭

ডক্টর এ. পি. জে. আবদুল কালাম গান্ধীজীকে সর্বোত্তম জনসংযোগ স্থাপক বলে বর্ণনা করেছেন। ধনী-দরিদ্র বা মিত্র-প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তিনি আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসে এত বড়ো মাপের সুদক্ষ জনসংযোগ স্থাপনের নজির খুব বেশি নেই। গান্ধীজী যেমনটা বলতেন, 'আমার জীবন এক অবিভাজ্য সম্পূর্ণতায় আচ্ছাদিত, আমার প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানবজাতির প্রতি অদম্য ভালোবাসা'। সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন 'আমার জীবন এক উন্মুক্ত গ্রন্থের মতো। কখনও কোনও গোপনীয়তা আমার কাছে প্রশ্রয় পায়নি তাই আপনারাও আমাকে যেকোনও বিষয় নিয়ে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারেন'। প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

"আমার জীবনই আমার বাণী"
(CWMG 89 : 156)

ডক্টর এ. পি. জে. আবদুল কালাম গান্ধীজীকে সর্বোত্তম জনসংযোগ স্থাপক বলে বর্ণনা করেছেন। কালামের মতে, মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জনমত গঠন ও জনসমর্থন আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করার বিষয়ে গান্ধীজীর জুড়ি নেই।

প্রকৃত অর্থেই গান্ধীজী অগণিত ভারতবাসীর সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধারণ ও অন্যসাধারণ উভয় পন্থাই অনুসরণ করে জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পান এবং তাঁর এই প্রয়াস তাঁকে সমাজের সকল শ্রেণি সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বাচিক, অ-বাচিক, সংবেদনাত্মক, অতীন্দ্রিয়, সকল প্রকরণেই গান্ধীজী দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।

জনসংযোগে এই অনন্যতা গান্ধীজী কিভাবে অর্জন করলেন? ঔপনিবেশিক শাসন ও সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসাবে জনজীবনে তাঁর বহুধাবিস্তৃত ভূমিকা ছিল : তিনি ছিলেন আজীবনব্যাপী ছাত্র ও শিক্ষক, একজন অনুকরণীয় ব্যবহারজীবী, এক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক, সর্বজনীন নৈতিক আচরণবিধির একজন আদর্শ অনুশীলনকারী এবং একজন অহিংস বিপ্লবী। এছাড়া তাঁকে আমরা অসুস্থ মানুষজনের শুশ্রূষাকারী এমনকি চিকিৎসকের ভূমিকায়ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে দেখেছি।

জনসংযোগের ক্ষেত্রটিতে গান্ধীজীর উত্তরণ ঘটেছিল দীর্ঘ ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রবাসজীবনে। সেখানে তিনি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণির ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্রিয় হন। সেদেশেই তিনি প্রথম সত্য ও অহিংসার মৌলিক নৈতিকতা উপলব্ধি করেন। শুরু হয় অন্যায়, অনাচার রোধকল্পে ও সংঘাত মীমাংসায় তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ (১৯০৬) এবং স্বেচ্ছায় কারবরণপর্ব। একইসঙ্গে জনসেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের পথে নিজেকে নিবেদিত করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার দিনগুলিতেই সেখানকার ভারতীয় অভিবাসীদের কথা ভেবে তাঁর প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশিত হয়। জন রাসকিনের Unto This Last বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধীজী তাঁর প্রথম আশ্রম ফিনিক্স সেটেলমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০৬)। সেখানে তাঁর দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয় এক শ্রেণিবিহীন মানবগোষ্ঠীর সদস্যরূপে। রাসকিনের লেখার শব্দান্তরিত করে ১৯০৮ সালে গান্ধীজী 'সর্বোদয়' শিরোনামে (সর্বজন কল্যাণ) একাধিক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯০৯ সালে সমুদ্রপথে লন্ডন থেকে ডারবান যাবার সময় তিনি 'হিন্দ স্বরাজ' নামক মৌলিক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। যে গ্রন্থে এক স্বাধীন ও অহিংস

[লেখক গান্ধীজী সম্পর্কে বিশিষ্ট পড়ুয়া এবং প্রাক্তন অধিকর্তা, জাতীয় গান্ধী মিউজিয়াম। ই-মেল : ypanandindia@yahoo.co.in]

ভারতীয় জাতি গঠন করার লক্ষ্যে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল। এরপর ১৯০৯-’১০ সালে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। ১৯১০ সালেই সত্যাগ্রহী পরিবারগুলিকে, সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় আশ্রম ‘টলস্টয় ফার্ম’ গড়ে তোলেন। আশ্রমবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তিনি কতটা গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তা আশ্রমিক শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানপর্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : ‘এই ছেলে-মেয়েরাই আমার শিক্ষক হয়ে উঠেছিল, কারণ টলস্টয় ফার্মে আমি নিজের উপর যে শৃঙ্খলা ও সংযম আরোপ করেছিলাম সেটা তাদের জন্যই সম্ভব হয়েছিল (CWMG 39 : 271)।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর (১৯১৫) গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষনেতা হয়ে ওঠেন এবং মানবাধিকারভিত্তিক, সুসমঞ্জস ও ন্যায্য সামজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার শপথ নেন। দেশবাসীর সম্বোধনে তিনি মহাত্মা গান্ধী হলেন এবং পরবর্তী ধাপে জাতির জনক নামে পরিচিতি লাভ করেন।

জাতীয় স্তরে জনসংযোগ স্থাপক হয়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর জীবনযাপন প্রণালীর, যেমন তাঁর পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, পদযাত্রা ও দেশব্যাপী পরিভ্রমণ এবং ব্যক্তিগত ও জনজীবনে পূর্ণ স্বচ্ছতা অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। উদাহরণ-স্বরূপ বলতে হয় যে দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই ভ্রমণকালে (১৯২১) তিনি সেখানকার স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকদের পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ লক্ষ্য করেন। দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হবার সদিচ্ছাই তাঁকে নিজের পরিধান হিসাবে কটিবস্ত্র বেছে নেবার পথে নিয়ে যায়।

গান্ধীজীর বাচনভঙ্গী ও জনসমক্ষে তাঁর ভাষণ, চলাফেরায় ব্যবহৃত তাঁর লাঠি, তাঁর কৌতুকবোধ, সবকিছুতেই নিহিত রয়েছে এক গভীর বার্তা, এমন এক ভাবমূর্তি যা সকলের পক্ষে সহজগম্য। ওইসব প্রতীকত্ব সুস্পষ্ট করে তোলে সত্য, ন্যায়বিচার ও সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্যপূরণে তাঁর আপসহীনতা।

ভারতে তাঁর কর্মযজ্ঞের সূচনায় চম্পারণ ও বরদৌলিতে কৃষকদের এবং আমেদাবাদে শ্রমিকদের শোষণ প্রতিরোধে তিনি সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন। খুব শীঘ্রই রাওলাট বিল (১৯১৯) এবং অসহযোগিতা আন্দোলনকে (১৯২০-’২২) কেন্দ্র করে গান্ধীজী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তথাকথিত ‘দ্য গ্রেট ট্রায়াল’ (১৯২২)-এর প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছায় ৬ বছরের জন্য কারাদণ্ড মেনে নেন (তাঁকে অবশ্য ১৯২৪-এ মুক্তি দেওয়া হয়)। তারপর থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অবধি গান্ধীজীই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এবং পাশাপাশি তিনি লড়াই চালিয়ে যান বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে; আন্দোলন, পরিচালনা করেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে, অস্পৃশ্যতা ও গ্রামীণ অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে। শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণিই হোক বা নিরক্ষর মানুষ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই গান্ধীজীর নেতৃত্বকে মেনে নেন।

গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, “ব্যক্তিমানুষই সবার আগে বিবেচ্য, ব্যক্তিমানুষ ভালো হলে সবারই তাতে মঙ্গল (CWMG 25 : 252 এবং CWMG 39 : 239)। তাঁর মতাদর্শ ও বাণী সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছতো। স্বরাজ, স্বদেশি ও সর্বোদয়ের মতো বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলতেন, কিন্তু এসবের সঙ্গে জড়িত সমকালীন সমাজ ও নৈতিকতার প্রশ্নগুলিকেও এড়িয়ে যেতেন না। গান্ধীজীর স্বরাজ ভাবনায় স্বশাসনের পাশাপাশি আত্মশাসনের কর্তব্যও স্থান পেয়েছিল। স্বাধীনতা বলতে তিনি শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক দিকটিই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ন্যায়ভিত্তিক স্বাধীনতার উপরও সমান জোর দিতেন। তাঁর কাছে জীবনযাপন ছিল সত্যের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষিক সত্য উপলব্ধি করার অধিকার রয়েছে। তাই তিনি বলতেন সব ধরনের বিবাদের মীমাংসা করতে হবে আলোচনার সাহায্যে এবং প্রতিটি অন্যায় ও অবিচারের সমাধান করতে হবে অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা।

লেখক হিসাবে গান্ধীজী স্বমহিমায় উজ্জ্বল—তাঁর লেখনশৈলী সহজ, সরল অথচ গভীর অর্থবহ এবং সহজেই অনুধাবনযোগ্য। নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : ‘এর দ্বারা আমি প্রাতিস্বিকতাকে খুঁজে পাই এবং নিজের দুর্বলতাগুলিকে বুঝে নিতে পারি (CWMG 27 : 322)। ডক্টর কালাম তাঁকে ‘আমাদের কালের সম্ভবত সেরা সাংবাদিক’ বলে অভিহিত করেছেন। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় The Vegetarian পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ রচনার সূচনা। ১৯০৩ সালের পর থেকে তাঁকে আমরা গুজরাতি, ইংরেজি ও হিন্দিতে নিয়মিত নিবন্ধ রচনা করতে দেখি এবং এই পর্বে যে তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন সেগুলি হল : দক্ষিণ আফ্রিকায় Indian Opinion এবং ভারতে নবজীবন, Young India ও হরিজন। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, ‘সাংবাদিকতার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেবা করা’ (CWMG 39 : 229)। আরও বলেছিলেন : ‘সংবাদপত্রের একটি লক্ষ্য হবে জনমানসকে উপলব্ধি করে তা তুলে ধরা, আর একটি হবে মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত অনুভূতিগুলিকে জাগরিত করা এবং তৃতীয় লক্ষ্য হবে নির্ভীকতার পরিচয় রেখে মানুষজনের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে উন্মোচিত করা’ (CWMG 10 : 8)।

মহাত্মা গান্ধীর রচনা সঙ্কলন বা CWMG-তে রয়েছে ১০০-টি খণ্ড (প্রতিটিতে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা)। মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ এগুলিতে। বন্ধু বা অনুগামী যেই হোন না কেন সবার সঙ্গেই ঘটেছে তাঁর পত্রবিনিময়। গান্ধীজীর সুপরিচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ‘Hind Swaraj’, ‘An autobiography, or, My Experiments with Truth’, ‘Satyagraha in South Africa’, ‘The Key to Health’ এবং ভগবদ্‌গীতার উপর

তাঁর অনবদ্য ভাষ্যের। এছাড়াও রয়েছে গঠনমূলক কর্মসূচি এবং আশ্রম শপথ বিষয়ে তাঁর আরও কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

মনে রাখতে হবে তাঁর সমকালে গণমাধ্যমের প্রভাব ছিল খুবই সীমিত এবং সমস্যা আরও জটিল হয়েছিল দেশে ব্যাপক নিরক্ষরতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে। কিন্তু নিঃস্বার্থ জনসেবায় তাঁর অবিচলতা সাধারণ মানুষকে তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে আকৃষ্ট করেছিল। গান্ধীজী বলেছেন, 'চারিত্রিক বিকাশের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত ধর্মের অনুশীলনেও চরিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জীবনের প্রতিটি স্তরেই শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা উচিত (CWMG 37 : 320)।

সহজাত উপলব্ধি থেকেই তিনি দরিদ্র, দুর্বল, শোষিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মৌলিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। একজন অক্লান্ত জনসংযোগকারীর ভূমিকায় তাঁর মধ্যে কোনওরকম ভণিতা বা গোঁড়ামি ছিল না। গান্ধীজীর কথায়, 'সত্যের অনুসন্ধানে আমি বহু ধ্যানধারণা বর্জন করে নতুন অনেক শিক্ষালাভ করেছি।' অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই তাঁর 'অন্তঃপ্রকৃতি রুদ্ধ হয়নি' (CWMG 55 : 61)।

প্রার্থনা, মৌনপালন ও অনশনের মতো সহজ পন্থাগুলির অতুলীয় সদ্ব্যবহার করে গান্ধীজী নিজের বাণী সকলের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এর দ্বারা সক্রিয়তা এসেছে গণচেতনায় এবং সর্বশ্রেণির মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। গান্ধীজীর মতে, 'মানবদেহের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনই মানবাত্মার জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে উপাসনার' (CWMG 35 : 361)। তিনি আরও বলেছেন 'একজন সত্যান্বেষীর জীবনে মৌনাবলম্বনের গুরুত্ব অনেক' (CWMG 27 : 437)। প্রতি সোমবার নিয়ম করে মৌন পালনকে তিনি জনসংযোগের এক শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। তার কথায়, 'যে ভাষা হৃদয় থেকে উৎসারিত তা সহজেই মানুষজন বুঝে নিতে পারেন। উপবাস যখন সর্বাঙ্গীণ-ভাবে নিঃস্বার্থ তখন সেটা হৃদয়ের মর্মস্থলের ভাষা হয়ে ওঠে' (CWMG 58 : 171)।

'ব্রডকাস্টিং হাউস', নয়াদিল্লি, নভেম্বর ১২, ১৯৪৭

তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচিগুলিতেও আমরা অনুকরণীয় জনসংযোগের নিদর্শন দেখতে পাই। আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসাবে খাদি ও চরকা কাটাকে তিনি 'স্বদেশি চেতনা' রূপে তুলে ধরেন। দৈনন্দিন জীবনে চরকা কাটা ও খাদি বস্ত্র পরিধানের মাধ্যমে গান্ধীজী আত্মনির্ভরতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধকে গণপ্রতীকে পরিণত করেন। 'খাদি মানসিকতা' গড়ে তুলে তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন ও বণ্টনকে বিকেন্দ্রীভূত এবং দেশবাসীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসের দ্বারা গান্ধীজীর অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির গভীরতা প্রমাণিত হয়। একই কথা প্রযোজ্য 'গান্ধী টুপি'-র ক্ষেত্রেও।

কথা ও কাজে তিনি সতত সত্যানুসন্ধানী। এটাই তাঁকে অনুগামীদের মধ্যে যেমন তেমনই বিরোধীদের কাছেও আস্থাভাজন করে তুলেছিল। তাঁরই পরিচালনাধীন স্বাধীনতা ও সমাজসেবায় জন্য নিবেদিতপ্রাণ আশ্রমগুলি স্বেচ্ছাসেবীদের পীঠস্থানে পরিণত হয়। নেতৃত্বদানের সকল গুণাবলীই তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল, তাঁর আদর্শনিষ্ঠ ও বহুমুখী ব্যক্তিত্ব অনুপ্রাণিত করেছিল অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জনকে। পরিকল্পক ও সংগঠকের ভূমিকায় গান্ধীজী ছিলেন সবার শীর্ষে। তাঁর নেতৃত্বাধীন লবণ সত্যাগ্রহকে তিনি 'ক্ষমতার বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষার লড়াই' বলে বর্ণনা করেছিলেন (CWMG 43 : 180)। পূর্ণ স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে এর প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

ধনী-দরিদ্র বা মিত্র-প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তিনি আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসে এত বড়ো মাপের সুদক্ষ জনসংযোগ স্থাপনের নজির খুব বেশি নেই। গান্ধীজী যেমনটা বলতেন, 'আমার জীবন এক অবিভাজ্য সম্পূর্ণতায় আচ্ছাদিত, আমার প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানবজাতির প্রতি অদম্য ভালোবাসা' (CWMG 57 : 20)। সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন 'আমার জীবন এক উন্মুক্ত গ্রন্থের মতো। কখনও কোনও গোপনীয়তা আমার কাছে প্রশ্রয় পায়নি তাই আপনারাও আমাকে যেকোনও বিষয় নিয়ে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারেন' (CWMG 70 : 8)। প্রকৃত অর্থেই তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

গান্ধীজীর ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁকে সম্মান জানিয়ে বলেন : 'কোনও বহিস্থিত কর্তৃপক্ষের সমর্থন ব্যতিরেকেই তিনি তাঁর দেশবাসীর নেতা হয়ে উঠেছেন...তিনি প্রজ্ঞা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি, তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছে জনকল্যাণে...আগামী প্রজন্মের অনেকেই বিস্মিত হবেন এটা ভেবে যে, এমন একজন ব্যক্তিত্ব সত্যিই, সশরীরে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।'

দোসরা অক্টোবরকে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস (২০০৭ সালে) ঘোষণার দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয় যে একজন অভিনব জনসংযোগ স্থাপক হিসাবে গান্ধীজীর অপার মহিমা আজকের দিনেও অটুট রয়েছে।❑

গ্রন্থপঞ্জি :

(১) *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vols. 1 to 100, New Delhi: Publications Division, 1958 – 94; referred in the Article as CWMG Vol. no.:page no., e.g. CWMG 25:390.

(২) Kusum Lata Chadda, *Gandhi—The Mass Communicator*, New Delhi : Kanishka Publishers, 2010.

(৩) Dr. Dhiraj Kakadia, *Mahatma—A Great Communicator*, Ahmedabad : Navajivan Publishing House, 2016.

অনুপ্রেরণাদাতা গান্ধী

Young India

Edited by M. K. Gandhi

AHMEDABA[D], WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1919. | PRICE ONE ANNA PER COPY.

CONTENTS

NOTES AND NEWS.

"WE ARE APT TO MAKE MISTAKES."

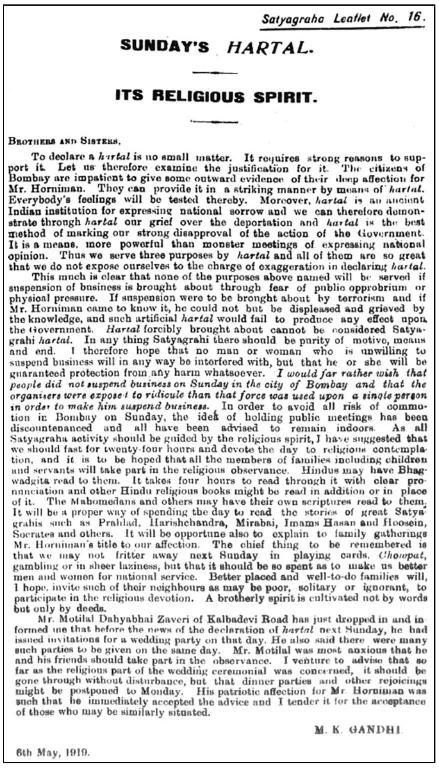

Satyagraha Leaflet No. 16.

SUNDAY'S *HARTAL*.

ITS RELIGIOUS SPIRIT.

BROTHERS AND SISTERS,

To declare a *hartal* is no small matter. It requires strong reasons to support it. Let us therefore examine the justification for it. The citizens of Bombay are impatient to give some outward evidence of their deep affection for Mr. Horniman. They can provide it in a striking manner by means of *hartal*. Everybody's feelings will be tested thereby. Moreover, *hartal* is an ancient Indian institution for expressing national sorrow and we can therefore demonstrate through *hartal* our grief over the deportation and *hartal* is the best method of marking our strong disapproval of the action of the Government. It is a means, more powerful than monster meetings of expressing national opinion. Thus we serve three purposes by *hartal* and all of them are so great that we do not expose ourselves to the charge of exaggeration in declaring *hartal*.

This much is clear that none of the purposes above named will be served if suspension of business is brought about through fear of public opprobrium or physical pressure. If suspension were to be brought about by terrorism and if Mr. Horniman came to know it, he could not but be displeased and grieved by the knowledge, and such artificial *hartal* would fail to produce any effect upon the Government. *Hartal* forcibly brought about cannot be considered Satyagrahi *hartal*. In any thing Satyagrahi there should be purity of motive, means and end. I therefore hope that no man or woman who is unwilling to suspend business will in any way be interfered with, but that he or she will be guaranteed protection from any harm whatsoever. *I would far rather wish that people did not suspend business on Sunday in the city of Bombay and that the organisers were exposed to ridicule than that force was used upon a single person in order to make him suspend business.* In order to avoid all risk of commotion in Bombay on Sunday, the idea of holding public meetings has been discountenanced and all have been advised to remain indoors. As all Satyagraha activity should be guided by the religious spirit, I have suggested that we should fast for twenty-four hours and devote the day to religious contemplation, and it is to be hoped that all the members of families including children and servants will take part in the religious observance. Hindus may have Bhagwadgita read to them. It takes four hours to read through it with clear pronunciation and other Hindu religious books might be read in addition or in place of it. The Mahomedans and others may have their own scriptures read to them. It will be a proper way of spending the day to read the stories of great Satyagrahis such as Prahlad, Harishchandra, Mirabai, Imams Hasan and Hoosein, Socrates and others. It will be opportune also to explain to family gatherings Mr. Horniman's title to our affection. The chief thing to be remembered is that we may not fritter away next Sunday in playing cards, *Chowpat*, gambling or in sheer laziness, but that it should be so spent as to make us better men and women for national service. Better placed and well-to-do families will, I hope, invite such of their neighbours as may be poor, solitary or ignorant, to participate in the religious devotion. A brotherly spirit is cultivated not by words but only by deeds.

Mr. Motilal Dahyabhai Zaveri of Kalbadevi Road has just dropped in and informed me that before the news of the declaration of *hartal* next Sunday, he had issued invitations for a wedding party on that day. He also said there were many such parties to be given on the same day. Mr. Motilal was most anxious that he and his friends should take part in the observance. I venture to advise that so far as the religious part of the wedding ceremonial was concerned, it should be gone through without disturbance, but that dinner parties and other rejoicings might be postponed to Monday. His patriotic affection for Mr. Horniman was such that he immediately accepted the advice and I tender it for the acceptance of those who may be similarly situated.

M. K. GANDHI

6th May, 1919.

'Young India' এবং 'হরিজন' পত্রিকা দু'টি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে তিনি লেখালেখি করতেন। খুব সহজসরল ভাষায় ধোঁয়াশাহীনভাবে লিখতেন; তবে দৃঢ়তার সঙ্গে, প্রবল আবেগ এবং জ্বলন্ত ক্রোধের স্ফূরণ-সহ। তাঁর কথায়, সংবাদপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, জনতার ভাবনাকে হৃদয়ঙ্গম করে তাকে ভাষা জোগানো। তাদের আরেকটি দায়িত্ব, জনগণের মধ্যে জরুরি আবেগকে চাগিয়ে তোলা। তৃতীয়টি হল, সমস্ত প্রচলিত ত্রুটিবিচ্যুতিকে নির্ভয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

গান্ধীজীর পত্রিকায় কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত না। তবে প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হ'ত। কোনও লাভ-ক্ষতির অঙ্ক না কষেই তিনি সাংবাদিকতা চালিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম ছিল না সাংবাদিকতা। ছিল মানুষের সেবা করার অন্যতম পন্থা। 'Young India'-তে ১৯২৫ সালের ২ জুলাই তারিখে ছাপা তাঁর এক লেখার ভাবার্থ দাঁড়ায়, "আমি সাংবাদিকতা করার নিমিত্তে তা শুরু করিনি। আমার জীবনের মিশন হিসাবে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি, তা পূরণে সহায়ক হবে বলে একে বেছে নিয়েছি। আমার মিশন হল, উদাহরণ পেশ করে এবং বর্তমানের কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতার মাধ্যমে সত্যাগ্রহ নামক অতুলনীয় হাতিয়ার ব্যবহারের পাঠ পড়ানো; যা কিনা অহিংসার প্রত্যক্ষ ফলাফল।

গান্ধীজী সাংবাদিকতাকে মানুষের সেবা করার এক পথ হিসাবে দেখতেন। এবিষয়ে আত্মজীবনীতে তিনি যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার ভাবার্থ দাঁড়ায়, "সাংবাদিকতার একমেবাদ্বিতীয়ম্ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেবা। সংবাদপত্র এক মহাশক্তি। কিন্তু লাগামহীন বন্যার জলরাশি যেমন গোটা গ্রামাঞ্চলকে প্লাবিত করে ফসল তছনছ

অনুপ্রেরণাদাতা গান্ধী

করে দেয়, সেরকমই নিয়ন্ত্রণহীন কলমও ধ্বংস ডেকে আনে। এই নিয়ন্ত্রণ যদি কোনও কার্যকারণ ছাড়াই আরোপ করা হয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের পেছনে যে ইচ্ছা কাজ করে, তার থেকেও মারাত্মক বলে প্রমাণিত হবে। একমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের রাস্তা অবলম্বন করলেই তা সুফলদায়ক হয়ে উঠবে। কারণ নির্দেশের পথ যদি সঠিক হয়, আজকের দুনিয়ার কতগুলি পত্রিকা সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? কিন্তু কে এসব অর্থহীন জিনিসকে থামাবে? কেই বা এদের যাচাই করবে? অর্থহীন এবং অর্থপূর্ণ নিঃসন্দেহে মন্দ ও ভালো, এই দুইয়ের ন্যায়। তারা একই সাথে চলে; মানুষকেই সঠিকটা বেছে নিতে হবে।❑

অধ্যাপক ভি. এস. গুপ্তা লিখিত ‘Mahatma Gandhi And Mass Media’ শীর্ষক নিবন্ধের সারসংক্ষেপ।

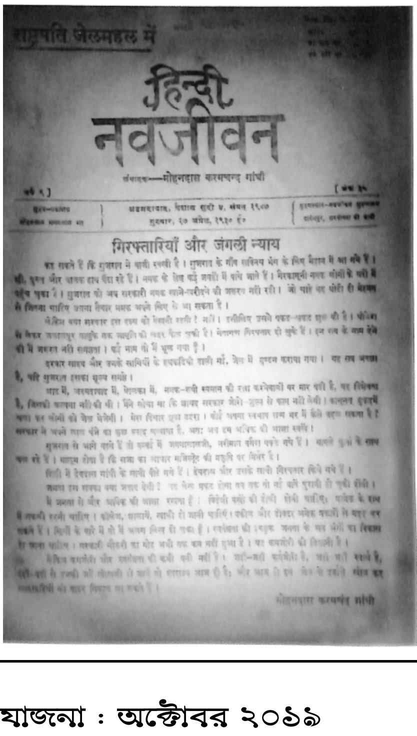

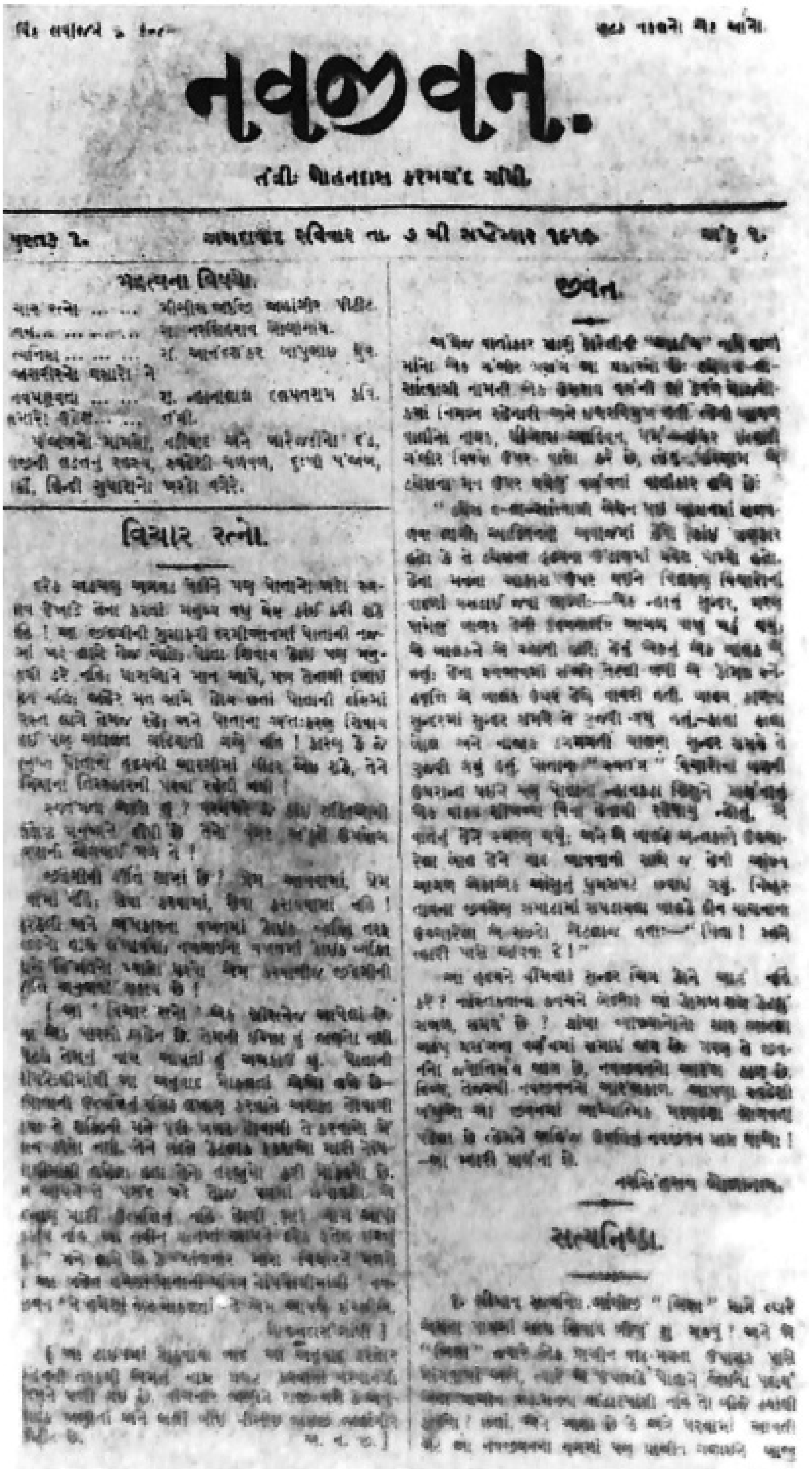

নবজীবন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯); Young India (৮ অক্টোবর, ১৯১৯) এবং সত্যাগ্রহ পুস্তিকা (৬ মে, ১৯১৯), বম্বে (বর্তমানের মুম্বাই)-তে হরতালের উদ্দেশ্যে রণডঙ্কা বাজিয়ে আহবান জানায়

জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথ

এ. আন্নামালাই

'তালিমি সংঘ'-এর স্কুল, সেবাগ্রাম

ভারতীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে গান্ধীজীর ১৮ দফা কর্মসূচি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্তর্নিহিত ইতিবাচক শক্তিগুলি একত্রিত করার এক পরিকল্পিত প্রয়াস। গান্ধীজী গঠনমূলক কর্মসূচিকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে তা অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করে সাধারণ মানুষের আত্মবিকাশ ঘটায় এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। পরিবর্তনের যে মন্ত্র গান্ধীজী শিখিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও তার প্রাসঙ্গিকতা অটুট এবং সেজন্যই এখনও আমরা আজকের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচি বিশ্লেষণ করতে বসি।

সেবাগ্রাম থেকে বারদৌলি যাওয়ার পথে রেল যাত্রাপথে গান্ধীজী একটি ছোটো পুস্তিকা লিখেছিলেন, যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত সবাইকে কয়েকটি মূল বিষয়ের ওপর নজর দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। প্রথমে এতে ১৩-টি বিষয় ছিল, পরে গান্ধীজী আরও ৫-টি সংযুক্ত করে। এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সমাজের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে গান্ধীজীর ১৮ দফা কর্মসূচির মূল কাঠামো। ১৯৪২ সালে তিনি লেখেন, "আমরা যদি সত্য ও অহিংসার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন করতে চাই, তা হলে গঠনমূলক প্রয়াসের ওপর ভিত্তি করে একেবারে নিচু থেকে ধীর অথচ নিশ্চিত ক্রম উত্তরণই একমাত্র পথ।"

এই কর্মসূচিতে গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে নিজেদের কাঠামো ও পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার পুনর্গঠন করতে হবে। একইসঙ্গে এটি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্তর্নিহিত ইতিবাচক শক্তিগুলি একত্রিত করার এক পরিকল্পিত প্রয়াস। গান্ধীজী গঠনমূলক কর্মসূচিকে এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে তা অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করে সাধারণ মানুষের আত্মবিকাশ ঘটায় এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে।

পরিবর্তনের যে মন্ত্র গান্ধীজী শিখিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও তার প্রাসঙ্গিকতা অটুট এবং সেজন্যই এখনও আমরা আজকের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচি বিশ্লেষণ করতে বসি। যে প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ গান্ধীজী করেছিলেন, সেগুলির ব্যবহারিক পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, কিন্তু সেগুলি আজও সবল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক গুরু গোখলের নির্দেশ মতো গান্ধীজী সারা ভারত ঘুরে দেখেন। ভারতের 'অবক্ষয়' তাঁকে ব্যথিত করে। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন, দীর্ঘদিনের শোষণমূলক বিদেশি শাসন ভারতের মানুষকে ভীরু ও গভীরভাবে জাতপাতে বিভাজিত করে তুলেছে, তাদের মধ্যে সামাজিক ও নাগরিক চেতনার বিকাশ হয়নি। দেশের পুনর্গঠন না হলে ভারত স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষা, কোনওটাই করতে পারবে না। সেজন্য জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে গান্ধীজী একটি সার্বিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, যাকে তিনি বলতেন গঠনমূলক কর্মসূচি। এর উপাদানগুলি ছিল অনন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে সারা জীবন যেসব আদর্শ মেনে চলেছিলেন, এই কর্মসূচিতে সেগুলিই সঙ্কলিত হয়েছিল।

১৯৪১ সালে এই কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক-ভাবে চালু করলেও চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়েই স্কুল স্থাপন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত গঠনমূলক কাজগুলি

[লেখক প্রখ্যাত গান্ধীবাদী তথা নয়াদিল্লিস্থিত 'জাতীয় গান্ধী মিউজিয়াম'-এর অধিকর্তা। ই-মেল : nationalgandhimuseum@gmail.com]

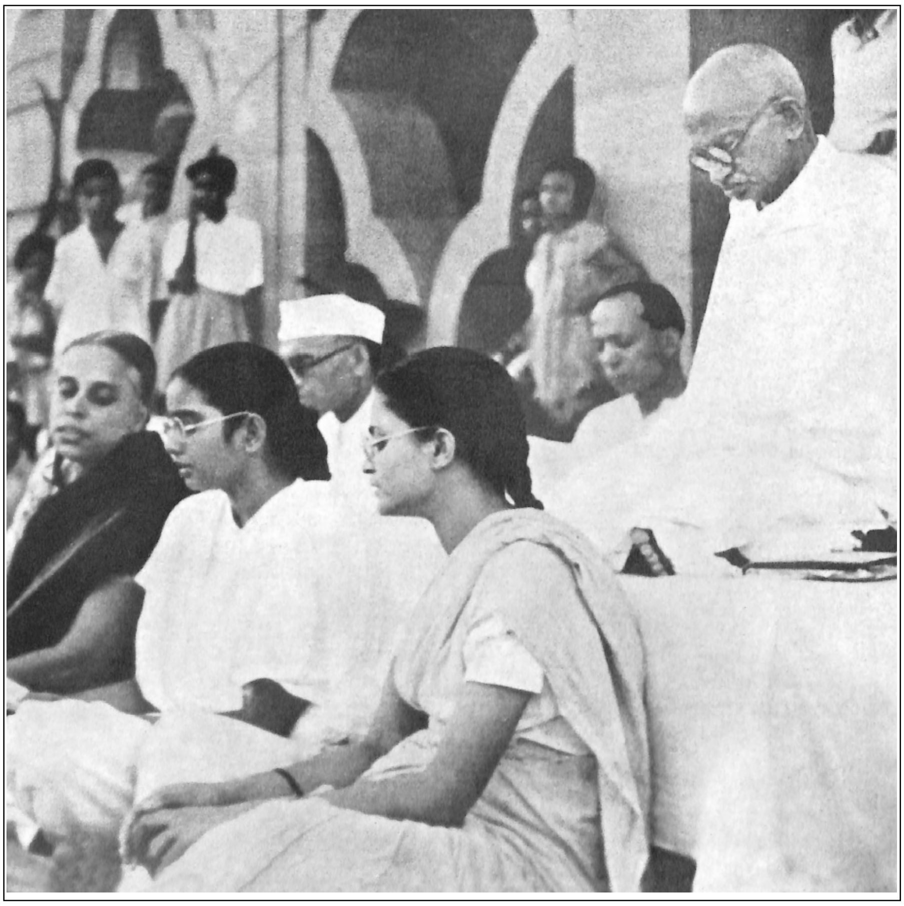

শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর আশ্রমে কর্মীদের একাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত।

সম্পূর্ণ নয়, উদাহরণমূলক

গান্ধীজী ১৮ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন, তবে এই তালিকা সম্পূর্ণ বা সার্বিক নয়, ছিল উদাহরণমূলক। সত্যি বলতে কী, কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কী ধরনের কাজের প্রয়োজন আছে, তা আগে থেকে অনুমান করা অসম্ভব। আবার একটি এলাকার চাহিদা ও প্রয়োজন না বুঝে সেখানে আগে থেকে স্থির করে রাখা একটি কর্মপরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া খুব একটা সমীচীনও নয়। সেজন্যই এই পুস্তিকার প্রস্তাবনায় গান্ধীজী লিখেছিলেন, "এখানে যে ক্রমানুসারে বিষয়গুলি লেখা হয়েছে, তা কোনওভাবেই তাদের গুরুত্বের নির্দেশক নয়। যদি কোনও পাঠক দেখেন, তাঁর বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় এই তালিকায় নেই, তা হলে তিনি জানবেন এই অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত নয়। কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি সেই বিষয়টি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে জানাবেন। আমার এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, নিছকই উদাহরণ-মূলক। পাঠকেরা এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করতে পারেন।"

গান্ধীজীর এই ১৮ দফা কর্মসূচিকে মোটা-মুটিভাবে যে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায় তা হল : সামাজিক (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতার অবসান, নিষেধাজ্ঞা, মহিলা, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী, কুষ্ঠরোগী); অর্থনৈতিক (খাদি, অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প এবং অর্থনৈতিক সাম্য); শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জাতীয় ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষা) এবং স্বাস্থ্য (গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য)।

(১) সাম্প্রদায়িক একতা : শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্যের মেরুদণ্ড এবং উন্নয়নের ভিত্তি। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, "এটা স্বীকার করতেই হবে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহই হল বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের মূল কারণ। তা জাতীয় জীবনকে এতটাই বিষিয়ে দিয়েছে যে ধর্মাচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা-সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা একে অপরকে সন্দেহ করছি। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বা অন্য পক্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে শক্তির অপব্যবহার আমরা যদি বন্ধ করতে পারি, তাহলে পারস্পরিক বিশ্বাস আবার ফিরে আসবে।" মহাত্মা গান্ধী এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যই তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

(২) অস্পৃশ্যতা দূর : অস্পৃশ্যতা হল সংগঠিত হিংসা ও নীচতার সুস্পষ্ট প্রকাশ, যা ধর্মের নামে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। গান্ধীজী জোর দিয়ে বলেছেন, কোনও ধর্ম কখনও অস্পৃশ্যতার কথা বলেনি এবং এই অমানবিক প্রথা আমাদের সমূলে উৎখাত করতেই হবে। আজকের এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাত্রায় যেভাবে অস্পৃশ্যতা রয়ে গেছে, তা আমাদের লজ্জা। ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান। গান্ধীজী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের নিকৃষ্ট জাতির মানুষ 'কুলি' বলে মনে করে অমানবিক আচরণ করত। আজ আমরা স্বজাতির কোনও মানুষের প্রতি যদি সেই একই আচরণ করি, তাকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। তাই সবার উচিত অন্যকে সমদৃষ্টিতে দেখা এবং এই অমানবিক প্রথার অবসানে সক্রিয় হওয়া।

(৩) নিষেধাজ্ঞা : গান্ধীজী মদের নেশার তীব্র বিরোধী ছিলেন। এই নেশা শুধু যে পরিবারগুলিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক-ভাবে বিপর্যস্ত করত তাই নয়, সমাজের নৈতিক বুনন, যা অহিংস আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ, তাকেও নষ্ট করত। গান্ধীজী একবার বলেছিলেন, তাঁকে যদি একদিনের জন্য একনায়ক করে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সবার আগে, কোনও ক্ষতিপূরণ না দিয়ে মদের দোকানগুলি বন্ধ করে দেবেন।

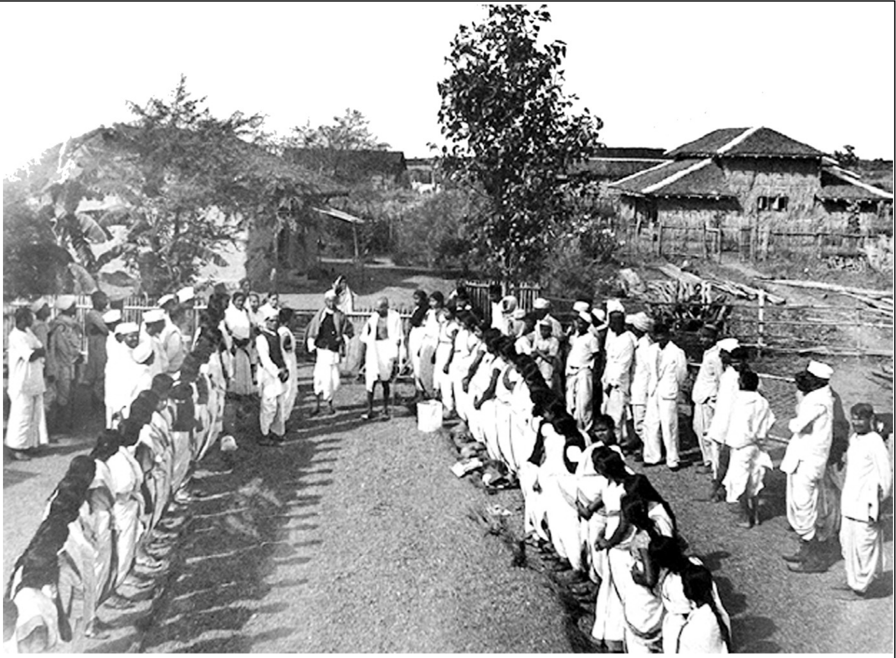

সাফাই অভিযানের আগে (মহারাষ্ট্র, ১৯৩৯)

(৪) খাদি : খাদি আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা ও স্বদেশির প্রতীক। সেই সময়ে চরকা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক এবং খাদি জাতীয়তাবাদের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের আওতায় আসে। সাধারণ মানুষ একসময়ে পুলিশকে ভয় পেত, কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের কৌশলে পুলিশ, খাদি পরিহিতদের ভয় পেতে শুরু করে। যা ছিল নিছকই এক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তা হয়ে উঠল এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার। শ্রমের মর্যাদা, বিকেন্দ্রীকরণ, অহিংসা ও সরলতার মতো মূলগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও কীভাবে একে আরও আকর্ষণীয় করে সুলভে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটাই এখন খাদির সামনে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আজ আর স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বদেশি আন্দোলনের মতো শক্তিশালী অনুঘটক নেই, তাই খাদিকে আজ নিজের দর্শনগত ভিত্তির ওপরে নিজস্ব শক্তিতে দাঁড়াতে হবে।

(৫) অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প : সূর্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকে, তেমনি গান্ধীজী কল্পনা করেছিলেন, খাদিকে কেন্দ্রস্থলে রেখে অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প তার চারপাশে আবর্তিত হবে। ভারতকে তিনি স্বনির্ভর গ্রামীণ প্রজাতন্ত্রের সমষ্টি হিসাবে ভেবেছিলেন। তাই গ্রামীণ অর্থনীতির সুস্থিত উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ শ্রমশক্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রাখা আবশ্যক ছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন, গ্রামনির্ভর বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমের অনুকরণে যন্ত্রে তৈরি পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দেব না। বরং আমরা নতুন ভারতের ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এমন এক জাতীয় রুচিবোধ গড়ে তুলব, যেখানে দারিদ্র্য, অনাহার ও শ্রমবিমুখতার কোনও জায়গা থাকবে না।”

(৬) গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি : দক্ষিণ আফ্রিকাতে থাকার সময়েই গান্ধীজী স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি দেখে-ছিলেন, ভারতীয়দের আবাসস্থলে স্বাস্থ্যবিধির করুণ দশা দেখে ইংরেজরা ভারতীয়দের ‘কুকুর’ ও ‘শুয়োর’ বলে অভিহিত করত। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন, “সেখানে এমন আবর্জনা জমা হয়ে কটু গন্ধ ছড়াত যে সবাইকে চোখ বন্ধ করে নাক চাপা দিয়ে জায়গাটা পেরোতে হ’ত।” গান্ধীজী বলেছিলেন, “আমাদের গ্রামগুলিকে সর্বার্থে পরিচ্ছন্নতার আদর্শস্থল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।”

(৭) নতুন অথবা মূলগত শিক্ষা : দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স বসতির শিশুদের মধ্যে শিক্ষা নিয়ে গান্ধীজী তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তিনি জানতেন, শিক্ষাই কোনও সভ্যতার মেরুদণ্ড। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজের তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে তাদের নিজস্ব সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছে। গান্ধীজী এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যা মানুষের মানসিকতার রূপান্তর ঘটিয়ে নতুন সামাজিক রীতিনীতির সূচনা করবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা “দেহ ও মনের বিকাশ ঘটাবে এবং বিদ্যালয় স্তর থেকেই একজন শিশুকে তার নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যতের দিশা দেখাবে।”

(৮) বয়স্কশিক্ষা : বয়স্কশিক্ষা কেবল নিরক্ষরদের পড়তে এবং লিখতে শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, “আমার ওপর বয়স্কশিক্ষার ভার থাকলে আমি সবার আগে শিক্ষার্থীদের আমাদের দেশের বিশালত্ব ও মহানতার বিষয়ে সচেতন করে তুলতাম।” বয়স্কশিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়া ছাড়াও আমরা গ্রামবাসীদের তাদের অধিকার, গ্রাম স্বরাজ, জল সংরক্ষণ, কৃষিকর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারি।

(৯) মহিলা : গান্ধীজী মহিলাদের শক্তি পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। মহিলাদের আত্মত্যাগের প্রবণতা, দুঃখদুর্দশা, ভালোবাসা ও যত্নশীলতার বিষয়ে অবগত ছিলেন তিনি। গান্ধীজী বলতেন, মহিলাদের দুর্বলতর লিঙ্গ বলা ঠিক নয়। আসলে তাঁরা নিজেদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী, সেখানে পুরুষেরাই তাদের তুলনায় দুর্বল। পুরুষ ও মহিলা শুধু সমানই নয়, একে অপরের পরিপূরক। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন সমাজে তাদের মর্যাদা ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং সমাজে অহিংসার প্রসারে সহায়ক হবে। গঠনমূলক

সেবাগ্রামে হাতে বানানো কাগজ তৈরি করা হচ্ছে

কর্মসূচিতে মহিলাদের কেন তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা বোঝাতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন, "সত্যাগ্রহ মহিলাদের অন্ধকার থেকে বের করে এনেছে। এত দ্রুত এই ডাকে আর কেউ সাড়া দিতে পারেনি। কংগ্রেসের সদস্যরা বুঝতে পারেননি, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মহিলারা তাদের সমান অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। সেবার ব্রতে মহিলারা যে পুরুষের সত্যকার সহযোগী হয়ে উঠতে পারেন, তা বোঝার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বিভিন্ন সংস্কার, প্রথা ও রীতিনীতির শৃঙ্খল পরিয়ে মহিলাদের দমিয়ে রাখা হয়েছিল। অহিংসার ওপর আধারিত একটি জীবন গড়ে তোলার অধিকার একজন পুরুষের যতটা, একজন মহিলারও ঠিক ততটাই আছে।"

(১০) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা : স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে পৃথক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করতে চাইছেন কেন? কারণ তাঁর ভাবনায় এর একটি সার্বিক রূপ রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, "একে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু আমি তা চাইনি। কেবল পানীয় জল ও নিকাশির কথা বলাই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয় এবং এর অভ্যাস হওয়া দরকার। একটি সুগঠিত সমাজে নাগরিকরা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিধিগুলি জানেন এবং মেনে চলেন।"

(১১) প্রাদেশিক ভাষা : গান্ধীজী সবসময়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর জোর দিতেন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই তাদের আঞ্চলিক ভাষার প্রসারে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তিনি। গান্ধীজী বলেছিলেন, "ইংরাজি ভাষার প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব এবং নিজের মাতৃভাষার থেকে তাকে বেশি সমাদর করার ফলে শিক্ষিত রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ভারতীয় ভাষাগুলি দরিদ্র হয়ে পড়ছে।"

(১২) জাতীয় ভাষা : গান্ধীজী মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন, আবার একইসঙ্গে একটি জাতীয় ভাষা চয়নেরও সমর্থক ছিলেন। তিনি বলতেন, "ভারতজুড়ে সংযোগের জন্য আমাদের এমন একটি ভারতীয় ভাষা বেছে নেওয়া উচিত, যা বেশিরভাগ মানুষ জানে এবং যারা জানে না তারাও সহজে শিখতে পারে। হিন্দুস্তানি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত।"

(১৩) অর্থনৈতিক অসাম্য : এই বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক সাম্যই হল, "অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জনের চাবিকাঠি। অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ হল মূলধন ও শ্রমের চিরায়ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো। এর অর্থ একদিকে কতিপয় ধনী, যাদের হাতে জাতির সিংহভাগ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে ধনসম্পদ নিয়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, না খেতে পাওয়া মানুষের মধ্যে

সেই সম্পদের বিতরণ। যতদিন ধনী এবং লক্ষ লক্ষ অভুক্ত মানুষের মধ্যে এই বিশাল ফারাক থাকবে, ততদিন অহিংস পদ্ধতিতে শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।"

(১৪) কৃষক : আধুনিক উন্নয়ন কৌশলের দরুন সব থেকে বেশি খেসারত দিতে হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রকে। অথচ গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের ধারণার কেন্দ্রে ছিল কৃষি। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে কৃষকরা যাতে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেন, তারা যাতে ভালো থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে বলে গান্ধীজী মনে করতেন। চম্পারণ, খেড়া, বারদৌলি, বরসাদ প্রভৃতি এলাকায় এই বিষয়ে নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য কৃষকদের বঞ্চনা না করার মধ্যেই সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে।"

(১৫) শ্রমিক : আমেদাবাদ মিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের মাধ্যমে গান্ধীজী শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। আমেদাবাদের বস্ত্রবয়ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের এক অনন্য মডেল তৈরি করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, উন্নয়নকে ব্যাহত করা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সার্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়াই শ্রমশক্তির লক্ষ্য।

(১৬) আদিবাসী : তাদের অজ্ঞতা ও সারল্যের জন্য আদিবাসীরা বরাবরই স্বার্থপর মানুষজনের হাতে শোষিত হয়ে এসেছেন। অরণ্যের বিপুল সম্পদ বহু মানুষকে আকর্ষণ করেছে এবং তার জেরে স্থানীয় অধিবাসীদের তাদের শিকড় থেকে উৎখাত হতে হয়েছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হলে আদিবাসী এবং তাদের ঐতিহ্যকেও রক্ষা করতে হবে।

(১৭) কুষ্ঠরোগী : সেবাগ্রাম আশ্রমে গান্ধীজী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত সংস্কৃত পণ্ডিত পরচুর শাস্ত্রীর ক্ষতের শুশ্রূষা করতেন। কুষ্ঠরোগীদের আজও সমাজে ঘৃণা ও অবহেলার মুখোমুখি হতে হয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, "ভারতকে যদি নতুন প্রাণস্পন্দনে উজ্জীবিত হয়ে সত্য ও অহিংসার পথে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীনতা

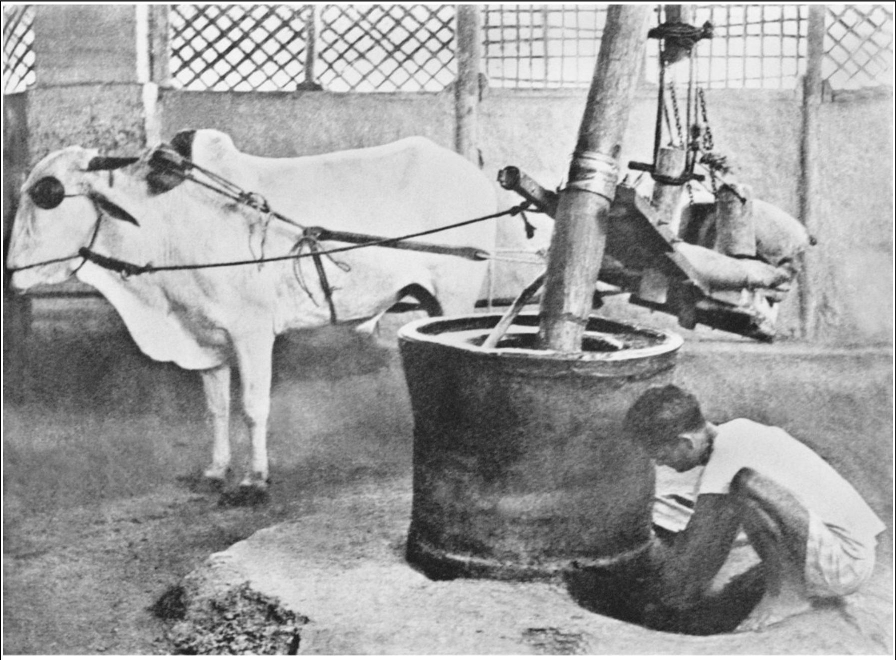

সেবাগ্রাম আশ্রমে তেলের কল

অর্জন করতে হয় এবং এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা যদি সত্যিই আন্তরিক হই, তা হলে দেশের একজনও কুষ্ঠরোগী ও ভিক্ষুককে অবহেলা করা যাবে না।"

১৮। ছাত্র-ছাত্রী : গান্ধীজী বলেছিলেন, "এই তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকেই জাতির ভবিষ্যৎ নেতারা উঠে আসবেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাদের নানারকমভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।" আজকের এই প্রযুক্তির যুগে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন অনলাইন আকর্ষণে প্রভাবিত হচ্ছেন। সামনাসামনি কথা বলার থেকেও তারা ভার্চুয়াল আলাপে বেশি মগ্ন। বিভিন্ন ভার্চুয়াল বিষয় তাদের অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। এর থেকে তাদের মনোযোগ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ফেরাতে হবে।

গঠনমূলক কর্মসূচি এবং অসহযোগ আন্দোলন

স্বরাজের ধারণার পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে গান্ধীজী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি অংশকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা যদি প্রকৃত অর্থে গঠনমূলক কর্মসূচি অনুসরণ করি, সেক্ষেত্রে অসহযোগের প্রয়োজনই পড়ে না বলে গান্ধীজী মনে করতেন। অসহযোগের ফলে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু গঠনমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ আমাদের হাতের মধ্যে। এই দু'টি বিষয় হাতে হাত মিলিয়ে একত্রেও চালানো যায়। অসহযোগ আন্দোলন মানুষের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদে সংগঠিত হবার চেতনা এনে দেয়। গঠনমূলক কর্মসূচি এর আঁতুড়ঘর হিসাবে কাজ করতে পারে।

উপসংহার

আধুনিক কালের বহু অহিংস আন্দোলনে গঠনমূলক কর্মসূচির প্রতি কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আন্দোলনকারীদের যাবতীয় মনযোগ কেন্দ্রীভূত থেকেছে অসহযোগিতা ও অবাধ্যতাতেই। কিন্তু আমরা যদি সমস্যাগুলি তুলে ধরে তার ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন না করতে পারি, তা হলে প্রতিরোধের সময়ে গণশক্তিকে জাগিয়ে তোলা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতে আজ যে স্বেচ্ছাসেবকমূলক ক্ষেত্র রয়েছে, তা গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচিরই অবদান। বহু অসরকারি সংগঠন নীরবে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির জীবনের মানোন্নয়নে কাজ করে চলেছে।❑

সমকালীন বিশ্বে স্বদেশির গুরুত্ব

নিমিষা শুক্লা

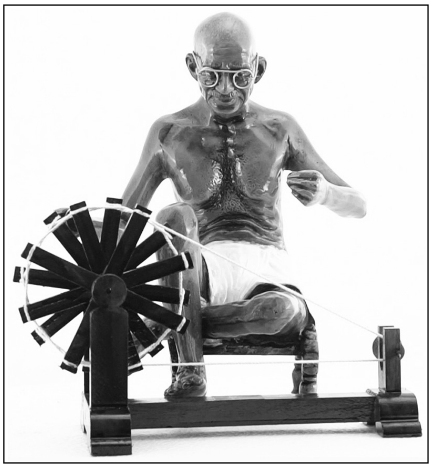

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থিত 'লাগামছাড়া বৃদ্ধি' (Endless growth)-এর বিরুদ্ধে এবং 'সীমাসম্বলিত বৃদ্ধির (Limits to Growth) পক্ষের স্বর ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে। 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' এবং 'অনিবার্যভাবে উপস্থিত' প্রযুক্তির লাগামছাড়া প্রয়োগ পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্বের সামনে ভয়ঙ্কর বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এনে হাজির করেছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমে ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে প্রভুত্ববাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ভয়াবহ আকার নিচ্ছে শরণার্থী সমস্যা; রাজনৈতিক বা পরিবেশগত, উভয় কারণেই। এই দুর্যোগের সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর 'স্বদেশি' ভাবনার মধ্যে হয়তো বা দিশা মিলতে পারে।

নিজেদের 'স্বদেশি' বলে পরিচয় দেওয়া এখন অনেকের কাছেই বেশ একটা কেতা বা ফ্যাশনের ব্যাপার। 'স্বদেশি' পণ্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করাটাও দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়ুর্বেদ বা সনাতন ভারতের নিজস্ব অনেক বিষয় বা রীতিনীতির নাম করে, মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে গান্ধীজীর নাম জুড়ে দিয়ে অনেককেই বেশ বোকা বানানো যায়। এই কাজে সামাজিক মাধ্যম বা বিজ্ঞাপনের সহায়তা তো মেলেই। অতি সম্প্রতি জাতি বা রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের কথাটাও শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে 'স্বদেশি' ধারণাটি বেশ মিলে যায়।

এই প্রেক্ষিতে 'স্বদেশি' সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা বুঝে নেওয়া দরকার।

উন্নয়নের সোপানে বিভিন্ন স্তরে থাকা পুঁজিবাদী দেশগুলি উদারীকরণ, বেসরকারী-করণ এবং বিশ্বায়ন (Liberalisation, Privatisation and Globalisation—LPG)-এর ফলে সংঘটিত শিল্পায়নের কতক সুফল ভোগ করছে। কতিপয় মানুষের হাতে অধিক অর্থের এই জমানায় ধনী ভারতীয় গোটা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন কিংবা চূড়ান্ত সম্পদে বলীয়ান মেক্সিকোর নাগরিক অলসমেদুর সময় কাটাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার সমুদ্রসৈকতে। সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাপনের মান বেড়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ধনীদের বাড়বাড়ন্ত তো চোখ ধাঁধানো। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ বাজার অর্থনীতির পক্ষে গুণগান করলেও, উন্নয়নের স্থায়ীত্ব নিয়ে সন্দিহান কিছু মানুষ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থিত 'লাগামছাড়া বৃদ্ধি' (Endless growth)-এর বিরুদ্ধে এবং 'সীমাসম্বলিত বৃদ্ধির (Limits to Growth)[১] পক্ষের স্বর ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে। 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' এবং 'অনিবার্যভাবে উপস্থিত' প্রযুক্তির লাগামছাড়া প্রয়োগ পৃথিবীর বুকে প্রাণের অস্তিত্বের সামনে ভয়ঙ্কর বিরাট প্রশ্নচিহ্ন এনে হাজির করেছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমে ক্ষমতা দখল করে নিচ্ছে প্রভুত্ববাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ভয়াবহ আকার নিচ্ছে শরণার্থী সমস্যা; রাজনৈতিক বা পরিবেশগত, উভয় কারণেই। এই দুর্যোগের সন্ধিক্ষণে গান্ধীজীর 'স্বদেশি' ভাবনার মধ্যে হয়তো বা দিশা মিলতে পারে।

ভারত এবং উন্নয়নশীল বেশিরভাগ দেশের সামনেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত নানা সমস্যা রয়েছে।

এগুলির বেশিরভাগই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত এবং সমস্যার সমাধানও আলাদা আলাদাভাবে সম্ভব নয়। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা অত্যন্ত গোলমেলে একটি বিষয়। শিল্পায়নের সময় থেকেই এই ক্ষেত্রটিতে প্রযুক্তিগত প্রশ্নে অগ্রবর্তী দেশগুলি প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। দু'-দুটো বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনৈতিক চালচিত্রটাই পালটে দিয়েছে বহুলাংশে। নতুন স্বাধীন দেশগুলির ওপর

[লেখক গ্রামীণ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ মহাদেব দেশাই মহাবিদ্যালয়-এর প্রধান। ই-মেল : nimisha63@gmail.com]

নিম্নমানের এবং দূষণ সৃষ্টিকারী প্রযুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি জ্বলন্ত সমস্যা। সুস্থায়ী উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহ (SDG) নিয়ে যত মাতামাতিই হোক না কেন, পরিবেশগত অবক্ষয় যে মানুষের অস্তিত্বের সাপেক্ষে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গান্ধী এবং স্বদেশি

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং নিবিড় চিন্তনের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল 'স্বদেশি' সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা। ইংল্যান্ডে অল্পবয়সি শিক্ষার্থী এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত আইনবিদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যন্ত্রসভ্যতার চরম নেতিবাচক প্রভাব। রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রসঙ্গে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনা ও মতামত সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে ১৯০৯-এ প্রকাশিত হয় 'হিন্দ স্বরাজ'-এ। আধুনিক সভ্যতার যুক্তিপূর্ণ ও সুচিন্তিত সমালোচনা রয়েছে সেখানে। ব্রিটিশদের শোষণমূলক রীতিনীতি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকল তাঁর চোখের সামনে। নওরোজির সঙ্গে আলাপচারিতায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত-এর লেখা পড়ে হিন্দুত্ববাদ-এর ধারণায় পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তিনি। পশ্চিমি সভ্যতার বিকল্প নিদর্শ হিসেবে গড়ে তুললেন 'টলস্টয় ফার্ম' এবং 'ফিনিক্স আশ্রম'। ভারতে ফিরে প্রথমে কোচরাব এবং পরে সবরমতী-তে 'সত্যাগ্রহ' আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন গান্ধীজী। 'স্বরাজ' বা স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা হিসেবে স্বনির্ভরতা এবং 'স্বদেশি'-র ধারণা ক্রমে আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হতে থাকে তাঁর মনে। 'স্বদেশি' শব্দটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯০৫-এ। শেষবার ১৯৪৭-এ।

Indian Opinion-এ গান্ধীজী লিখেছেন, বাঙলা এবার সত্যিই জেগে উঠেছে মনে হয়...শুধুমাত্র স্বদেশি পণ্য কেনা এবং ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে দ্রুতহারে।[২]

পূর্ববর্তী কোনও বছরের খতিয়ান পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, স্বদেশি শব্দটির ব্যাপক এবং গভীরতর ব্যঞ্জনা রয়েছে। নিজের দেশে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারমাত্রই স্বদেশি নয়।...তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কিছু। 'স্বদেশি'-র অর্থ হল আমাদের নিজের শক্তির বিষয়ে আস্থাশীল হওয়া। 'আমাদের শক্তি' বলতে বোঝায় আমাদের শরীর, আমাদের মন এবং আমাদের আত্মার শক্তি।...মানবাত্মা সকলের ওপরে এবং সেজন্যই আত্মার শক্তি হল সেই ভিত্তি যার ওপর মানুষ কোনও কিছু নির্মাণ করে।[৩]

ভারতের অর্থনৈতিক উত্তরণ-এর চাবিকাঠি বলে 'স্বদেশি'-কেই চিহ্নিত করেছেন মহাত্মা—স্বদেশির শপথ চরকায় প্রস্তুত সুতোয় বোনা হাতে তৈরি বস্ত্র ব্যবহারের কথা বলে।...শুধুমাত্র বস্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়। অন্য বিষয়গুলিতেও যতটা সম্ভব তাই হওয়া উচিত।...স্বদেশি মন্ত্র যখন লক্ষ লক্ষ কর্ণে প্রবেশ করবে, তখনই এদেশের মানুষ হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন অর্থনৈতিক পরিত্রাণ ও উত্তরণের চাবিকাঠি।...ইংরেজের অর্থনীতির অনুকরণ আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।[৪]

'স্বদেশি'-কে সব পন্থার সেরা পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন গান্ধীজী। লিখেছেন, চূড়ান্ত এবং আধ্যাত্মিক বিচারে, স্বদেশি হল পৃথিবীর বন্ধন থেকে মানবাত্মার মুক্তির উপায়। এই ব্রতের অনুসারীর সর্বপ্রথম কর্তব্য হল নিকটতম প্রতিবেশীদের সেবার নিয়োজিত হওয়া। মনে হতেই পারে এক্ষেত্রে বাকিদের কথা ভাবা হচ্ছে না। তা কিন্তু নিতান্তই আপাতভাবে। প্রতিবেশীদের সেবা করা প্রকৃতিগতভাবে কখনওই দূরবর্তীদের অবহেলা করা নয়।...বরং, প্রথমেই সুদূরের কথা ভেবে সেবা করার জন্য দুনিয়ার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে কোনও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।...সার অর্থে স্বদেশি হল বিশ্বজনীন সেবা ধর্মের সর্বোত্তম উপলব্ধি। স্বদেশি ব্রতে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীর বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে প্রতিবেশীদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন। যতদূর সম্ভব অগ্রাধিকার দিতে হবে স্থানীয় পণ্যের ওপর।...কিন্তু যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করলে যেকোনও বিষয়ের মতো 'স্বদেশি'-ও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র 'বিদেশি' বলেই অন্য দেশের পণ্য বর্জন অর্থহীন। জাতির সময় এবং অর্থের অপচয় ঘটিয়ে নিজের দেশের সঙ্গে খাপ খায় না এবং পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণের প্রয়াস অমার্জনীয় ভ্রান্তি। তা আসলে 'স্বদেশি' ধারণাকে অস্বীকার করে।[৬]

'স্বদেশি'-র ধারণা থেকে 'আদর্শ' গ্রাম। ১৯৪৬ সালের ২৮ জুলাই এক সাক্ষাতকারে গান্ধীজী বলেছেন, প্রতিটি গ্রাম এক একটি সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠুক। পঞ্চায়েতের হাতে থাকুক পূর্ণ ক্ষমতা। কাজেই প্রতিটি গ্রামকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্বাহী হয়ে উঠতে হবে। একক (Unit) হলেন ব্যক্তিমানুষ। প্রতিবেশীদের ওপর কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা এবং বাইরে থেকে সহায়তার প্রসঙ্গ বাদ পড়ছে না। যা হবে তা হল ঐচ্ছিক এবং মুক্ত ভিত্তিতে পারস্পরিক আদানপ্রদান।

ডান্ডি অভিযান (১৯৩০)

আসামে একটি রেশম বুনন কেন্দ্রে

প্রতিটি মানুষ জানবেন তিনি কী চান। সমপরিমাণ শ্রমের মাধ্যমে অন্যরা যা লাভ করতে পারে না তা চাওয়া যায় না, জানবেন এটাও। অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গঠিত এই কাঠামোয় ক্রমপ্রসারমান, আরোহণবর্জিত (never-ascending) বৃত্তসমূহ তৈরি হবে। নিম্নের মস্তকে উচ্চের অবস্থান, এমন পিরামিডের মতো কাঠামো হবে না তা। হবে সামুদ্রিক বৃত্তের মতো, যার কেন্দ্রে থাকবেন গ্রামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিমানুষ। গ্রাম নিবেদিতপ্রাণ থাকবে গ্রামপুঞ্জ বা গ্রামবৃত্তের জন্য। শেষমেশ সমগ্র কাঠামোটি হয়ে উঠবে ব্যক্তিমানুষের মহামিলনতীর্থ। এই ব্যক্তিমানুষ হবেন না উদ্ধত। হবেন বিনীত এবং রাজকীয় জনসমুদ্রবৃত্তের গৌরবের অংশীদার।

দিল্লিতে ১৯৪৭-এর ২০ জুন এক প্রার্থনাসভায় মহাত্মা বলেছেন, আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আজ আমরা 'স্বদেশি' ভুলে গেছি। শুরু থেকেই আমি বলে আসছি যে বিদেশি কেতাকানুন নকল করলে স্বরাজ নিয়ে কথাবার্তা অর্থহীন। যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক, যা আমাদের উপবাসী রাখে, তা স্বদেশি নয়...

'স্বদেশি' একটি বিশ্বজনীন (Universal) বিষয় বলে মনে করতেন কৃপালনী। সম্পূর্ণভাবে বাজার অর্থনীতির দেশগুলিতেও 'স্বদেশি'-র অলিখিত নিয়ম কাজ করে বলে তাঁর ধারণা। পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের কোনওটিই সামাজিক ন্যায়, আর্থিক সমতা এবং জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্য যুগপৎ অর্জন করতে পারে না। অন্যদিকে, গান্ধীজী নবীন গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর আধারিত, অর্থনৈতিক সমতায় প্রয়াসী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা পথ চলে বিকেন্দ্রিকতার হাত ধরে।

গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ জে. সি. কুমারাপ্পার মতে, কুটির শিল্প কেবলমাত্র একটি উৎপাদন প্রণালী নয়; এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতীক এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মূল্য এবং মূল্যায়ন (Valuation), এই দু'টি বিষয় অগ্রগতির রথচালক বলে তিনি মনে করেন। আমাদের মূল্য নির্ধারণের মাপক যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে তাঁর অভিমত। এক্ষেত্রে আমাদের দূরদর্শিতা এবং যুক্তিনিষ্ঠার অভাব রয়েছে এবং আমাদের প্রতিবেশে উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃত মূল্য টাকার অঙ্কে প্রতিভাত হয় না বলে তাঁর ধারণা।

গান্ধী দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ মহাত্মার অনুগামী নরহরি পারিখ তাঁর 'মানব অর্থশাস্ত্র' বইয়ে বলেছেন একথা। এই ব্যবস্থায় কৃষি হল প্রধান জীবিকা এবং তার সহযোগী হল গ্রামীণ শিল্প। ঘড়ি কিংবা ফাউন্টেনপেন, অথবা আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে সেলফোন বা মোটর বাইক থাকলেই কেউ উন্নত জীবনযাপন করছেন এমনটা মোটেও নয়। মহাত্মার চিন্তন প্রণালীতে দরিদ্রের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মজার কথা হল এই যে, মহাত্মা গান্ধী বা তাঁর অনুসারীরা 'স্বদেশি' বলে কোনও মার্কা বা ব্র্যান্ডের কথা কখনও বলেননি। স্বদেশির মূল কথা হল স্বচালিত স্থানীয় উৎপাদন প্রণালীর মাধ্যমে, প্রয়োজনে প্রযুক্তির ব্যবহার করে তৃণমূল স্তর থেকে উন্নয়ন। ন্যূনতম চাহিদা মেটানোয় স্থানীয় পণ্যের ব্যবহার এবং স্বনির্ভরতার বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক।

আজকের দিনে স্বদেশি

গান্ধীজীর 'স্বদেশি' সমকালীনের সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর হতে পারে কি? এই প্রশ্নের সময় এসে গিয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। 'স্বদেশি' একটি মনোগত অবস্থান। তা এখন হয়ে গেছে অর্থনৈতিক দুনিয়ার বাইরের বিষয় (non-economic postulate)। মজার কথা হল, প্রযুক্তি সম্পর্কেও কিছু ক্ষেত্রে একই কথা খাটে এবং আধুনিক অর্থনীতি বাইরের কোনও বিষয়কে স্বীকার করে না। বস্তুগত সমৃদ্ধিই বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থপনার একমাত্র

লক্ষ্য। বিশ্বায়ন বলতে এখন বোঝাচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ও বিনিয়োগ। এক্ষেত্রে কোনও জটিলতা বা সমস্যা দেখা দিলে তার মোকাবিলা করা প্রযুক্তির কাজ। উৎপাদন এবং ভোগ-এর ক্ষেত্রে পরিবেশগত নীতি-র জায়গা নেই কোনও। অন্যদিকে, গান্ধীজীর 'ঐচ্ছিক দারিদ্র্য'-এর ধারণায় বিত্তবানরা সমাজের অভিভাবকের মতো মনোভাব নিয়ে 'ভোগ'-এর ক্ষেত্রে সংযমী হবেন। গান্ধীবাদী চিন্তাবিদ রাভাল এই বিষয়টিকে বলেছেন 'গান্ধী প্রভাব' বা 'Gandhi Effect'।

গ্রামের স্বনির্ভরতা স্থানীয় উৎপাদনের সুযোগ বৃদ্ধি করে বলে গান্ধীজী মনে করতেন। প্রতিটি মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা জীবন কাজ করে গেছেন মহাত্মা। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল মানবিকতার ছোঁয়া। বলেছেন, 'কায়িক শ্রম'-এর কথা। স্বনির্ভরতা বলতে তাঁর বক্তব্য ছিল এই, যে মানুষ নিজের শ্রম দিয়ে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যক পণ্য উৎপাদন করবেন এবং এই পণ্য বিনিময়যোগ্য হবে। অর্থনীতিবিদ শ্যুমেখার বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। বৃহৎ বা বিপুল উৎপাদনের বদলে জনমানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনের পক্ষে বলে গেছেন জাতির জনক। বিপুল উৎপাদন প্রক্রিয়া (mass production) স্বভাবগতভাবে হিংসাশ্রয়ী, পরিবেশের প্রশ্নে হানিকর, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারে অনীহ এবং ব্যক্তিমানুষের যথার্থ বিকাশের পক্ষে হানিকর বলে তিনি মনে করতেন।

গান্ধীজীর কাছে স্থানীয় চাহিদাই হল যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি। চাহিদার নিয়ন্ত্রণ উৎপাদককে সঙ্কেত দেবে। আবার উপভোক্তাকে দিশা দেখাবে উৎপাদন ব্যবস্থা। তৃতীয় তরঙ্গ বা (Third Wave)-এর প্রসঙ্গে 'উৎপাদক-উপভোক্তা' বা 'Prosumer' শব্দটির উল্লেখ করেছেন অ্যালভিন টফলার। একাধারে উপভোক্তা এবং উৎপাদক হলেন এই Prosumer। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পণ্যসমূহ উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও উপায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বলেছিলেন গান্ধীজী। বাণিজ্য অবাধই শুধু নয়, ন্যায্য (Fair) হোক, এমনটা বলতেন তিনি। এই 'ন্যায্য' বা ন্যায়-এর সঙ্গে সমতার ধারণাটি তাঁর দর্শনে সম্পৃক্ত। 'স্বদেশি'-কে মূলমন্ত্র করে পরিবর্ত এক মানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্বেষণ করে গেছেন মহাত্মা। মানুষের নৈতিক উত্তরণ, সংযম এবং বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থাসম্বলিত অর্থনীতি এবং ব্যক্তিমানুষের সমমর্যাদা ছিল তাঁর স্বপ্ন। ভারতীয় মানস কি এই পথের পথিক হওয়ার চেষ্টাটুকুও অন্তত করতে পারে না?❑

তথ্যপঞ্জি :

(১) In 1972, the MIT had published a report named Limits to Growth that put the issue of natural resource deplition on global platform.
(২) Collected Works of Mahatma Gandhi. Volume 05. page 114. Indian Opinion, 28 October, 1905
(৩) Collected Works of Mahatma Gandhi. Volume 09. Page 118. Indian Opinion 2nd January, 1909
(৪) Collected Works of Mahatma Gandhi. Volume 15. Pages 198-199. Bombay Chronicle. 18th April, 1919 and New India. 22nd April, 1919.
(৫) Collected Works of Mahatma Gandhi. Volume 16. Page 134. Young India. 17th September, 1919
(৬) Collected Works of Mahatma Gandhi. Volume 46. Page 254-256. Originally in Navjeevan. 31st May, 1931. English translation by Pyarelal.

সহায়ক সূত্র :

- Achrya Kripalani. 1987 *Gandhivicharvimarsh* (in Gujarati), Shravan Trust.
- Government of India, 2000. *Collected Works of Mahatma Gandhi* Volume 1 and 4th (Revised Edition). Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi.
- Iyengar Sudarshan. 2005. Gandhi's Economic Thought and Modern Economic Development: Some Reflections. Working Paper No.1. Centre for Social Studies, Surat.
- Parikh Narahari. 2004. *SankshiptManav Arthashastra* (in Gujarati). Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad.
- Raval M.N. 1971. 'Contentment and Containment of Wants – A suggested Interpretation', in Raval M.N. et.al. (editors) *Gandhiji's Economic Thought and Its Relevance at Present.* South Gujarat University, Surat.
- Schumacher E.F. 1973. *Small is Beautiful*. Harper and Row Publishers, New York.
- Toffler Alvin. 1981. *The Third Wave.* Viking Press, New York.
- Kumarappa J.C. 1958. *Economics of Permanence*. Akhil Bharatiya Sarva Seva Sangh Publication.
- Iyer Raghavan. 2003. *The Essential Writings of Mahatma Gandhi*. Oxford University Press.

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

সুস্থসবল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অনাময়

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন জোগাতে

বিনয় কুমার সাক্সেনা

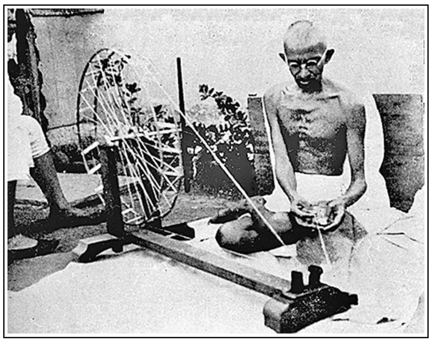

গান্ধীজী যখন বলতেন, "খাদি ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেয় এবং আপনার পোশাক আপনার গর্ব ও মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে", তখন তার ব্যাপকতর এক অর্থ উঠে আসে। গান্ধীজী সবসময়ে বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মানুষের এই গভীর দারিদ্র্যের কারণ হল অর্থনৈতিক ও শিল্পজগত থেকে স্বদেশির বিদায়। তাঁর মনে হয়েছিল অন্য যেকোনও ভালো ভাবনার মতোই স্বদেশিও অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। একে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল একে আইকন করে তোলা। আর এখানেই খাদির প্রাসঙ্গিকতা।

গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে গান্ধীজী ১৯১৮ সাল থেকে খাদি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বয়নের এক কুটির শিল্পকে তিনি উত্তীর্ণ করেছিলেন আত্মনির্ভরতা ও স্বশাসনের প্রতীকে। মহাত্মার আহ্বান মতো প্রতিটি গ্রামে সুতোর কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য বীজ বপন ও চাষবাস শুরু হয়। নিজেদের ব্যবহারের বস্ত্র উৎপাদনে মহিলারা সুতো কাটা এবং পুরুষেরা বয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

খাদির জন্য যেহেতু কোনও মূলধনের প্রয়োজন হয় না, তাই গান্ধীজী এটিকে বিদেশি শাসনের প্রতীক বিদেশি দ্রব্যসামগ্রীর ওপর নির্ভরতা অবসানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেন। তিনি এও বুঝেছিলেন, যে দেশে কায়িক শ্রমকে অসম্মানের চোখে দেখা হয়, সেখানে খাদি উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ধনী ও দরিদ্রকে সমপরিসরে আনতে পারে। গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের থেকেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বেশি।

গান্ধীজী যখন বলতেন, "খাদি ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেয় এবং আপনার পোশাক আপনার গর্ব ও মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে", তখন তার ব্যাপকতর এক অর্থ উঠে আসে। গান্ধীজীর কাছে খাদি ছিল স্বদেশির প্রতীক। সাধারণ মানুষের কাছে খাদি হয়ে উঠল এমন এক শক্তির প্রতীক, যা তাদের সুদূরের ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করে কাছের জিনিসের ব্যবহার শেখাল।

গান্ধীজী সবসময়ে বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মানুষের এই গভীর দারিদ্র্যের কারণ হল অর্থনৈতিক ও শিল্পজগত থেকে স্বদেশির বিদায়। তাঁর মনে হয়েছিল অন্য যেকোনও ভালো ভাবনার মতোই স্বদেশিও অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। একে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল একে আইকন করে তোলা। আর এখানেই খাদির প্রাসঙ্গিকতা। স্বার্থহীন সেবার নীতি মেনে এর শিকড় প্রোথিত শুদ্ধতম অহিংসায়, যা জাতিকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।

কোনও দেশ যখন তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী নিজস্ব সম্পদ থেকেই উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তখন তাকে স্বদেশি বলে। প্রতিটি গ্রাম/অঞ্চল স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে নিজের সব প্রয়োজন মেটায়। গান্ধীজী বলতেন, যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, স্বদেশি ধর্ম অনুযায়ী ভারতের সব বিদেশি দ্রব্য বয়কট করা উচিত। স্বদেশির অর্থ হল, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, হস্তশিল্প, সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় স্তরে উৎপাদিত দ্রব্যই গ্রামের মানুষ ব্যবহার করবেন।

স্বদেশীয় ভাবনাকে লালন করতে হলে প্রত্যেককে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে একযোগে কাজ ও ব্যবসা করতে হবে। যেসব দ্রব্য আমরা দেশেই উৎপাদন করতে পারি, সেগুলি বিদেশ থেকে আমদানি করব না। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বদেশি হল

[লেখক চেয়ারম্যান, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, নয়াদিল্লি। ই-মেল : chairmankvic2015@gmail.com]

প্রতিবেশীসুলভ আত্মীয়তা। তবে বর্তমানে আমাদের অর্থনীতির ওপর আমদানির গভীর প্রভাব রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতের ধূপকাঠি উৎপাদন শিল্পের উদাহরণ দেওয়া যায়। স্মরণাতীত কাল ধরে এটি ভারতের প্রধান গ্রামীণ শিল্পগুলির অন্যতম। কিন্তু যবে থেকে ধূপকাঠির কাঁচামাল, বাঁশের গোলাকার কাঠি এবং সুগন্ধী আমদানির নিয়মকানুন শিথিল করা হয়েছে, এই শিল্প ধুঁকছে। খাদির ধূপকাঠি উৎপাদন কেন্দ্রগুলিরও নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তবে চলতি বছরের ২৯ আগস্ট এই উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রিত আমদানির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। ধূপকাঠি শিল্পের আমদানি-নির্ভরতা কমানো এবং স্থানীয় স্তরে বিপুল কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, দেশজুড়ে বাঁশ গাছ বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এই দু'টি লক্ষ্যই গান্ধীবাদী দর্শনে স্বরাজ ও স্বদেশির প্রধান উদ্দেশ্য।

খাদি এবং স্বদেশি বরাবর ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছে। গত পাঁচ দশক ধরে বিশ্বজুড়ে এই ফারাক ক্রমশই বাড়ছে। এই পাঁচ দশকে ধনীদের আয় বেড়েছে ৭ গুণ।

স্টিফেন গ্র্যাফডির মতে, বিশ্বায়নের সবথেকে বড়ো বিপদ হল, রাষ্ট্র অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, মুনাফা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কোম্পানিগুলির স্থানীয় স্তরে কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না। আমাদের ভুললে চলবে না, ভারতের ৪৩ শতাংশ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্র এবং মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, চর্মশিল্প, হস্তশিল্পের মতো ছোটো ছোটো ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল।

২০১৪-'১৫ সালে দেশে মোট খাদি উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ছিল ৮৭৯ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। ১০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে ২০১৮-'১৯ সালে তা হয়েছে ১৯০২ কোটি টাকা। একইভাবে ২০১৪-'১৫ সালে খাদি পণ্য বিক্রির পরিমাণ ছিল ১,৩১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, যা ২০১৮-'১৯ সালে ১৪৫ শতাংশেরও বেশি বেড়ে হয়েছে ৩,২১৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। খাদি ও

গ্রামীণ শিল্পের মোট বেচাকেনা বা টার্নওভারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪,৩২৩ কোটি টাকা।

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ শিল্পের টার্নওভার ২০১৪-'১৫ সালে ছিল ৩১,৯৬৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ১২৩ শতাংশ বেড়ে ২০১৮-'১৯ সালে তা হয়েছে ৭১,১২৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। গত পাঁচ বছরে খাদির পোশাক উৎপাদন গড়ে ৬২ শতাংশ করে বেড়েছে; ২০১৪-'১৫ সালে খাদি কাপড় উৎপাদন ছিল ১০ কোটি ৩২ লক্ষ ২০ হাজার বর্গমিটার। ২০১৮-'১৯ সালে তা হয়েছে ১৭ কোটি ৮ লক্ষ বর্গমিটার। ২০১৪-'১৫ সালে বস্ত্রবয়ন শিল্পে খাদির অংশভাক ছিল ৪.২৩ শতাংশ। ২০১৮-'১৯ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৮.৪৯ শতাংশ। গান্ধীজীর স্বদেশি নীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়তো এই বিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে।

প্রধানমন্ত্রী খাদিকে অর্থনৈতিক রূপান্তরের হাতিয়ার করে তোলার ডাক দেবার পর থেকে গত পাঁচ বছরে শিল্পীকেন্দ্রিক বহু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন ৩২ হাজারেরও বেশি নতুন মডেলের চরকা এবং ৫,৬০০ তাঁত বণ্টন করেছে, যার জেরে খাদির উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ৪০০-র কাছাকাছি নতুন খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪০ হাজারেরও বেশি খাদি কারিগর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। লেহ, লাদাখ, কাজিরাঙ্গা জঙ্গল, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত এলাকাতেও খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, খাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এই প্রথম বস্ত্রবয়ন শিল্পের বড়ো কর্পোরেটগুলিও খাদির বিপণনে এগিয়ে এসেছে, যা খাদির বিক্রি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের উদ্যোগে বড়ো বড়ো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি তাদের কর্মীদের জন্য খাদির উপহার কুপন কিনেছে, যার থেকে খাদির ১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছে। ই-ওয়ালেট ও Shop'nShop-এর মাধ্যমে ই-বিপণন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পুরসভাগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে খাদির ইউনিফর্ম এবং খাদির সমাবর্তন পোশাক ব্যবহার করতে। এই সবকিছুর ফলে খাদি আরও বেশি করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে পারছে এবং ক্রেতাবান্ধব হয়ে উঠছে। মহিলাদের জন্য পশ্চিমি ধাঁচের পোশাক, জ্যাকেট, কুর্তা এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী উৎপাদন ও উচ্চ গুণমানের সেলাইয়ের দৌলতে খাদির ভাবমূর্তিটাই বদলে গেছে।

দরিদ্রতম ও প্রান্তিকতম মানুষটির অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ, গান্ধীজীর স্বদেশি ভাবনার অন্যতম মূল নীতি ছিল। সেই লক্ষ্যে মধু মিশন, কুম্ভোকার সশক্তিকরণ যোজনা, চর্মশিল্পী উন্নয়ন প্রকল্পের মতো বহু প্রয়াস হাতে নেওয়া হয়েছে; যার থেকে কৃষক, আদিবাসী, তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, মৃৎশিল্পী, চর্মকারদের মতো প্রান্তিক মানুষজন উপকৃত হচ্ছেন। মধু মিশনের আওতায় রেকর্ড সংখ্যক ১ লক্ষ

১৫ হাজার মৌমাছি সংরক্ষণ বাক্স বিলি করা হয়েছে। কৃষক, আদিবাসী এবং বেকার যুব সম্প্রদায় এর সিংহভাগ পেয়েছেন এবং ১২ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। বিপথগামী যুবক ও হতাশ কৃষকদের উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়ায় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় একদিনে ২,৩০০ মৌমাছি সংরক্ষণ বাক্স বিলি করেছে, যা এক বিশ্বরেকর্ড। একইভাবে কুম্ভোকার সশক্তিকরণ যোজনায় দেশজুড়ে ১০ হাজার বৈদ্যুতিক কুমোর চাকা ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিলি করা হয়েছে। এর জেরে ৪০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কুমোরদের দৈনিক আয় ১৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০০ টাকায় পৌঁছে গেছে। মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, প্রান্তিক কুমোরদের মধ্যে আরও ৩০ হাজার বৈদ্যুতিক কুমোর চাকা বিলি করতে চলেছে। এর ফলে মাটির ভাঁড় ও অন্যান্য টেরাকোটা সামগ্রীর উৎপাদন দৈনিক অন্তত ২ কোটি করে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতীয় রেল সম্প্রতি দেশের ৪০০-টি বড়ো স্টেশনে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পরিবেশনের জন্য কেবলমাত্র পোড়ামাটির পাত্র সামগ্রী ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। এই বর্ধিত উৎপাদন রেলের চাহিদা পূরণে কাজে লাগবে।

প্রান্তিক মানুষজন বরাবরই গান্ধীজীর হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিলেন, যাদের তিনি বলতেন হরিজন, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। গান্ধীজীর নীতির অনুসারী হয়ে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন সম্প্রতি চর্মকারদের মধ্যে অন্ত্যজ এই শ্রেণির উন্নয়নে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রখর রোদ ও কনকনে ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে ফুটপাথে বসে যারা জুতো পালিশ ও মেরামত করেন, সামাজিক মর্যাদা দিতে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন তাদের চর্ম চিকিৎসক নামে অভিহিত করে তাদের মধ্যে ৭০ হাজার আধুনিক সরঞ্জাম বিলি এবং তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

স্বদেশির গৌরবজনক স্মৃতি রোমন্থনে সাম্প্রতিক অতীতে বেশকিছু উদ্ভাবনী প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। চরকা ও গান্ধীবাদী দর্শনের অভিজ্ঞান হিসাবে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালে বিশ্বের বৃহত্তম কাঠের চরকা বসানো হয়েছে। কনট প্লেসে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, বিশালাকার ইস্পাতের চরকা বসিয়েছে। এটি এখন কনট প্লেসের মুখ্য আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। একইরকম ইস্পাতের চরকা বসানো হয়েছে আমেদাবাদের সবরমতী এবং বিহারের চম্পারণে।

গান্ধীজী পরিচ্ছন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই প্রথম বর্জ্য প্লাস্টিক মিশ্রিত হাতে তৈরি কাগজের ক্যারিব্যাগ তৈরি করা হয়েছে। নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং প্রকৃতিকে প্লাস্টিক মুক্ত করার কাজে এই উদ্যোগ সহায়ক হবে।

স্বদেশি নিয়ে গান্ধীজীর ভাবনায় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বারবার বলা হয়েছে। সজনে চাষ উদ্যোগে চলতি বছরে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন ৪৬,৫০০ সজনে চারা লাগিয়েছে। এগুলি কৃষকদের উপকারের পাশাপাশি মধু মিশনের কাজেও বিশেষ সহায়ক হবে।

অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজকল্যাণের মধ্যে চলে আসা দ্বন্দ্বটা এবার মিটিয়ে ফেলার সময় এসেছে। আমাদের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে মহাত্মার স্বদেশির নীতি-অনুসারী করে তোলা উচিত। এতে বঞ্চিত অবহেলিত শ্রেণির মানুষজন, কৃষক সম্প্রদায় ও মহিলা শ্রমিকরা অর্থনৈতিক সুস্থিতির সন্ধান পাবেন।

সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে সান্তু নিরাময়া! (সবাই সুখে থাকুক, সবাই রোগমুক্ত জীবনযাপন করুক!)❑

গঠনমূলক কর্মসূচি : নারীসমাজের ভূমিকা

অপর্ণা বসু

১৯৪৬ সালে বিহারে মৃদুলা সারাভাইয়ের সঙ্গে গান্ধীজী

ব্রিটিশ সরকারকে হঠিয়ে রাজনৈতিক মুক্তিলাভ ছিল মহাত্মার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজের শর্ত হিসেবে গঠনমূলক কর্মসূচির আবশ্যিকতার উল্লেখ তিনি বার বার করেছেন। গঠনমূলক প্রয়াসে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাইতেন জাতির জনক। এক্ষেত্রে যে ধরনের সহনশীলতা, ত্যাগ, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য আবশ্যিক, তা নারীদেরই রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন।

গান্ধীজীর অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠনাত্মক প্রয়াস। ব্রিটিশ সরকারকে হঠিয়ে রাজনৈতিক মুক্তিলাভ ছিল মহাত্মার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম; কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজের শর্ত হিসেবে গঠনমূলক কর্মসূচির আবশ্যিকতার উল্লেখ তিনি বার বার করেছেন। তাঁর পথ ছিল হিংসাবর্জিত। লক্ষ্য ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রান্তিকতম মানুষটিরও সর্বাত্মক মুক্তি ও স্বাধীনতা।

গঠনমূলক প্রয়াসে নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাইতেন জাতির জনক। এক্ষেত্রে যে ধরনের সহনশীলতা, ত্যাগ, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য আবশ্যিক, তা নারীদেরই রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন।

জাতির জনকের গঠনাত্মক কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ছিল 'খাদি'-র। চরকা কাটা এবং খদ্দর ব্যবহার করা ছিল স্বনির্ভরতা ও দেশাত্মবোধের প্রতীক। মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের নেতিবাচক প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন মহাত্মা। ভারতের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন মহিলারা। এই পরিস্থিতির মোকাবিলাতেই খাদি আন্দোলনের সূচনা করেন গান্ধীজী। ফলে অর্ধ উপবাসে থাকা ভারতের নারীদের কাজ ও আয়ের উৎস গড়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেছিলেন।

খাদি আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পুরুষদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে স্বদেশি আন্দোলন সফল করে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা সমতুল্য। খাদি কর্মসূচি নারীদের নেতৃত্বে চালিত হওয়ায় অনেক লক্ষ্য একইসঙ্গে অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। মহিলাদের ন্যূনতম আয়ের সংস্থানের পাশাপাশি তাদের পর্দার আড়াল থেকে বাইরে এনে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শামিল করেছিল এই কার্যক্রম। এক্ষেত্রে উৎপাদক এবং গ্রাহক, উভয় ভূমিকাতেই মহিলাদের দেখতে চেয়েছিলেন মহাত্মা।

রাজনৈতিক সংগ্রামে মহিলাদের শামিল করে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল 'খাদি'। অনেকে চরকায় সুতো কেটেছেন, অনেকে আবার বিদেশি পণ্য বিক্রি করে যেসব দোকান সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সরকারি চাকরির পথে না হেঁটে স্বাধীন ব্যবসা করতে, বিশেষত স্বদেশি পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি করতে নিজের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মায়েরা। জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হয়েছে 'মহিলা শিল্পমেলা'। দেশের কুটির শিল্পকে চাঙ্গা করতে এই সব মেলায় বিক্রি করা হ'ত মহিলাদের হাতে তৈরি শিল্পসামগ্রী। প্রচুর পরিমাণে বিকোত খাদিবস্ত্র। নিজেদের 'ধর্ম' পালন এবং অভাব মেটানোর জন্য মহিলারা নিজের স্বামীর কাছে চরকা কিনে দেওয়ার

[প্রয়াত লেখক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং নয়াদিল্লিস্থিত 'জাতীয় গান্ধী মিউজিয়াম'-এর প্রাক্তন চেয়ারপার্সন।]

কস্তুরবা (১৯১৫ সালে)

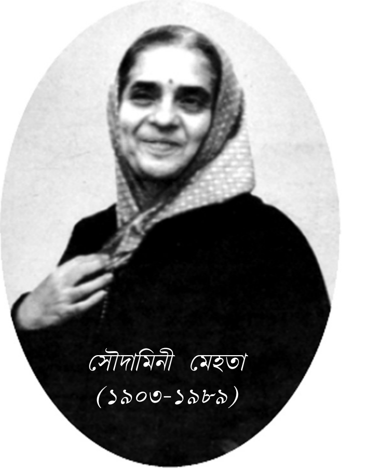

সৌদামিনী মেহতা
(১৯০৩-১৯৮৯)

রাজকুমারী অমৃত কৌর

অনুরোধ রাখছেন—এমন কথা খুঁজে পাওয়া যায় বহু দেশাত্মবোধক গানে।

সরলাদেবী চৌধুরানী হলেন প্রথম মহিলা যিনি খদ্দর পরে জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। লাহোরে ওই জনসভার পর বহু মহিলা তার উদাহরণ অনুসরণ করেন। খাদি এবং চরকা-কে জনপ্রিয় করতে সরলাদেবী উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সভা করেছেন। লাহোরে চরকায় সুতো তৈরির কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। নিজে চরকা কাটতে কাটতে গান গাইতেন সরলা। এই গানে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে উদ্বুদ্ধ করতেন ভারতের নারীদের।

ওড়িশায় খাদি আন্দোলন-এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সুভদ্রা মহতাব। তৈরি করেছিলেন 'কর্ম মন্দির'। প্রদেশের নানা প্রান্তে বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন 'খাদি' এবং 'স্বদেশি'-র তাৎপর্য। সঙ্গে ছিলেন রমাদেবী চৌধুরী আর আরও অনেকে। পাঞ্জাবে চরকায় সুতো তৈরিতে যুক্তদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। মুম্বই-এর (তৎকালীন বম্বে) ভিলে পার্লে-তে 'খাদি মন্দির' তৈরি করেছিলেন মণিবেন নানাবতী এবং তার সঙ্গিনীরা। তারা গাইতেন 'চরকা চালিয়ে চালিয়ে জিতে নেব স্বরাজ'। 'মণিবেন'-কে মানুষ খাদিবেন বলে ডাকতেন। বিহারে 'খাদি'-র প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাঈ আম্মান (Bi Amman)। এই প্রদেশের পাটনায় 'মহিলা চরকা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রভাবতী দেবী।

স্বদেশি, চরকা এবং খাদির প্রচারে নিয়োজিত ছিল মহিলাদের পত্রিকা 'গৃহলক্ষ্মী' এবং 'স্ত্রীধর্ম'।

'খাদি' এবং 'স্বদেশি'-র পাশাপাশি জাতির জনকের গঠনাত্মক কর্মসূচির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এই প্রথাকে 'সামাজিক অভিশাপ' এবং 'হিন্দুত্ববাদের কলঙ্ক' বলে অভিহিত করেছেন মহাত্মা।

হরিজনদের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন রামেশ্বরী নেহরু। ১৯৩৪ সনে নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘের সহ-সভাপতি হন তিনি। দেবালয়ে হরিজনদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে মাদ্রাজ-এর আইনসভায় 'Temple Entry Bill' নিয়ে উদ্যোগী ছিলেন তিনি। রামেশ্বরী নেহরুকে হরিজন সেবক সংঘে গান্ধীজীর 'ডান হাত' বলে বর্ণনা করেছেন Margaret Cousins।

ওড়িশায় হরিজন শিশুদের আবাসিক 'সেবানগর' আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন রমাদেবী চৌধুরী এবং তার স্বামী। সেখানে গঠনাত্মক কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত। 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী পর্ষদ' বা Anti Untouchability Board-এর সহায়তায় হরিজন পরিবারের মেয়েদের পড়ানোর কাজে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন রমাদেবী। বালেশ্বরে হরিজন পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয় এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোকিলাদেবী।

নীল চাষিদের পাশে দাঁড়াতে ১৯১৭ সনে বিহারের চম্পারণে আসেন গান্ধীজী। দলে দলে মহিলারা যোগ দেন তাঁর সঙ্গে। পর্দার বাইরে মেয়েদের বের করে আনতে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রভাবতী দেবী, রাজবংশী দেবী, ভগবতী দেবীরা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেন তারা।

আমেদাবাদের কারখানা এলাকায় হরিজন শিশুদের জন্য একের পর এক নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তোলেন অনসূয়া সারাভাই। শহরের প্রান্তিক মানুষজনের উন্নয়নে কর্মযজ্ঞে শামিল হন বিদ্যাগৌরী নীলকান্ত।

কলকাতার বস্তি অঞ্চলে হরিজন শিশুদের চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন সৌদামিনী মেহতা। সেখানে নিয়মিতভিত্তিতে হরিজন শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন চিকিৎসকরা। তাদের দেওয়া হ'ত ওষুধপত্র, পুষ্টিকর খাবার। 'বাংলা হরিজন সেবক সংঘ'-এর সভানেত্রী হয়েছিলেন সৌদামিনী। ঘুরেছিলেন প্রদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন মহিলারা। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আশ্রম' এবং 'বালাশ্রম'-এর।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দেশ ও সমাজ গঠনের আবশ্যিক শর্ত বলে গান্ধীজী মনে করতেন। এই কাজেও তিনি মহিলাদের সহায়তা চেয়েছেন। ধর্মীয় সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন মঞ্চ এবং সভা থেকে ভাষণ দিয়েছেন সরোজিনী নাইডু। তিনি বলতেন "হিন্দু এবং মুসলিম জাতির দু'টি চোখ।

'স্বরাজ'-এর প্রতিমার ওপর দুই চোখের দৃষ্টি পড়লে স্বাধীনতা আসবে অচিরেই।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে পাঞ্জাবের নানা প্রান্তে সভা করেছেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। এই প্রদেশে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যে জনসংযোগের কাজ করেছেন সরলাদেবী চৌধুরানী।

দাঙ্গার সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছেন মৃদুলা সারাভাই। ১৯৪১-এ আহমেদাবাদে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। মৃদুলা বম্বেতে বসে শুনলেন সেকথা। গেলেন হিন্দু প্রভাবিত রায়পুরে। লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং মসজিদ আক্রমণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন সেখানে। সে অঞ্চলের বাসিন্দারা তাঁকে আগে মুসলিমদের কাছ থেকে ঘুরে ফের আসতে বললেন। মৃদুলা কিন্তু বার বার বোঝালেন তাদের। এইসব সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময় কংগ্রেস কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা গান্ধীজীকে উদ্বিগ্ন করেছিল। অন্যদিকে, বিরোধ ও বিদ্বেষ দূর করতে মৃদুলা সারাভাই, ইন্দুমতী চিমনলাল শেঠ এবং পুষ্পবেন মেহতা নিজেদের জীবনপণ করে যেভাবে কাজ করেছিলেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৃদুলা তৈরি করেছিলেন 'শান্তি সেবক সংঘ'। তার সভাপতি হয়েছিলেন মহাদেব দেশাই।

ওই বছরের মে মাসে ফের লাগল দাঙ্গা। হিংসা থামাতে ফের উদ্যোগী হলেন মৃদুলা।

১৯৪৬-এ অশান্ত মিরাটে হানাহানি থামাতে মৃদুলা অসামান্য সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ছুটে গিয়েছিলেন উন্মত্ত জনতার মধ্যিখানে। যাতে তাকে সকলে দেখতে পান সেজন্য উঠেছিলেন একটি গাছের ডালে। সেখান থেকে পুরো সাত ঘণ্টা ধরে মারমুখী জনতাকে বুঝিয়েছিলেন যে হিংসার জয় কখনও সম্ভব নয়। মহাত্মা গান্ধীর নামে স্লোগান দিয়ে অনেকেই তাঁকে পেছন থেকে ছুরি মারছে—এমনটাই সেদিন বলেছিলেন মৃদুলা।

১৯৪৭-এ বিহারে কাটফাটা রোদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দিয়ে গেছেন মৃদুলা।

বার বার অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন মৃদুলা। ১৯৪৭-এ দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানে অপহৃত শিখ ও হিন্দু মহিলাদের এবং ভারতে অপহৃত মুসলিম মহিলাদের উদ্ধারের কাজে নেমে প্রাণের মায়া করেননি এতটুকুও। ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসারে খান আবদুল খান-এর খুদা-ঈ-খিদমতগার (ঈশ্বরের সেবক) সংগঠনের মতো আরও একটি সংগঠন তৈরির চেষ্টা হয়। এই প্রয়াসে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন মৃদুলা। সংগঠনটির নাম দিতে চেয়েছেন 'ইনসানি বিরাদারি' বা মানবভ্রাতৃত্ব দল।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচির আর একটি বিষয় ছিল 'সংযম'। এজন্য তিনি মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি মদের দোকান বন্ধ করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও মহিলাদের ব্যাপক ভূমিকার গুরুত্ব বুঝেছিলেন তিনি। সুরাসক্ত পুরুষদের পত্নীরা পারিবারিক জীবনে তিক্ততম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন। এজন্য বহু মহিলা সাড়া দিয়েছিলেন মহাত্মার ডাকে। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মদের দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে যাঁদের নাম সবার আগে মনে আসে তাঁরা হলেন হংসা মেহতা, মণিবেন নানাবতী, মৃদুলা সারাভাই, খুরশিদবেন নওরোজি, মিঠুবেন পেতিত, অম্বুজাম্মাল, মালতী দেবী প্রমুখ।

ঘরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীরা উপযুক্ত মর্যাদা পান, এমনটাই চাইতেন জাতির জনক। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নে মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষদের সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব গুঁড়িয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যা কমলাদেবী। ওড়িশায় অন্নপূর্ণা দেবী, সুভদ্রা কুমারী চৌহান, বাঙলায় হেমপ্রভা মজুমদার, অন্ধ্রপ্রদেশে লক্ষ্মী উন্নাভা ছাড়াও গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মহিলারা মেয়েদের স্কুল-কলেজ খুলেছেন, হাতে নিয়েছেন মহিলাদের উন্নয়ন বিষয়ক নানা কর্মসূচি। তৎকালীন মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথা বিলোপের উদ্যোগ নেন মুথুলক্ষ্মী দেবী। এজন্য সেখানকার আইনসভায় ১৯৩০ সালে বিল-ও আনেন তিনি।

লিঙ্গ বৈষম্য এবং মহিলাদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মৃদুলা সারাভাই। ১৯৩৪-এ তিনি আমেদাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন মহিলাদের সংগঠন 'জ্যোতিসংঘ'। সমাজের সর্বক্ষেত্রের মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করায় পারদর্শী ছিলেন মৃদুলা। তাঁর পাশে আসেন চারুমতি যোদ্ধা, হেমলতা হেগিশতে, পেরিন মিস্ত্রি, উদয়প্রভা মেহতা, পুষ্পবেন মেহতা, বিদ্যাবেন মেহতার মতো কর্মীরা।

এদেশে সেই প্রথম পারিবারিক কলহ মেটাতে শুরু হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান (family counselling)। এই উদ্যোগ বহু ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে।

১৯৪৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন মহাত্মা গান্ধীর পত্নী কস্তুরবা। ওই বছরই দোসরা অক্টোবর জাতির জনকের ৭৫-তম জন্মবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মারক অছি পরিষদ (Kasturba Gandhi National Memorial Trust—KGNMT)। উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডু। গ্রামীণ এলাকার মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করা ছিল সংগঠনটির উদ্দেশ্য। আজীবন এই সংগঠনের সভাপতি (Chairperson) ছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

খোঁজ রাখতেন খুঁটিনাটি সব বিষয়ে। তাঁর কাছে কোনও কাজই তুচ্ছ ছিল না। যেহেতু কস্তুরবা ছিলেন গ্রামের মেয়ে তাই তাঁর নামাঙ্কিত সংস্থা গ্রামকেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিক এমনটাই চাইতেন জাতির জনক।

গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনে পল্লী অঞ্চলে শৌচালয় ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারে মহিলাদের অবদান অতুলনীয়। কাজেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামেই নয়, মহাত্মার গঠনমূলক কর্মসূচির রূপায়ণেও তাঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।❑

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ : তাঁর দৃষ্টিতে

শলেন্দর শর্মা

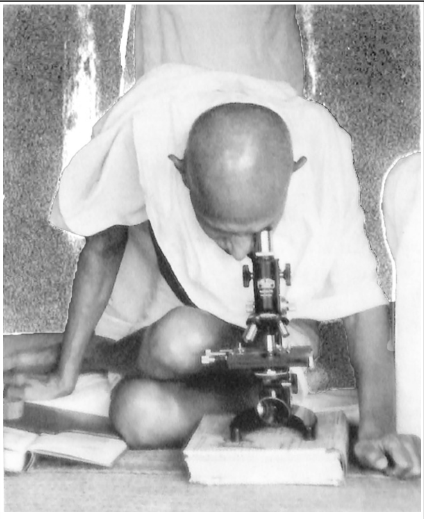

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো বিরাট মাপের মানুষকে কিভাবে বর্ণনা করা যায়? তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমাত্রিক। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন আইনবিদ, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক, দার্শনিক, লেখক, শিক্ষাবিদ এবং আরও অনেক কিছু। দূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত। শিক্ষার প্রসারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে যতটা ভাবনাচিন্তা হওয়ার দরকার ছিল তা হয়নি। গান্ধীজীর দর্শন এবং চিন্তাভাবনার গভীরতা প্রসঙ্গে আলোচনার কাজটি মোটেও সহজ নয়। শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনাচিন্তা ও পরামর্শ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেইসব ধারণার প্রাসঙ্গিকতা এই নিবন্ধের আলোচ্য।

সরল অথচ যুগান্তকারী দিশানির্দেশ : গান্ধীজীর মতো মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধির ধারণা পেতে হলে যেসব মূল্যবোধের ওপর তা আধারিত সে সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। তাঁর দর্শনের মূল কথা হল 'সমন্বিত ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা', অর্থাৎ যে শিক্ষা মন, শরীর এবং আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক; শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পরিসরে সীমিত নয়। 'মানুষ' মানে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক ক্ষমতা, স্থূল শরীর বা আত্মা নয়', এমনটাই তিনি শিখিয়ে গেছেন আমাদের। মহাত্মার শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনায় এই কথা মনে রাখতেই হবে।

গান্ধীজী এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে শিশুরা নিখরচায় শিক্ষার সুযোগ পাবে। কাজটা সহজ নয়

গান্ধীজীর মতো মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধির ধারণা পেতে হলে যেসব মূল্যবোধের ওপর তা আধারিত সে সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। তাঁর দর্শনের মূল কথা হল 'সমন্বিত ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা', অর্থাৎ যে শিক্ষা মন, শরীর এবং আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক; শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পরিসরে সীমিত নয়। 'মানুষ' মানে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক ক্ষমতা, স্থূল শরীর বা আত্মা নয়', এমনটাই তিনি শিখিয়ে গেছেন আমাদের। মহাত্মার শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনায় এই কথা মনে রাখতেই হবে।

আশ্রমে সান্ধ্য প্রার্থনা

[লেখক অধ্যক্ষ, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, আইপিই গ্লোবাল লিমিটেড, ভারত। ই-মেল : s.sharma@ipeglobal.com]

সেবাগ্রামের 'তালিমি সংঘ'-এর স্কুলে শিশুরা

জানতেন তিনি। এজন্য 'শ্রমের (যেমন, চরকা কাটা) বিনিময়ে শিক্ষা'-র কথা বলেছিলেন। হাতে-কলমে কাজের প্রশিক্ষণ থাকলে শিশুরা পরবর্তী জীবনে পেশাগত দিক থেকে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। 'শ্রম'-এর গুরুত্ব অস্বীকার করার অর্থ জাতির আত্মিক বল ক্ষুণ্ন হওয়া, এমনটাই তিনি লিখেছেন 'Young India'-এ।

জাতির জনকের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কায়িক শ্রমের মর্যাদা। এক্ষেত্রে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মনোভাবকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলতেন তিনি। শৌচালয় ব্যবস্থা-সহ সব বিষয়েই হাত-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করতেন।

গান্ধীজীর সময়ে এবং এখনও, পাঠ্য বইকেই শিক্ষার একমাত্র আকর মনে করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্ব পায় কম। এই ধারণাকে কষাঘাত করেছেন গান্ধীজী। এমনকি বলেছেন, 'পাঠ্যপুস্তক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকাজের; হয়তো ক্ষতিকারক নয়, এটুকুই।' বিভিন্ন ভৌগোলিক এবং সামাজিক অবস্থান থেকে আসা শিশুদের একই ধাঁচের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে ফেলা ভুল হবে, এই সারকথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। বরং, শিক্ষকরা পাঠ্যবই থেকে পড়ে সহজ করে শিশুদের প্রয়োজনমতো বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন, এমনটাই চাইতেন জাতির জনক। কারণ পাঠ্যপুস্তক নয়, শিক্ষকরাই পারেন শিশুর 'হৃদয়'কে সমৃদ্ধ করতে, যা আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রাথমিক শর্ত। স্বামী বিবেকানন্দের মতো গান্ধীজীও মনে করতেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণাঙ্গ স্ফূরণ হল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে তা হবে না।

নতুন ভারত, নতুন শিক্ষা (নঈ তালিম) : 'নতুন' শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে মহাত্মার ধ্যানধারণা বুঝতে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী বিনোবা ভাবের শরণাপন্ন হতেই হবে আমাদের। জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে অন্যবশ্যক ভেদরেখা মুছে ফেলা 'নতুন শিক্ষা'-র মূল কথা, বলেছিলেন বিনোবা ভাবে। আসলে এই বিষয়টি কেবলমাত্র একটি শেখার প্রণালী নয়; বরং এক সর্বাঙ্গীণ মূল্যবোধ ও কার্যক্রমের একটি দিক। যার কর্মপন্থা হল সত্যাগ্রহ এবং মূল লক্ষ্য হল 'স্বরাজ'। জাতি গঠনে যথার্থ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম, একথা বার বার বলে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি এমন এক সমাজের কথা বলতেন যেখানে 'ক্ষমতা' শুধুমাত্র কিছু প্রভাবশালীর হাতে কেন্দ্রীভূত নয়। প্রতিটি নাগরিক যেখানে পরস্পরের ক্ষমতায়ন এবং সুরক্ষায় নিয়োজিত। তৎকালীন ভারতবর্ষে চালু পশ্চিমি আদলের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধী মহাত্মার এই 'নঈ তালিম'। পশ্চিমি ধাঁচের ওই শিক্ষাপ্রণালী শুধুমাত্র পেশাগত সক্ষমতাকেই গুরুত্ব দেয় বলে গান্ধীজী মনে করতেন।

দেশের অনেকেই, বিশেষত যারা শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত তারা এখন বুঝতে পারছেন যে বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি একটি প্রারম্ভিক কাজ মাত্র। কর্মসংস্থান-এর জন্য চাই আরও অনেক কিছু। একথা অনেক আগেই বলে গেছেন জাতির জনক। ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটলে শুধুমাত্র স্বাক্ষরতার হার দিয়ে কিছুই হবে না, একথা বার বার উল্লেখ করেছেন তিনি।

'শিক্ষা'-কে তিনি দেখেছিলেন জীবন-ব্যাপী একটি গোষ্ঠীগত, সার্বিক, কর্মভিত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে যার ভিত্তি প্রোথিত তৃণমূল স্তরে। তার রূপায়ণে দরকার গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর বিদ্যালয় গড়ে তোলা যেখানে দেশের চিরাচরিত পেশা ও শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এক অর্থে সহকর্মী হিসেবে কাজ করবেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রারম্ভিক পর্বে গান্ধীজীর এই চিন্তা হয়তো তৎকালীন নীতিপ্রণেতাদের কাছে বাস্তবধর্মী মনে হয়নি। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সেভাবে না এগোনোর জন্যেই আজও আমরা নিজেদের জন-বিন্যাসগত সুবিধা ও সুফল থেকে বঞ্চিত।

মুখস্থবিদ্যার প্রাধান্য ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীর একটি চরম নেতিবাচক দিক। এর ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার শক্তি স্ফূরিত হয় না। বাধা পড়ে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশে। হাতে-কলমে শিক্ষাদানের বিষয়টিও এযাবৎ বেশ অবহেলিত। অতি সম্প্রতি কয়েকটি বিদ্যালয় এই দিকটিতে নজর দিচ্ছে। 'হাতে-কলমে শিক্ষা' গান্ধীজীর 'নঈ তালিম'-এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

১৯৩৭-এ শিক্ষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় গান্ধীজী তৎকালীন শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটিগুলির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন। বস্তুত, বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব উৎপাদন ক্ষেত্রকে সমস্যায় ফেলেছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে খরচ হলেও কাজের কাজ বেশি কিছু হচ্ছে না।

মহাত্মার ১৫০ বছর পূর্তিতে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতাদর্শের আলোচনা এবং অনুসরণই হয়ে উঠক শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। আজ তার প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি। জাতির জনকের চিন্তাভাবনা ছিল মৌলিক। আগামী ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে মহাত্মার শিক্ষাদর্শন-এর অনুসারী হয়ে বর্তমান ব্যবস্থার মূলগত সংস্কারসাধন এই সময়ের দাবি।❑

স্বচ্ছাগ্রহের উজ্জ্বল শিখা

অক্ষয় রাউত

স্বচ্ছ ভারত
স্বচ্ছতার পথে এক কদম

মাত্র পাঁচ বছর আগে, গান্ধীজীর হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা দু'টি ধারণা, সত্যাগ্রহ ও স্বাস্থ্যবিধির সম্মিলিত রূপ ভারতেও দেখা গেল। প্রধানমন্ত্রীর উজ্জীবিত নেতৃত্বে ভারত তার নাগরিকদের সর্বজনীন সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি উপহার দেওয়ার এবং দেশকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মমুক্ত করে তোলার স্পর্ধিত ঘোষণা করে। মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবর্ষে এটাই হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। গান্ধীজীর ভাবনার কোরকবিন্দু থেকেই সূচনা হল স্বচ্ছ ভারত অভিযানের। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজী যেভাবে জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেইভাবেই স্বচ্ছতা অভিযান রূপ নেয় এক জন-আন্দোলনের।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকী ১২৫ কোটি ভারতীয় এর উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত। এমন উদ্‌যাপন, যার পরিসর বিশ্বজুড়ে এবং মহাত্মার জীবন ও আদর্শ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। বাতাসে এখন উৎসবের মেজাজ। আত্মপ্রত্যয়, উত্তেজনা ও কৌতূহলের এমন মিশেল এর আগে দেখা যায়নি। এই পরিবেশ অত্যন্ত কাম্য। বাপুকে যত বেশি স্মরণ ও অনুসরণ করা হবে, ভারত তত বেশি করে নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারবে, পৃথিবীও আরও ভালো জায়গা হয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত এবং সারা বিশ্ব নিজেদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ নতুন করে চিহ্নিত করতে বার বার সাবরমতীর এই মনীষীর জীবনে ডুব দিচ্ছে। ‘‘আমার জীবনই আমার বার্তা’’, এই সহজসরল বিবৃতি আসলে এমন এক সোনার খনির হদিস দেয়, যা উন্নততর সমাজ, উন্নততর দেশ এবং উন্নততর মানবতা গঠনে আমাদের কী করা উচিত তার দিশানির্দেশ করে। গান্ধীজীর বহুবিধ কীর্তির মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে তাঁর কাজ, যা তিনি শুরু করেছিলেন একশো বছরেরও বেশি আগে, ১৮৯৩ সালে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার সময়ে। পরবর্তীকালে বর্ণবৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর দু'দশক ধরে চলা সংগ্রাম এক নতুন মোড় নেয় যখন তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেন। প্রায় দু'দশক দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ে গান্ধীজী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সত্যাগ্রহের মতো বিভিন্ন যুগান্তকারী অহিংস ধারণার সফল পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এলাকা, গোষ্ঠী বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যবিধি যাতে তাঁর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সবসময় থাকে, গান্ধীজী তা সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি বলতেন, ‘‘প্রত্যেককে তার নিজের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।’’ শুধু মুখে বলাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে যে দু'টি খামার তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেই ফিনিক্স এবং টলস্টয়তে এই ভাবনা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হ'ত।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, মাত্র পাঁচ বছর আগে, গান্ধীজীর হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা দু'টি ধারণা, সত্যাগ্রহ ও স্বাস্থ্যবিধির সম্মিলিত রূপ ভারতেও দেখা গেল। প্রধানমন্ত্রীর উজ্জীবিত নেতৃত্বে ভারত তার নাগরিকদের সর্বজনীন সুরক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি উপহার দেওয়ার এবং দেশকে প্রকাশ্যে শৌচকর্মমুক্ত করে তোলার স্পর্ধিত ঘোষণা করে। মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবর্ষে এটাই হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। গান্ধীজীর ভাবনার কোরকবিন্দু থেকেই সূচনা হল স্বচ্ছ ভারত অভিযানের। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজী যেভাবে

[লেখক প্রাক্তন মহানির্দেশক (বিশেষ প্রকল্প), স্বচ্ছ ভারত মিশন, পানীয় জল ও স্যানিটেশন দপ্তর, জল শক্তি মন্ত্রালয়, ভারত সরকার। ই-মেল : akshaykrout@gmail.com]

জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেইভাবেই স্বচ্ছতা অভিযান রূপ নেয় এক জন-আন্দোলনের। অতীতে সত্যাগ্রহীরা যেভাবে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, সেইভাবেই স্বচ্ছতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিলেন স্বচ্ছাগ্রহীরা। তারাই হয়ে উঠলেন এই আন্দোলনের নতুন সৈনিক। তাই সঠিকভাবেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল 'সত্যাগ্রহ সে স্বচ্ছাগ্রহ' এবং ২০১৮ সালের এপ্রিলে স্বচ্ছাগ্রহীদের একটি বৃহৎ সমাবেশের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয় চম্পারণকে। সেই চম্পারণ, যেখানে একশো বছর আগে গান্ধীজী বসেছিলেন সত্যাগ্রহে।

গান্ধীজী ভারতে ফিরেছিলেন উন্নত স্বাস্থ্যবিধির স্বপ্ন চোখে নিয়ে। সারা দেশ ঘুরে স্বাস্থ্যবিধির হাল বোঝার চেষ্টা করলেন। ক্রুদ্ধ ও হতাশ হলেন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যবিধির চরম দুর্দশা দেখে। বললেন, "স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি নয়।" বললেন, "পরিচ্ছন্নতার থেকে বড়ো ধর্ম আর নেই।" জাতীয় এই ক্ষোভই রূপ পেল ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে, যখন তিনি বললেন, "আমাদের মা-বোনেদের যে আজও প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করতে হয়, তা কি আমাদের ব্যথিত করে না? মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা কি আমাদের জাতীয় কর্তব্য নয়? অন্তত মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার জন্য আমাদের এই কালো দাগকে মুছে ফেলতেই হবে।"

প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করেন, এমন ৬০ কোটিরও বেশি মানুষের বদভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ৫ বছরের মধ্যে প্রায় একটি মহাদেশের সমান জনসংখ্যাকে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধির আওতায় আনার এই লক্ষ্যপূরণ প্রাথমিকভাবে অবাস্তব মনে হয়েছিল। তখন ভারতের গ্রামীণ এলাকার মাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধির আওতায় ছিলেন। প্রকাশ্যে শৌচকর্ম করতে হয়, বিশ্বের এমন অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বাস ছিল ভারতে। এর সঙ্গে ভারতের বিশাল ভৌগোলিক ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জের কথা বিবেচনা করলে কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। রাষ্ট্রসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৬-এ ৩০২০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিধির যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করছিল ভারতের ওপরে।

গান্ধীজীর চিন্তাধারায় আলোকিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশনের সূচনা করেন। দেশকে অপরিচ্ছন্নতা ও প্রকাশ্য শৌচকর্ম থেকে মুক্ত করে গান্ধীজীর স্বপ্নের নির্মল ভারত গড়ে তোলা ছিল এর লক্ষ্য। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই মিশনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেল। এর পিছনে ছিল চারটি P। Political leadership বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব, Public funding বা সরকারি অর্থের জোগান, Partnership বা অংশীদারিত্ব এবং People's participation বা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। সরকারি কর্মসূচি হিসাবে এর সূচনা হলেও অচিরেই স্বচ্ছ ভারত মিশন, বিশ্বের বৃহত্তম জন-আন্দোলন হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উঠে আসেন জন্মগত নেতৃত্বগুণের অধিকারী মানুষেরা। এলেন স্বেচ্ছাসেবক এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ। গ্রামের সরপঞ্চ বা গ্রামপ্রধান এবং স্বচ্ছাগ্রহীরা রইলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। মানুষের কুঅভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সরকারি কর্মসূচির স্বীকৃতি পাওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশনে তৃণমূল স্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম মিশে রয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের কেন্দ্রে রয়েছেন মহিলারা। তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের এই আন্দোলনে বহুক্ষেত্রে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অনেক গ্রামে মহিলারাই স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়ে বাকিদের সচেতন করছেন। এমনকী রাজমিস্ত্রির কাজে এতদিনের পুরুষ আধিপত্য ভেঙ্গে রানিমিস্ত্রি হয়ে তারা শৌচাগার নির্মাণ করছেন। এই শৌচাগারকে দেশের অনেক জায়গায় ভালোবেসে 'ইজ্জত ঘর' নামেও অভিহিত করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতার চেতনা জাগাতে শিশু ও যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, বহু জায়গায় তারা স্বেচ্ছা শ্রমদানও করছে। স্কুলের পড়ুয়ারা অনেক জায়গায় পরিবর্তনের দূত হিসাবে দেখা দিয়েছে। 'মুঝে শৌচালয় চাহিয়ে' বা 'আমার শৌচাগার চাই' বলে তারা যে দাবি তুলেছে, তাতে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা। শিশুরা আবার ভোরবেলা বাঁশি আর টর্চ নিয়ে নজরদারিও চালাচ্ছে। মাঠেঘাটে যেতে অভ্যস্তদের বাধ্য করছে শৌচাগারে যেতে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন তার অর্জিত সাফল্যে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ১০ কোটি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ৬ লক্ষ গ্রাম, ৬৯৯-টি জেলা এবং ৩৫-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত হিসেবে ঘোষিত হবার পথে। তবে এতে আত্মতৃপ্ত হলে চলবে না। অর্জিত সাফল্যকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে এগোতে হবে নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে। এর পরের লক্ষ্য আরও অভিনিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা।

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের ত্রিবেণী সঙ্গম এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার উল্লেখ না করলে স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাফল্যের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ত্রয়ী হল স্বচ্ছ ভারত মিশনের আত্মা। এগুলি ছিল বলেই এই কঠিন কাজকে এত সহজ দেখিয়েছেন। যেসব গ্রামে সংবাদ

গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদের উদ্বুদ্ধ করছেন মহিলা স্বচ্ছাগ্রাহীরা

মাধ্যম এখনও পৌঁছতে পারেনি, সেখানে দীর্ঘদিনের সময়ের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা উপায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সরাসরি যোগাযোগের উপায় ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের কুঅভ্যাসে পরিবর্তন আনতে তৃণমূল স্তরে নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে গেছেন প্রায় চার লক্ষ স্বচ্ছাগ্রহী। দেশজুড়ে নিয়মিতভাবে 'স্বচ্ছতা হি সেবা', 'স্বচ্ছ শক্তি'-র মতো বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে। স্বচ্ছ ভারতের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে গান্ধীজীর চশমা, যা মানুষের ভাবনাচিন্তা আরও উসকে দেয়। দেশের বিভিন্ন গ্রাম, শহর, অলিগলি ছেয়ে গেছে এই প্রতীক চিহ্নে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রভাবশালী ও পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং গোষ্ঠীপতিরাও স্বচ্ছ ভারত মিশনে এগিয়ে আসায় সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। শৌচাগারের মাটি খোঁড়ার কাজে তারা যখন হাত লাগান, শৌচাগারের ইট গাঁথেন তখন সাধারণ মানুষ তা দেখে, তা নিয়ে আলোচনা করে, তাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তৃতায় স্বচ্ছ ভারতের কথা বারবার বলেছেন। রেডিওতে তার জনপ্রিয় মাসিক অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বহুবার স্বচ্ছতার কথা উঠে এসেছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের একটি মূল ভিত্তি হল সবার অংশগ্রহণ। প্রধানমন্ত্রী বারে বারে এর উল্লেখ করেছেন। গত পাঁচ বছরে এই আন্দোলনের ছোঁয়া লাগেনি, দেশে এমন কেউ বাকি নেই। সরকার, বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, কর্পোরেট মহল, সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—সকলেই এই কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছে। স্বচ্ছতা পাখোয়াড়া, স্বচ্ছতা কর্মপরিকল্পনার মতো বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রক উদ্যোগ এবং স্বচ্ছ বিশেষ স্থান, নমানি গঙ্গের মতো প্রকল্প দেশের বিখ্যাত জায়গা ও পর্যটন স্থলগুলিতেও পরিচ্ছন্নতার ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে। যেসব দপ্তরের সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধির আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনও সম্পর্ক নেই, তারাও এই প্রয়াসে তাদের সম্পদ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলির অনুদানে গড়া হয়েছে স্বচ্ছ ভারত তহবিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বচ্ছ ভারত গ্রীষ্মকালীন শিক্ষানবি-শিতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পরিচ্ছন্নতার প্রচার চালাচ্ছে, এমন দৃশ্য দেখে মন ভরে যায়।

ভারতের এই স্বচ্ছতার মার্গযাত্রা ২০১৮ সালের অক্টোবরে এক বিশেষ মাইলফলকে পৌঁছায়। মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি সম্মেলনের আয়োজন করে ভারত। এতে যোগ দেয় বিশ্বের ৭০-টিরও বেশি দেশ থেকে আসা মন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞরা এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব। তারা সবাই স্বচ্ছতা অভিযানের উজ্জীবক যাত্রা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, ভাগ করে নেন নিজেদের অভিজ্ঞতা। সবার জন্য স্বাস্থ্যবিধি শীর্ষক দিল্লি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্য অভ্যাগতরা।

চলতি বছরের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা। দেশকে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত করার যে প্রতিজ্ঞা পাঁচ বছর আগে নেওয়া হয়েছিল, ভারতের এর মধ্যেই তা পূরণ করার কথা। কিন্তু এই বিশাল দেশে এত দশকের জমে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিধি প্রতিষ্ঠা খুব সহজ কাজ নয়। গত আগস্টে লালকেল্লা থেকে তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই প্রয়াসের জন্য জাতিকে অভিবাদন জানিয়েছেন। একইসঙ্গে গান্ধীজীর জন্মদিন থেকে নতুন আন্দোলন শুরু করার ডাক দিয়েছেন তিনি। এবারের আন্দোলন দেশকে প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত করে তোলার আন্দোলন। সবাইকে এই আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,

শৌচাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে 'স্বচ্ছ সুন্দর শৌচালয়' উদ্যোগ

নয়াদিল্লিতে মহাত্মা গান্ধী আন্তর্জাতিক স্যানিটেশন সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

"এই ২ অক্টোবরে আমরা কি ভারতকে একবার ব্যবহারের পর বর্জনীয় প্লাস্টিক থেকে মুক্ত করতে পারি? আসুন, আমরা ঘুরে দাঁড়াই। গান্ধীজীকে স্মরণ করে আমাদের বাড়ি, স্কুল, কলেজ, রাস্তা, নর্দমা থেকে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ করতে হবে। পুরসভা, পুর নিগম, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকেও একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথম বড়ো পদক্ষেপ কি আমরা ২ অক্টোবর নিতে পারি?

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৯৫ লক্ষ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমে। এর মধ্যে ৩৮ লক্ষ টনই আবর্জনার মধ্যে, নদী ও অন্যান্য জায়গায় এলোমেলোভাবে জমে থাকে। এগুলির অধিকাংশই একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক। এর কুপ্রভাব পড়ে আমাদের জমি, জল, বাতাস, খাদ্য—সবকিছুর ওপরেই। ক্যারি ব্যাগ, বিভিন্ন রকমের মোড়ক, প্লাস্টিকের ছুরি-চামচে, ঘর সাজানোর জিনিস প্রভৃতির মতো একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সংগ্রহ করে তা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা থাকলে তবেই পরিবেশকে বাঁচানো সম্ভব। অথচ দেশে প্রতিদিন ২২,০০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয়, আর এর মধ্যে ১০,০০০ টন বর্জ্য সংগ্রহই করা হয় না।

এর জেরে দীর্ঘমেয়াদি যে ধারাবাহিক ক্ষতি হয়ে চলেছে, সেদিক থেকে বিচার করলে প্রধানমন্ত্রী যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার থেকে সময়োপযোগী আর কিছু হতে পারে না। গত ১১ সেপ্টেম্বর মথুরায় স্বচ্ছতা হি সেবা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনার আগে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহকারী একদল মহিলার সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফের বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সরকার এই বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তার আর একটি নিদর্শন হল, প্রধানমন্ত্রী ৫ লক্ষেরও বেশি গ্রামপ্রধান ও স্বচ্ছাগ্রহীকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ডাক দিয়েছেন। এইসব চিঠি গ্রামসভার বৈঠকে পড়ে শোনানো হয়েছে। সত্যি বলতে কী, প্রধানমন্ত্রীর এই ডাকের পরে বিভিন্ন সংস্থা একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ এবং প্লাস্টিকের বিকল্প খোঁজার কাজে এগিয়ে এসেছে।

স্বচ্ছতা হি সেবা—গান্ধীজীর ভাবাদর্শে গড়ে তোলা এই কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবা, জন-আন্দোলন, শ্রমদান প্রভৃতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধিকে জাতীয় জীবনের অঙ্গ করে তোলা হয়েছে। ২০১৭ সালে আনুমানিক ১০ কোটি এবং ২০১৮ সালে ২০ কোটি ভারতীয় এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। চলতি বছরের আগস্টে মন কী বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছা শ্রমদানের আবেদন জানিয়েছেন। চলতি বছরের স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত। ভারতকে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত করে তোলার পর প্লাস্টিক নিয়ে জন-আন্দোলনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচিতে নিজেদের ভূমিকা পালনের পর আমরা পৌঁছে গেছি বহু প্রতীক্ষিত গান্ধী জয়ন্তীতে, যেদিন ভারতকে প্রকাশ্য শৌচকর্মমুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আমাদের প্রেরণার চিরকালীন উৎস গান্ধীজী এই দিনটা দেখতে পেলে খুব খুশি হতেন। তিনি দেখতেন, তাঁর স্বপ্নের স্বচ্ছ ভারত ক্রমশ বাস্তব রূপ পাচ্ছে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

গান্ধী : সমন্বয়-এর দিশারী

পি. এ. নাজারেথ

সেগাঁও-তে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে (১৯৩৯)

অর্থনৈতিক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও কর্মসম্পাদনের বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাভাবনার ভরকেন্দ্রে ছিল ভারতের চরম দারিদ্র্য। তাঁর দর্শন জারিত প্রখর নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধে। মহাত্মার মতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিমানুষের এবং সমগ্র জাতির নৈতিক স্বাভিমানকে আঘাত করে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঠিক একইভাবে, যে অর্থনৈতিক প্রয়াস এক দেশকে অন্য দেশের শোষণে উৎসাহ দেয় তাও পরিত্যাজ্য। সভ্যতার অর্থ শুধুমাত্র ব্যাহ্যিক ক্রমব্যাপ্তি নয়, পরিকল্পিত এবং ঐচ্ছিক ভিত্তিতে আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষয়—এমনটাই মনে করতেন তিনি।

গান্ধীজীকে শান্তির প্রবক্তা, জাতির জনক, অহিংস আন্দোলনের মাগদর্শক, শান্তির প্রতিমূর্তি, এমন নানা বিশেষণে প্রায়শই ভূষিত করা হয়। নিপুণ রণকৌশলের মাধ্যমে পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসম্পাদনে দক্ষ ব্যক্তি বা নিপুণ কার্যনির্বাহী কিংবা management icon হিসেবে তাঁকে কেউই বর্ণনা করেন না। কিন্তু এটাই করেছেন খ্যাতনামা জীবনীলেখক অ্যালান অ্যাক্সেলরড। রানি প্রথম এলিজাবেথ, উইনস্টন চার্চিল, জেনারেল জর্জ প্যাটন-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনীকার অ্যাক্সেলরড একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম 'Gandhi CEO, 14 Principles to Guide and Inspire Modern Leaders (গান্ধী মুখ্য কার্যনির্বাহী, আধুনিক নেতাদের অনুসরণীয় ১৪-টি নির্দেশিকা)। সেখানে তিনি অবশ্যই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গান্ধীজী অনন্য গুণসম্পন্ন এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় ভরপুর এক অতীব শ্রদ্ধেয় মানুষ। কিন্তু অত্যন্ত বাস্তববাদী নেতা ও রণকৌশলগত চাতুর্যের দিক থেকেও তিনি অসাধারণ।

বইটিতে ১৪-টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। উল্লিখিত ১৪-টি নীতি বা নির্দেশিকার ব্যাখ্যা রয়েছে এক-একটিতে। এর মধ্যে লেখক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মহাত্মার চরিত্রের জাদু এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এই বিষয়গুলিই গান্ধীজীর সাফল্যের এবং মানুষের মনে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন-এর চাবিকাঠি বলে অ্যাক্সেলরড মনে করেন। বর্তমানের নেতাদের কাছে এই নীতিগুলি অনুসরণযোগ্য, এমনটাই মনে করেন লেখক। অহেতুক গোপনীয়তা অবলম্বন না করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। অতিরিক্ত রাখঢাক-এর কোনও অর্থ হয় না এমনটাই তিনি মনে করেন। নেতৃত্বদানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অন্যদের কাছে অনুসরণযোগ্য, নীতিনিষ্ঠ হতে হবে এবং কর্মসম্পাদনে লক্ষ্য ও পন্থাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে, বলেছেন অ্যাক্সেলরড।

দমনমূলক নীতি নিয়ে চলা প্রশাসনেরও কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি হল শাসিতপক্ষের থেকে পাওয়া সম্মতি বা অনুমোদন, তা সে ইচ্ছাপূর্বক প্রদত্তই হোক বা জোর করে আদায় করাই হোক। এমনটা মনে করতেন গান্ধীজী। বইয়ে এই বিষয়টির উল্লেখ করে অ্যালান অ্যাক্সেলরড বলেছেন যে, ব্যবসায়িক সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা CEO-দের মনে রাখা উচিত জোর-জবরদস্তিতে আদতে কোনও কাজ হবে না; দরকার কর্মীদের এবং সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের আস্থা অর্জন। ভিন্ন মতকেও স্বাগত জানাতে হবে। কারণ সকলেই কোনও বিষয়ে একই পথে ভাবছে মানেই হল আদতে কেউই কিছু ভাবছে না।

গান্ধীজী আইন পড়েছিলেন। অর্থনীতি বা বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে (Business

[লেখক ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত (অবসরপ্রাপ্ত), ভারতীয় বিদ্যাভবনে গান্ধী সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান ভ্যালুস-এর চেয়ারম্যান। ই-মেল : panazareth@gmail.com]

Management) তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ নেননি। তা সত্ত্বেও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাঁর এমন প্রখর অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয়ে উঠল কিভাবে তা ভাববার বিষয়। আসল রহস্য হল 'সত্য'-এর প্রতি মহাত্মার গভীর আত্মনিবেদন। এজন্যই তিনি সমস্ত বিষয়কে, এমনকি 'সত্য'-কেও, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে পারতেন। মনে রাখতে হবে গান্ধীজী আত্মজীবনীর নাম রেখেছিলেন 'সত্যের সঙ্গে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা' ('My Experiments with Truth')। অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, সত্যের অনুসন্ধান যত গভীর হয় ততই খোঁজ মেলে লুকিয়ে থাকা আরও রত্নভাণ্ডারে।

অর্থনৈতিক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও কর্মসম্পাদনের বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনার ভরকেন্দ্রে ছিল ভারতের চরম দারিদ্র্য। তাঁর দর্শন জারিত প্রখর নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধে। মহাত্মার মতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিমানুষের এবং সমগ্র জাতির নৈতিক স্বাভিমানকে আঘাত করে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঠিক একইভাবে, যে অর্থনৈতিক প্রয়াস এক দেশকে অন্য দেশের শোষণে উৎসাহ দেয় তাও পরিত্যাজ্য। সভ্যতার অর্থ শুধুমাত্র ব্যাহ্যিক ক্রমব্যাপ্তি নয়, পরিকল্পিত এবং ঐচ্ছিক ভিত্তিতে আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষয়—এমনটাই মনে করতেন তিনি।

মহাত্মার ধারণা এবং আদর্শের সারমর্ম লুকিয়ে আছে ভারতের নেতাদের প্রতি তাঁর সেই অমোঘ নির্দেশের মধ্যে—'যখনই সন্দিহান হবেন (কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে), মনে আনবেন আপনার চোখে পড়া দরিদ্রতম মানুষটির মুখ। জিজ্ঞাসা করবেন নিজেকে, যা করতে যাচ্ছেন তা ওই মানুষটির কোনও কাজে আসবে কি না'?

গান্ধীজী চাইতেন দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা হোক গ্রামীণ ভারতে। কারণে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম, লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাওয়া ভাষাহীন, সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ নাগরিকের বাস সেখানেই। তা ছাড়া, বিপুল উৎপাদন নয়, তিনি চাইতেন সাধারণের সক্রিয়

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বিহারে (১৯৪৬)

অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া যেখানে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা, দেশীয় প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্ভব।

কোনও পণ্য নির্মাণে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি গ্রামের সাধ্যের মধ্যে না থাকে তাহলে উৎপাদন কেন্দ্র হওয়া উচিত নিকটতম শহরে। যারা সেখানে কাজ করবেন তারা গ্রামের বাড়ি থেকেই কর্মস্থলে যাতায়াত করবেন। এতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাদের থাকা হবে। লাগবে না শহরের বাড়ি ভাড়া। পাশাপাশি সম্ভব হবে সুলভ মূল্যে শ্রমের জোগান। এমনটাই ভেবেছিলেন জাতির জনক।

পুঁজিবাদী এবং কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কোনওটিই গান্ধীজীর পছন্দ ছিল না। এর কারণ হল, প্রথমটিতে ব্যবসায়িক মুনাফাই শেষ কথা। অন্যদিকে, দ্বিতীয়টির সঙ্গে শ্রেণিবিদ্বেষ, জবরদখল এবং হিংসা জড়িয়ে আছে বলে তিনি মনে করতেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর চূড়ান্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন তিনি। "শোষণ কমিয়ে আপাতভাবে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও, এই ব্যবস্থা (কম্যুনিজম) সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিসাধন করে মানুষের স্বতন্ত্রতাকে বিনষ্ট করে, যা (স্বতন্ত্রতা) সমুদয় অগ্রগমন ও উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি"—বলেছেন মহাত্মা। তাঁর চোখে গণতন্ত্র হল এমন এক প্রশাসনিক কাঠামো যেখানে 'দুর্বলতম এবং সবলতমের সমানাধিকার' বিরাজমান। তিনি বলতেন, "প্রকৃত স্বরাজ কতিপয় মানুষের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মাধ্যমে আসবে না। ক্ষমতার অপব্যবহারে শামিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাধারণ মানুষ সক্ষম হয়ে উঠলে তবেই তা (স্বরাজ) আসবে"। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির বদলে মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজ করানোর কথা বলেছেন তিনি। প্রস্তাব রেখেছেন 'অছি' ব্যবস্থাপনার। যাদের টাকা আছে তাদের বলা হবে 'অছি' হিসেবে কাজ করতে। তারা গরিবের হয়ে অছির ভূমিকা নিয়ে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, এমনটাই ছিল জাতির জনকের অভিমত। এভাবেই পুঁজিবাদের শোষণ এবং কম্যুনিজম-এর দমনমূলক কাঠামো সরিয়ে মানবিক সমবায়ভিত্তিক সর্বোদয় (প্রতিটি মানুষের সার্বিক উন্নয়ন)-এর স্বপ্নে পৌঁছনোর কথা ভেবেছিলেন মহাত্মা। এই ধারণারই প্রতিফলন দেখা যায় বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের মধ্যে।

গান্ধীজী বলতেন, "শ্রম পুঁজির তুলনায় বহুগুণে শ্রেয়। শ্রম ব্যাতীত সোনা, রুপো কিংবা তামা অর্থহীন বোঝা। ধরিত্রীর জঠর থেকে মূলবান আকরিক তুলে আনে শ্রম-ই। শ্রম অমূল্য। সোনা নয়। আমি পুঁজি এবং শ্রমের মিলন চাই। এদের পারস্পরিক সহযোগিতায় অসাধ্যসাধন হতে পারে।" ১৯১৮-এ আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পের কর্মীরা ধর্মঘট করেন। বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতা করেন গান্ধীজী। তৈরি হয় আমেদাবাদ বস্ত্রশ্রমিক সংগঠন (The Ahmedabad Textile Association), যা ছিল সাতটি বস্ত্রশ্রমিক সংঘের সম্মিলন। ১৯৩৯ নাগাদ সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা ২৫,০০০ ছাড়িয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে নানা সময়ে নানান কথা বলেছেন গান্ধীজী। কিন্তু সুনির্দিষ্ট এবং ধারাবাহিক তত্ত্ব পেশ করার সময় তাঁর ছিল না। "গান্ধীবাদী অর্থনীতি" বলতে আমরা যা বুঝি তার পেছনে রয়েছেন মহাত্মার অন্যতম শিষ্য জে. সি. কুমারাপ্পা (JCK)। এইসব বিষয়ে JCK প্রায় দু'দশক ধরে লিখেছেন Young India-এ। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয় JCK-র লেখা 'Economy of Permanence' বইখানি।

পশু-পাখি মৌমাছি-র উদাহরণ টেনে বইটিতে JCK পাঁচ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এনেছেন : পরজীবী,

হামলাকারী (Predatory), উদ্যোগী, যূথবদ্ধ (Gregationary) এবং পরিষেবাকেন্দ্রিক (বা সেবাভিত্তিক)। শেষেরটিই শুধু মুনাফাকেন্দ্রিক নয়। বরং অর্জন করে নেওয়ার কথা বলে (acquisitive)। কিন্তু, তাও প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী গতানুগতিকতায় পর্যবসিত...এবং হিংসা এই চক্রকে ভাঙতে পারে না, যাতে আমরা স্থিতিশীল অর্থনীতিতে (economy of permanence) পৌঁছই।" মুনাফার লিপ্সা এবং অতিরিক্ত উৎপাদনকে গান্ধীজী বিশ্বের যাবতীয় দুর্দশার জন্য মূলত দায়ি করেছে। "বাজার দখল করে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বেচে দেওয়ার জন্যই যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে হয় উৎপাদন, তারপর বেয়নেট-এর ভয় দেখিয়ে তৈরি করা হয় চাহিদা।" তিনি বলেছেন, পশ্চিমি সভ্যতা হল ক্রিসমাস ট্রি-র মতো, সুসজ্জিত। কিন্তু এই গাছ মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জল পায় না। কিছু সময় চাকচিক্য ধরে রাখতে পারলেও, খুব শীঘ্রই নুয়ে পড়ে তা শুকিয়ে যাবে। শেষমেশ জ্বালানি কাঠ হওয়া ছাড়া তার আর কোনও উপযোগিতা থাকবে না।

আজ, সার্বিক উৎকর্ষ ব্যবস্থাপনা (Total Quality Management—TQM), উপভোক্তা সংযোগ ব্যবস্থাপনা (Customer Relations Management—CRM), ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility—CSR), সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের স্বার্থরক্ষা (Safeguarding the Interests of All Stake Holders—SIASH), অনাড়ম্বর বা অতিসরল প্রযুক্তি (Frugal Engineering—FE), ব্যয়সঙ্কোচ (Lean Management—LM), ভিত্তিগত পরঙ্গমতা (Core Competence—CC), নিম্ন মূল্যবিন্দুতে ভারসাম্যবিধান (Building Scale at Lower Points—BSLPP), উদ্ভাবনমূলক চিন্তা (Culture at Innovative Thinking—CIT) কিংবা দূরদর্শী নেতৃত্ব (Visionary Leadership—VL) নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে। গান্ধীজী এসব কথা বলে গেছেন ১৯২০-'৩০ এই সময়ে।

TQM সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা ছিল এইরকম। "শিক্ষার্থীদের সুতো কাটার কাজ হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তাদের যন্ত্র হবে পরিচ্ছন্ন এবং ঠিকঠাক। আর সুতো হওয়া দরকার সর্বোচ্চ মানের।"

CRM কী? গান্ধীজী বলেছেন, "গ্রাহক আমাদের কাছে (ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান) সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি আমাদের ওপর নির্ভরশীল নন। আমরা তার ওপর নির্ভরশীল। তিনি আমাদের কাজে বিঘ্নকারী নন। তিনিই হলেন মূল উদ্দেশ্য (Purpose)। পরিষেবা দিয়ে আমরা তাকে কৃতার্থ করছি না। পরিষেবা প্রদানের সুযোগ দিয়ে তিনি আমাদের কৃতার্থ করছেন।"

চম্পারণের নিপীড়িত নীল চাষিদের হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পৌঁছবার পর তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শৌচালয় ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নে মহাত্মা যে কাজ করেছিলেন সে থেকেই CSR সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আসা যাক SIASH-এর প্রসঙ্গে। গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ১৯৩১-এ ইংল্যান্ড সফরের সময়েই গান্ধীজী গিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। ভারতে তাঁর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন সেখানকার বস্ত্র কারখানার কর্মী এবং মালিকদের কাছে। এর সপ্তাহ কয়েক আগেই (সে বছরের এপ্রিলে) Blackburn-এ ৮ হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছিল যে, ভারতে রাজদ্রোহিতা এবং আইনশৃঙ্খলার সমস্যা না মিটলে Lancashere-এর বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কোনও আশা নেই। তা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেস্টার গিয়েছিলেন গান্ধীজী। যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "বিদেশি বস্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মসূচি নিয়ে সেখানে (Lancashere)-এ চূড়ান্ত ভুল বুঝেছেন সকলে। আমি তাদের মুখোমুখি হলে আমাকে অনেক প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তাদের সবই বলব কিছু গোপন না রেখে" Lancashere-এ ২ দিন ছিলেন গান্ধীজী (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর)। বেশ কয়েকটি কারখানায় গিয়ে কথা বলেছিলেন শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে। এছাড়া, বস্ত্র ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং Preston-এর মেয়রের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছিল।

FE এবং LM-এর বিষয়ে গান্ধীজীর মনোভাব বুঝতে চোখ রাখতে হবে চরকা আন্দোলনের দিকে। ঔপনিবেশিকতা এবং মানুষের চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'চরকা'-কে হাতিয়ার করেছিলেন জাতির জনক। পাশাপাশি সুতো উৎপাদনে ব্যয়সাশ্রয় এবং সঠিকভাবে হিসেব রাখার বিষয়টিতেও কড়া নজর ছিল তাঁর। তিনি নিজে লেখার জন্য একই পেন্সিল ব্যবহার করে যেতেন দীর্ঘদিন ধরে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে লেখা যায়। বহু সময়েই ডাক মারফত আসা পোস্টকার্ড এবং খাম ব্যবহার করতেন কোনও বিষয়ের উত্তর কিংবা অনুগামীদের কিছু লিখে পাঠানোর সময়।

ভারতে ভয়াবহ বেকারির এবং Lancashere-এর বাণিজ্যগোষ্ঠীর মোকাবিলায় গান্ধীজী বেছে নিয়েছিলেন 'চরকা'-কে। অনেক তথাকথিত 'নামজাদা' অর্থনীতিবিদ এই নিয়ে হাসাহাসি করেছেন। কিন্তু, একথা অনস্বীকার্য যে 'চরকা' গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে, সত্যাগ্রহীদের মধ্যে এনেছে শৃঙ্খলাবোধ, কমিয়েছে বস্ত্র আমদানি এবং আঘাত হেনেছে ব্রিটেনের আর্থিক স্বার্থে। 'বৃহৎ মন্দা' বা 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর ফলে ভারতে ব্রিটেন থেকে বস্ত্র আমদানি হ্রাস পেয়েছিল ২৫ শতাংশ। আরও ১৮ শতাংশ হ্রাস-এর কারণ ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিদেশি পণ্য বর্জনের কর্মসূচি। ব্রিটিশ সংসদের নিম্নকক্ষ বা House of Commons-এ একথা বলেছেন তৎকালীন Secretary of State for India।

জার্মান অর্থনীতিবিদ, আর্নস্ট শুমাখার তার 'Small is Beautiful' বইতে গান্ধীজীকে বর্ণনা করেছেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি অর্থনীতিবিদ বলে, যিনি অর্থশাস্ত্রে 'মানুষ'-এর ভূমিকা নেই, এই মত মানতেন না। গান্ধীজী বলেছেন, "ব্যাপক উৎপাদন (mass production)-এর প্রযুক্তি চরিত্রগতভাবে হিংসাশ্রয়ী, পরিবেশের প্রশ্নে হানিকর, পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষ এবং ব্যক্তিমানুষের বিকাশের পরিপন্থী।

মানুষের দ্বারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রযুক্তি সর্বোত্তম আধুনিক জ্ঞানের ব্যবহার ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিকেন্দ্রিকতা নিয়ে আসতে সক্ষম। তা প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দুর্লভ সম্পদের পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে তা ব্যক্তিমানুষের সেবা করে মানুষকে যন্ত্রের দাস বানায় না।” এই বিষয়টিকে তিনি বলেছেন মধ্যবর্তী প্রযুক্তি (Intermediate Technology)।

‘Inclusive Economics’ বইয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নরেন্দর পাণি। মহাত্মার অর্থনৈতিক দর্শন চিরাচরিত অর্থশাস্ত্রের মতো আগে তত্ত্ব খাড়া করে পরে নীতি প্রণয়ন করে না। এখানে প্রথমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ স্থির করে তা অর্জনের উপায়ের কথা ভাবা হয়। নরেন্দর পাণি তার ‘Inclusive Economics’ বইয়ে বলেছেন যে চলতি তত্ত্বগুলির প্রতি সন্দিহান ছিলেন গান্ধী। এজন্যই একবিংশ শতকের শুরুতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উঠে আসা সমস্যাগুলির মোকাবিলায় তিনি এত প্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক কচকচানি পেরিয়ে সমাজকে বুঝে নেওয়ার গুরুত্বের কথা বলেছিলেন জাতির জনক। তাঁর চিন্তা অন্তর্ভুক্তিমূলক। জানা এবং অজানা বিষয়ের মোকাবিলায় তা কার্যকর। তাড়াহুড়ো করে কিছু করার প্রয়োজন অনেক কম এই ব্যবস্থায়। তত্ত্বের বদলে পন্থার দিকে বেশি দৃষ্টি দিলেই গান্ধীজীর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায়।” পাণি আরও বলেছেন, “গান্ধীজীর ভাবনাচিন্তার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই তাঁর সংযমী জীবনযাপনের বিষয়টি সম্পৃক্ত। মনে হতে পারে যে, মহাত্মার মতো অনাড়ম্বর জীবনযাপনে শামিলদের ক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তাভাবনা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু, যখনই আমরা বুঝতে পারি যে, এই অর্থনৈতিক দর্শন অন্যান্য নীতিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তখনই তার সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায়।

ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের দুনিয়ায় আজ অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় হল ভিত্তিগত বা অন্তর্নিহিত পারঙ্গমতা বা Core Competence। Collins এবং Porras-এর

১৯০৮ সালে রেভারেন্ড ডোক-এর বাড়িতে (জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

মতে বিষয়টি হল কৌশলগত একটি ধারণা যা মানুষের স্বাভাবিক সক্ষমতার কথা বলে। এক শতকের বেশি আগে গান্ধীজী বয়নশিল্পকে ভারতের মানুষের অন্তর্নিহিত পারঙ্গমতা বা Core Competence বলে চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, শতকের পর শতক ধরে ভারতীয়রা এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুলো, মসলিন-সহ নানা ধরনের বস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করে গেছেন। ভারতীয় বয়নশিল্পে বিপর্যয় ডেকে এনেছে যন্ত্রে তৈরি কাপড় এবং এমন এক কর ব্যবস্থা যা দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বস্ত্রের চেয়ে আমদানি হওয়া কাপড়ের বেশি সহায়ক। এই পরিস্থিতি পালটে দেওয়ার জন্যই গান্ধী ‘চরকা’-কে বেছে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ দমনপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল এই চরকা। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ফের বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের বস্ত্রের জোগান দিচ্ছে। গান্ধীজীর BSLPP, CIT and VL-এর প্রশ্নে চরকা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

Times of India পত্রিকায় ১৯৯৮-এর ২২ অক্টোবর প্রকাশিত নিবন্ধে গান্ধীজীকে উত্তর আধুনিকতাবাদের ঈশ্বর এবং বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক বলে বর্ণনা করেছেন Development Alternatives-এর প্রেসিডেন্ট অশোক খোসলা। তিনি বলেছেন যে, আদিম সময়ের জীবনযাপনে নয়, প্রযুক্তি সহায়ক পন্থায় মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী গান্ধীজী। প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং প্রশাসনের বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্ভবত একবিংশ শতকে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম সম্পদ।

সি. কে. প্রহ্লাদ-এর ‘The Fortune At the Bottom of the Pyramid : Eradicating Poverty Through Profits’, বইতে গান্ধীজীর উল্লেখ নেই। কিন্তু ২০০৮-এ বেঙ্গালুরুর Infosys চত্বরে ভাষণে প্রহ্লাদ নিজের ওপর মহাত্মার গভীর প্রভাবের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন। বইতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ছোটো-বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থা দরিদ্রদের সেবা করেও লাভের মুখ দেখতে পারে। লাভজনক ব্যবসা, সম্পদ সৃষ্টির নতুন পরিমণ্ডল এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবই একই-সঙ্গে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি ছোটো প্যাকেটে নিরমা সাবান, অন্নপূর্ণা সল্ট, অরবিন্দ আই কেয়ার, ভারতী এয়ারটেল-সহ বিভিন্ন সংস্থার উল্লেখ করেছেন।

সমালোচকরা গান্ধীজীকে বলেছেন অবাস্তববাদী। কেউ বা বলেছেন স্বপ্ন জগতের অধিবাসী। মহাত্মা কিন্তু আসলে ছিলেন মাটির বড়ো কাছাকাছি থাকা একজন মানুষ, যিনি সুদূর ভবিষ্যতে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ওপর তথাকথিত আধুনিক ও বস্তুকেন্দ্রিক সভ্যতার ভয়ঙ্কর প্রভাব বোঝার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। বর্তমান সময়ের উষ্ণায়ণ কিংবা ভয়াবহ বেকারির প্রসঙ্গেই তা বোঝা যায়। মানুষ পরিশ্রমী হবে, ‘তবে যন্ত্রের মতো নয়, ব্যস্ত মৌমাছির মতো’, এমনটাই বলতেন তিনি। কর্মসংস্থানের জন্য ‘চরকা’-কে বেছে নিয়েছিলেন গান্ধীজী। বস্তুত ‘চরকা’ আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ভারতের কুটির ও গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্রে আজ কর্মরত তিন কোটিরও বেশি কারিগর।

সারা বিশ্বেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় গান্ধীজীর প্রভাব স্পষ্ট, এমনটা বলাই যায়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ John Maynard Keynes ১৯৩০ সালে

প্রকাশিত তাঁর 'A Treatise on Money' বইতে বলছেন, 'আরও অন্তত একশো বছর আমাদের নিজেদেরই বোঝাতে হবে যে ন্যায্য (Fair) হল অন্যায্য (Foul) এবং অন্যায্য হল ন্যায্য। কারণ অন্যায্য হল কার্যকরী, ন্যায্য নয়। আরও কিছু সময় অর্থলিপ্সা-ই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গুণ হয়ে থাকবে। পরবর্তীতে নিছক অর্থনৈতিক চাহিদার অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে মিলবে আলোর খোঁজ।

অন্যদিকে, আমেরিকার ম্যানেজমেন্ট গুরু Peter Drucker ১৯৮৯ সালে একটি বইতে লিখছেন, ''ব্যবস্থাপনা (management) বা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম একটি সম্মিলিত প্রয়াসে ও লক্ষ্যের অভিমুখে মানুষকে চালিত করার বিষয় হওয়ায়, তা শেকড় গেড়ে বসে আছে মানুষের আচরণে। বাজেট ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজারদের কাজ হল কর্মীদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত সেইসব রীতিনীতিকে চিহ্নিত করা যেগুলি স্থিরীকৃত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। পাশাপাশি, আমার মতো যারা দীর্ঘদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, তারা সকলেই বোঝেন যে এই বিষয়টি (management) আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত, মানুষের প্রকৃতি, ভালো-মন্দ এসব কিছুর সঙ্গেও।''

বিশ্ব উষ্ণায়ণের এই সময় গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা উল্লেখ করা হয়েছে আগেই।

১৯৬২-তে Rachel Carson তার 'Silent Spring' বইতে কীটনাশকের মারাত্মক প্রভাবের কথা বলেছেন। পরিবেশ-এর মধ্যে বিষ ছড়ালে মানুষ একদিন নিজে সেই বিষের দহন ভোগ করবে। মহাত্মা এই কথা বলেছেন তিন দশক আগেই : ''ধরিত্রী প্রতিটি মানুষের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় সংস্থান রেখেছে, কিন্তু, মানুষের লোভ চরিতার্থ করতে নয়।... যুদ্ধের কারণ হল লালসা।''

এই অসাধারণ উক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচি বিভাগ (United Nations Environment Programme—UNEP)-এর স্লোগান হিসেবে।

যন্ত্রমানব ইতোমধ্যেই মার্কিন মুলুক এবং ইউরোপের অনেক পেশাকে ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় রসিদ ব্যবস্থাপত্র (automated billing) এবং ড্রোন (Drone) হিসাবশাস্ত্র (accountancy) বা পণ্য সরবরাহ (delivery)-এর ক্ষেত্রে বহু মানুষের চাকরি কেড়ে নিয়েছে। কিছুদিন পরে হাসপাতালের সেবিকা (Nurse) বা যানচালকদেরও একই পরিস্থিতির মুখে হয়তো পড়তে হবে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চ বা World Economic Forum-এর হিসেব মতো ২০২০-র মধ্যে ১৫-টি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ হারাবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ শতাংশ কর্মীর সামনে ছাঁটাই-এর বিপদ রয়েছে বলে জানিয়েছে Citibank।

চিনের বৈদ্যুতিন বাণিজ্য সংস্থা (e-commerce) 'আলিবাবা'-র চেয়ারম্যান Jack Ma এই চূড়ান্ত বিপদের মোকাবিলায় যে পথ বাতলেছেন তার মধ্যে গান্ধীজীর ভাবনার ছোঁয়া চমকে দেওয়ার মতো। ''আগামী ৩০ বছর সারা বিশ্ব সুখের চেয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবে অনেক বেশি...মানুষ যা পারে না, যন্ত্রের সেইটুকুই করা উচিত...শুধুমাত্র তা হলেই যন্ত্র মানুষের পরিবর্ত না হয়ে অংশীদার হিসেবে থাকবে।''

এক শতকেরও বেশি সময় আগে গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, মানবশ্রমকে ছুটি দেওয়ার যন্ত্র আসলে শ্রমিকের প্রয়োজনকেই দূর করে দিচ্ছে। তিনি বিপুল উৎপাদন (mass production)-এর বদলে জনতার মাধ্যমে উৎপাদন (Production by mass)-এর ডাক দিয়েছিলেন। হাতে তুলে নিয়েছিলেন চরকা। খাদিবস্ত্র, শাল, কার্পেট, পিতল ও কাঁসার সামগ্রী, এইসব উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার পাশাপাশি ফি বছর রপ্তানিবাবদ ৫০০ কোটি ডলার আসে ভারতের কোষাগারে।

মহাত্মার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষটি। তাদের সঙ্গে থেকে, তাদের বুঝিয়ে, উদ্বুদ্ধ করে পথ চলেছেন তিনি। বলেছেন 'চরম সত্য', অহিংসা এবং 'চরকা' হল ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের একমাত্র পথ। ৩৫ কোটি ভারতীয় রুখে দাঁড়ালে এবং কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হলে কতিপয় ইংরেজে এদেশ শাসন করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়ে পড়বে এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এজন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক শর্ত, এমনটা বলে গেছেন বার বার। তৈরি করেছেন দেশের মানুষকে। লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয়েছে তাঁকে ঘিরে। মানুষ চরকা হাতে নিয়েছেন, বিদেশি কাপড় পুড়িয়েছেন, শাসকের নির্যাতন সহ্য করেছেন। অহিংসা ছিল তাদের মূলমন্ত্র। ঘুম থেকে জেগেছেন মানুষ। সম্মিলিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছেন জীবনপণ করে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন বিংশ শতকের সর্ববৃহৎ জন-অভিযান। তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে ভারতকে। এসেছে গণতন্ত্র। সামন্ততন্ত্র পরাভূত হয়েছে বিনা রক্তক্ষয়ে। পরবর্তীতে গান্ধীজীর পথে হেঁটেছেন জওহরলাল নেহরু, ডেসমন্ড টুটু, মার্টিন লুথার কিং, কোরাজেন অ্যাকুইনো, লেচ ওয়ালেন্সা-র মতো নেতারা। রাষ্ট্রসংঘে সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১২০-টি ইউরোপীয় উপনিবেশ। মানুষের সংগ্রামের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন একের পর এক একনায়ক। পালটেছে বিশ্বের মানচিত্র। তাই মহাত্মার সাফল্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমন্বয়করণেও।❑

আমেদেবাদে কোচরাব-এ প্রথম আশ্রম (১৯১৫)

জানেন কি?

তমসাচ্ছন্ন আকাশে পবিত্রতম আধ্যাত্মিক আলো

পড়ার পাশাপাশি গান্ধীজী জ্ঞানার্জন করেছেন বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে। এদের মধ্যে অন্যতম ফরাসি নোবেল জয়ী আদর্শবাদী রোম্যাঁ রোলাঁ। এই শান্তিবাদী তথা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনিষী বিশ্বশান্তির খোঁজে গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন।

তার ডায়েরির উদ্ধৃতি-সহ রোম্যাঁ রোলাঁর গান্ধীজীকে ও তাঁর সম্পর্কে লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনার মধ্যে দিয়ে একথাই স্পষ্ট যে কীভাবে এই ফরাসি মানববাদীর মনে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি এক সুগভীর, অসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জন্ম নেয়। যে সময়ে ইউরোপে বিশ্ববিধ্বংসী হিংসার আবহাওয়া বিরাজমান, সেই পরিস্থিতিতে, তার নিজের কথায়, গান্ধীজীর অহিংসার বার্তা বোঝার মতো পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও যেসব পশ্চিমী মানববাদীরা সর্বপ্রথম গান্ধীজীর বার্তা আত্মস্থ ও প্রসারিত করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রকাশন বিভাগ গান্ধীজীর সঙ্গে ও তাঁর বিষয়ে রোম্যাঁ রোলাঁর লেখা চিঠিপত্র, দিনলিপি ও অন্যান্য রচনার সংকলন বাংলায় প্রকাশ করেছে ‘‘রোম্যাঁ রোলাঁ-গান্ধী সংবাদ’’-এর দু’টি খণ্ডের আকারে।

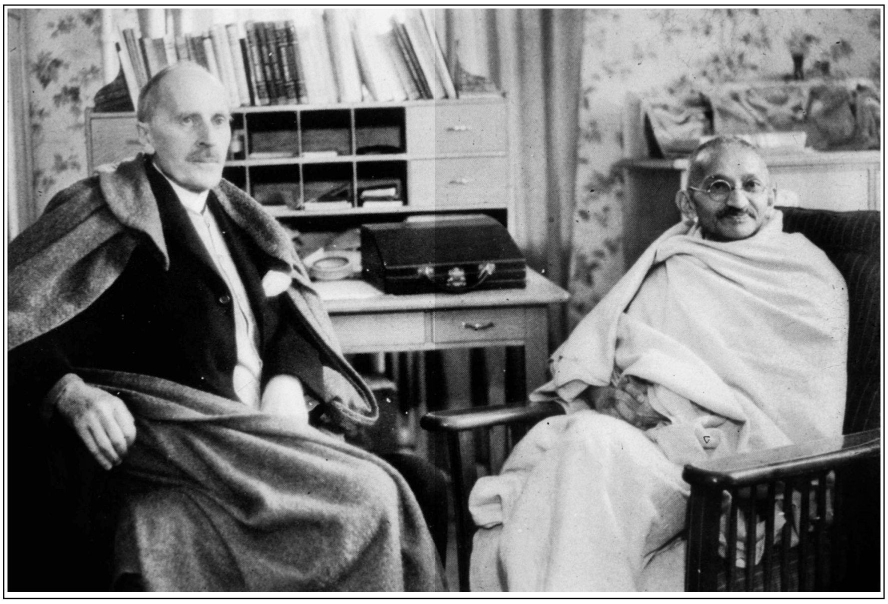

এই বইটির প্রথম খণ্ডের ২০১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হল :

গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে প্রকাশের জন্য রেজিনল্ড রেনাল্ডস্‌কে প্রেরিত রোলাঁর বাণী।

ভিলন্যোভ্‌, লেক জিনিভা
১ অক্টোবর, ১৯৩০

আমোদের চোখে গান্ধী কেবল তাঁর দেশের বিরাট জনগণের (যারা স্বাধীনতার দাবি তুলেছে এবং যাদের দাবি অচিরে স্বীকৃত হবার সম্ভাবনা) অকুতোভয় নেতা মাত্র নন। বর্তমান যুগের তমসাবৃত আকাশে তিনিই একমাত্র বিশুদ্ধ জ্যোতি ও সত্যপথ নির্দেশনার ধ্রুবতারকা। প্রচণ্ড ঝড়তুফানের মধ্যে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরণী আজ তার সমস্ত পণ্যসম্ভার নিয়ে নিমজ্জিতপ্রায়। এই দুঃসময়ে একমাত্র তাঁর আলো আমাদের উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে।

সেই উদ্ধারের পথটুকু আমাদের সকলের অন্তরেই সন্নিবিষ্ট—সে উপায় আর কিছু নয়, অন্যায় ও অসত্যকে অস্বীকার করার পরমা শক্তি। আমাদের অন্তরস্থিত শক্তির গৌরবে আমরা যদি হিংসাকে ও অন্যায়কে তুচ্ছ করতে পারি, তবেই সত্য হবে বিদ্রোহী আত্মার বিজয় অভিযান।

এই বিদ্রোহে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের পরস্পর প্রতিযোগিতার কোনও স্থান নেই। এ মানুষকে মানুষের কাছ থেকে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে না, সকলকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে পরস্পরের নিকট করে। সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষের মনুষ্যত্ব লুপ্ত ছিল গহন তমিস্রার বিরাট শূন্যতার মধ্যে। সেই শূন্যতা থেকে উদ্ভুত এক অদ্বিতীয় আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়েছিল। আজকের সমস্যা আর কিছু নয়—আত্মঘাতী উন্মত্ততায় মানুষ কি আবার সেই আদিম অন্ধকারে ফিরে যাবে? গান্ধী সেই অদ্বিতীয় আত্মার আলোকে তাঁর নিজের প্রাণের প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে নিয়েছেন। তিনি সেই দীপবর্তিকা তুলে ধরে খ্রিস্টানদের (আজ যারা বাইরের আচার বিচারেই খ্রিস্টান) মনে করিয়ে দিচ্ছেন, কী করে সত্যকার খ্রিস্টান হওয়া যায়, যারা নিজেদের স্বাধীনচেতা (পরাধীনতা ঢাকবার জন্য যারা এখন শূন্যগর্ভে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান) বলেন, তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সত্যকার স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়, সকল মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন সকলে তারা একই পিতার সন্তান বলে, পরস্পরকে কীভাবে তারা শ্রদ্ধা করে চলবেন—সেই পরমেশ্বরের নামে, যিনি সকল আলো সকল প্রেমের উৎস, যিনি সৃষ্টির আদিযুগে যখন ‘‘পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল’’ (যেমন আজও আছে) আত্মারূপে সেই জলের উপরে বিচরণ করেছিলেন।❑

দিল্লি বইমেলা-২০১৯ গান্ধীজীর ওপর প্রকাশন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই প্রকাশ

দিল্লি বইমেলা—২০১৯। প্রকাশিত হচ্ছে গান্ধী-সাহিত্যের ওপর পাঁচটি নতুন বই

দিল্লি বইমেলা-র ২৫তম আসর। ২০১৯ সালের বইমেলার প্রথম দিনে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে প্রকাশন বিভাগের স্টল উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী অমিত খারে। প্রকাশন বিভাগের পাঁচটি বই উন্মোচন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গান্ধী সংগ্রহশালার নির্দেশক শ্রী এ. আন্নামালাই।

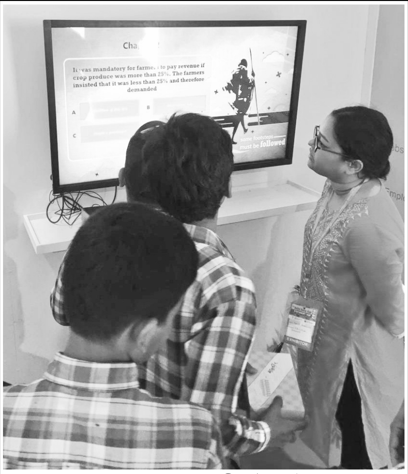

Gandhi@150 শীর্ষক ক্যুইজে অংশ নিচ্ছে পড়ুয়ারা

হিন্দি ও ইংরেজির পাশাপাশি একাধিক ভারতীয় ভাষায় বই প্রকাশ করে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনগাঁথা সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শ্রী খারে প্রকাশন বিভাগকে সাধুবাদ জানান। ইন্টারনেটের যুগেও ক্রমবর্ধমান বই পড়ার সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে ইন্টারনেট তথ্যভাণ্ডার হলেও প্রকৃত অর্থে জ্ঞান অর্জন হয় বইয়ের মাধ্যমেই।

স্টলে গান্ধীজী-সম্পর্কিত স্মারকের প্রতিরূপ সাজানো

জাতীয় গান্ধী সংগ্রহশালার সহযোগিতায় গন্ধীজীর সম্পর্কিত স্মারকের প্রতিরূপের পাশাপাশি তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে Gandhi@150 বিষয়ক ইন্টারঅ্যাক্টিভ স্ক্রিন (যাতে অডিও, ভিডিও ও ক্যুইজ ছিল) দিয়ে সাজানো হয় প্রকাশন বিভাগের হ্যাঙ্গারটি। ক্যুইজে অংশ নেয় অনেক ছাত্রছাত্রী।

পরবর্তীতে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী তথা জাতীয় গান্ধী সংগ্রহশালার নির্দেশক শ্রী এ. আন্নামালাই '১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৬—সত্যাগ্রহের জন্ম' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সংগ্রামের চিত্রানুগ বর্ণনা দেন। জানান কীভাবে 'সত্যাগ্রহ' শব্দবন্ধটি সৃষ্টি হয়। গান্ধীজীর দ্বারা উল্লেখিত সত্যাগ্রাহীর মূল্যবোধ দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার ওপর জোর দেন।

গান্ধীজীর ধ্যানধারণার ওপর প্রকাশিত বইয়ের অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশক হিসেবে প্রকাশন বিভাগ মহাত্মা গান্ধী বিষয়ক ছাপানো পুস্তক ও ই-বুকের পসরা সাজিয়ে

স্টলে হিন্দি বইয়ের পসরা সাজানোর জন্য ITPO ও FIP প্রকাশন বিভাগকে স্বর্ণ ট্রফিতে ভূষিত করে

দেয় দিল্লি বইমেলায়। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিশু সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশের নেতাও নেত্রীদের জীবনী, গাছগাছালি ও পশুপাখি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি, রাষ্ট্রপতি ভবন-সহ বিবিধ বিষয়ের ওপর বই ছিল সেখানে। এবারের দিল্লি বইমেলা গত ১১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। এই বার্ষিক মেলার উদ্যোক্তা 'ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স' (FIP) ও 'ইন্ডিয়া ট্রেড প্রোমোশান অর্গানাইজেশান' (ITPO)।❑

দিল্লি বইমেলায় প্রকাশতি পুস্তকসমূহ

● ***কস্তুরি পরিমল (হিন্দি) :*** কস্তুরবা গান্ধী। একটি বালকের মোহন থেকে মহাত্মা হওয়ার সাক্ষী শুধু নন; সেই রূপান্তরযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে। এই বইয়ে গল্পের আঙ্গিকে তাঁরই জীবনকাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। জীবনসংগ্রাম ও ক্লেশ; গান্ধীজীর সঙ্গে কথোপকথন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী হিসেবে উত্থান। বিভিন্ন আশ্রমের রোজনামচার পাশাপাশি গান্ধীজীর উদ্যোগে শুরু হওয়া গঠনমূলক কার্যক্রমে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে এই বইটিতে। মারাঠি সাহিত্যজগতে এই বইয়ের লেখক ড. বিশ্বাস পাটিলের যথেষ্ট নামডাক আছে।

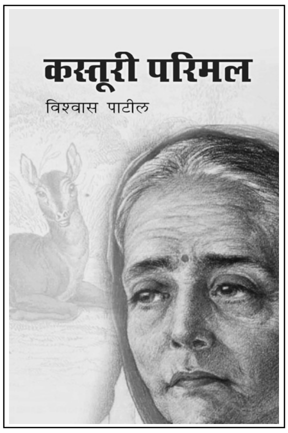

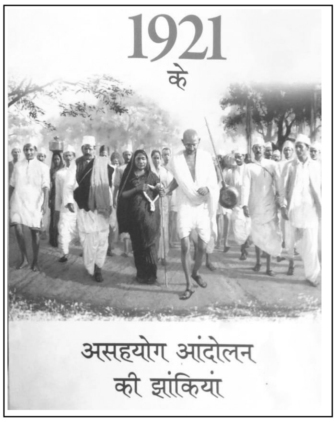

● ***1921 কে অসহযোগ আন্দোলন কি ঝাঁকিয়াঁ (হিন্দি) :*** মুখবন্ধ লিখেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি। ড. তারাচাঁদ, শ্রী প্রকাশ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কাকা কেলকর, আর. আর. দিবাকর, হরিভাউ উপাধ্যায় ও ড. হরেকৃষ্ণ মেহতা-সহ বহু বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিকের লেখা সংকলিত করা হয়েছে এই বইতে।

● ***গান্ধী কথা (হিন্দি ও উর্দু) :*** ছোটোদের উদ্দেশ্যে লেখা এই বইটিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনকাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে 'গ্রাফিক নভেল' বা কমিক্সের আঙ্গিকে। প্রকাশন বিভাগ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও এটি প্রকাশ করতে উদ্যত।

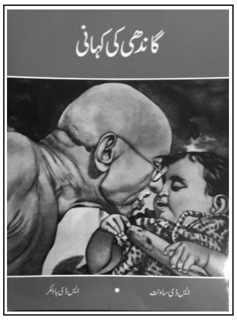

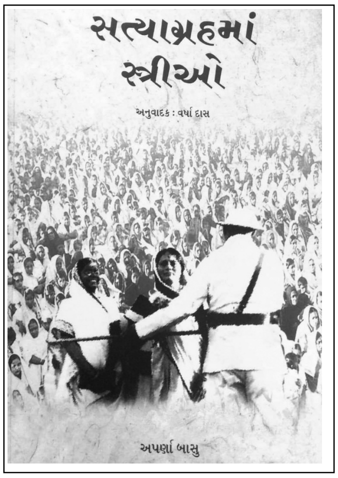

● **"Women in Satyagraha" (গুজরাটি) :** প্রকাশন বিভাগ প্রকাশিত মূল ইংরেজি বইটি লিখেছেন জাতীয় গান্ধী সংগ্রহশালার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, অধ্যাপক অপর্ণা বসু। এবার সেটিকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী অধ্যাপক বর্ষা দাস। এতে কিছু নারীর গল্প বলা হয়েছে; যারা কিনা বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রামের সময় পর্বে উৎসাহের প্রতিমূর্তি হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু কখনওই অহিংসার পথ থেকে সরে আসেননি। এদের মধ্যে অনেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ভারতের সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন।

● ***Homage to Mahatma : All India Radio Tributes (তামিল) :*** বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে। চেন্নাই-স্থিত গান্ধী অধ্যয়ন কেন্দ্রের সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে তামিল ভাষায়। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-তে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা লর্ড মাউন্টব্যাটনের মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সেগুলিই সংকলিত আছে এই বইটিতে।❑

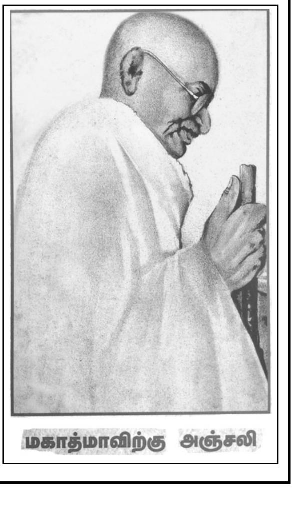

আমাদের প্রকাশনা

Mahatma Gandhi : A Life Through Lenses

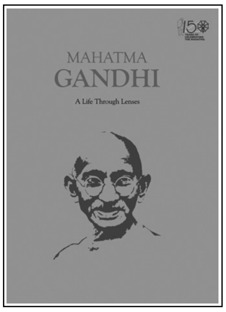

আমাদের জীবনে গান্ধীজীর উপস্থিতি প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মূল্যবোধ এবং অনুসৃত নীতির পাঠ পড়ানো হয় আমাদের। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনই তা আত্মস্থ করে উঠতে পারে। তথাপি, গড়পড়তা ভারতবাসীর জীবনে অন্য যেকোনও সর্বজনপরিচিত ব্যক্তিত্বের তুলনায় গান্ধীজী অনেক বেশিমাত্রায় ছাপ ফেলেন। Mahatma Gandhi : A Life Through Lenses শীর্ষক কফি টেবিল বইটিও সেরকমই কাজে আসবে। বাপুর পৈতৃক নিবাস, তিনি শৈশবে যেখানে পড়াশোনা করেন সেই স্কুল, লন্ডনে তাঁর ছাত্রাবস্থার দিনগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর পেশাগত জীবন এবং পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় (সঠিক অর্থেই এই সময়কে 'Making of Mahatma' বলে আখ্যা দেওয়া হয়), পরে ভারতে; আলোকচিত্রের মাধ্যমে এই দীর্ঘ যাত্রাপথের সফর করায় বইখানি আমাদের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মঞ্চে তাঁর প্রবেশ, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধরনধারণে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের এক সীমিত প্রচেষ্টার গণ্ডি পেরিয়ে তা এক গণ-আন্দোলনের আকার নেয়। শুরুতে বইয়ের 'প্রস্তাবনা'-য় সংক্ষেপে গান্ধীজীর জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ঘটনাক্রম অনুযায়ী, নান্দনিকভাবে আলোকচিত্রের সম্ভার পর পর সাজিয়ে সেই জীবনকাহিনী বয়ান করা হয়েছে। সেই অনন্যসাধারণ জীবনচর্যার কাহিনী, যা কিনা বিশ্বজুড়ে সমধিক প্রসিদ্ধি পাওয়ার পরও আমাদের মনে একথা ভেবে এখনও বিস্ময় জাগে যে, তাঁর সম্পর্কে আমরা সত্যি কত সামান্য জানি!

১৯৫৪ সালে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চলতি বছরে মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবর্ষ উপলেক্ষ্য 'প্রকাশনা বিভাগ' তা পুনর্মুদ্রিত করে। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজঘাটে আয়োজিত ''সর্বোদয় দিবস প্রদর্শনী''-তে যেসব আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়, সেগুলিই এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। নয়াদিল্লিস্থিত 'জাতীয় গান্ধী মিউজিয়াম'-এর সৌজন্যে এইসব আলোকচিত্র সংগৃহীত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে কারও সামান্যতম আগ্রহ থাকলেই বইটি তাঁর জন্য অবশ্য সংগ্রহযোগ্য। কারণ, মহাত্মা গান্ধীর জীবদ্দশাকালীনই ঘটে এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। বইটি হিন্দিতেও পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্য : ২৩৬০ টাকা; ISBN : 978-81-230-3033-3

Satyagraha Geeta এবং Uttar Satyagraha Geeta

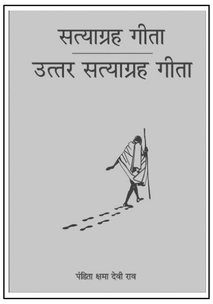

'Satyagraha Geeta' প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৩২ সনে, প্যারিসে। এর দ্বিতীয় খণ্ড, "Uttar Satyagraha Geeta" প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এর দশকে। দু'টি বইয়েরই লেখক পণ্ডিতা ক্ষমা রাও, বিগত শতকের সংস্কৃত ভাষার অন্যতম প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। অধ্যাপক কে. এম. পাণিক্করের কথায়, দু'টি বইয়েই অনুষ্টুপ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা কিনা মহাকাব্য রচনার মান্য ছন্দ হিসাবে স্বীকৃত। এই ছন্দ ব্যবহারের দরুন অতি নান্দনিক উপায়ে গান্ধীজীর জীবনের প্রগাঢ় প্রশান্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের দৃশ্যকল্প আঁকা সম্ভব হয়েছে। 'Satyagraha Geeta'-এ 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' পর্যন্ত গান্ধীজীর জীবনপর্বকে তুলে ধরা হয়েছে; পক্ষান্তরে "Uttar Satyagraha Geeta" গ্রন্থে গান্ধীজীর ৭৫তম জন্মদিবস পর্যন্ত সময়পর্বব্যাপী মহান সংগ্রাম কাহিনীর বর্ণনা ঠাঁই পেয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থদ্বয়কে বিস্মৃতির অতল থেকে পুনরুদ্ধার করে, হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ-সহ মুদ্রিত করেছে প্রকাশন বিভাগ। উল্লেখ্য, মূল গ্রন্থ দু'টি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এক নান্দনিক DVD সেট হিসাবেও এই গ্রন্থসম্ভার প্রকাশ করেছে বিভাগ।

Women in Satyagraha

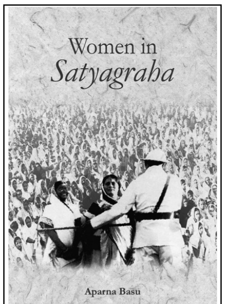

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম পর্বের দু'টি অনন্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, তা অহিংস নীতিভিত্তিক এবং জন-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল; আর দ্বিতীয়ত, বিপুল সংখ্যায় মহিলার এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ। গান্ধীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে ভারতের নারীসমাজ পুরুষ সহযোগীদের কয়েক যোজন পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। নিজের এই বিশ্বাসের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে শামিল করার কাজে সফল তো হনই; এমনকী সামনের সারিতে উঠে এসে এসব নারী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্বও দেন।

"Women in Satyagraha" বইটি লিখেছেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী ড. অপর্ণা বসু। এতে কিছু নারীর গল্প বলা হয়েছে; যারা কিনা বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রামের সময়পর্বে উৎসাহের প্রতিমূর্তি হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু কখনই অহিংসার পথ থেকে সরে আসেননি। এদের মধ্যে অনেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ভারতের সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। বইটিতে প্রথমাংশে, ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে জনপরিসরে মহিলাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। তবে মূল বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাশ গান্ধীজী নিজের হাতে তুলে নেওয়ার পর, সেই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে। লেখকের নিজের কথায় : গান্ধীই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন দিশা ও অনুপ্রেরণা জোগান। বইটি গুজরাটি ভাষাতেও পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্য : ১৫০ টাকা; ISBN : 978-81-230-2807-1

যোজনা ? কুইজ

১। Audit Bureau of Circulations (ABC)-এর নতুন চেয়ারম্যান কে?
২। “From Leeches to Slug Glue : 25 Explosive Ideas that Made (and Are Making) Modern Medicine” শীর্ষক বইটির লেখক কে?
৩। শিক্ষার মৌলিক অধিকার ও গোপনীয়তার অধিকার, এরই অঙ্গ ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার—সম্প্রতি কোন রাজ্যের হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে?
৪। SEBI-র SSE কমিটি কি?
৫। Karan Vandana (DBW-187) ও Pusa Yashasvi (HD-3226) কোন খাদ্যশস্যের নতুন/সংকর প্রজাতি?
৬। গন্দন তেগচেনলিং বৌদ্ধ মন্দির কোথায়?
৭। “Being Gandhi” বইটির লেখক কে?
৮। NEAT প্রকল্প কী?
৯। প্রস্তাবিত জাতীয় পুলিস বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় গড়ছে ভারত সরকার?
১০। কেন্দ্র সরকার ‘ডিজিটাল পেমেন্ট অভিযান’-এর জন্য কোন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে?
১১। আগামী ৪-১৩ মার্চ, ২০২২ সালের বেজিং শীতকালীন প্যারালিম্পিক্স। এর সরকারি ম্যাস্কট-এর নাম কী?
১২। International Day of Sign Languages কবে পালিত হয়?
১৩। ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে লেখা “Girl Power : Indian Women Who Broke The Rules” বইটির লেখক কে?
১৪। এ বছরের পুরুষদের ভলিবলে এশীয় চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ?
১৫। ৯২-তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড, অর্থাৎ ২০২০ সালের অস্কার পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ বিদেশি চলচ্চিত্রের শ্রেণিতে কোন ভারতীয় সিনেমাকে দেশের তরফে মনোনীত করা হয়েছে?
১৬। ২০১৯ সালের অস্কারের জন্য কোন ভারতীয় তথ্যচিত্র মনোনয়ন পেয়েছে?
১৭। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে?
১৮। গগনযান প্রকল্পের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা অন্য কোন ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে?
১৯। ২০২০ সালকে কোন ভারতীয় রাজ্য ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বছর’ হিসেবে ঘোষণা করেছে?
২০। বেঙ্গালুরুতে চালু হয়েছে NCCCR&D। এর পুরো নাম কী?
২১। অরুণাচল প্রদেশের চাংল্যাং জেলার বিজয়নগর গ্রামের বৈশিষ্ট্য কী?
২২। CoO কী?
২৩। World Bamboo Day (WBD) কবে পালন করা হয়?
২৪। দক্ষিণ এশিয়ার উচ্চতম মিনার কোথায় সম্প্রতি উন্মোচন হয়েছে?
২৫। পাঁচ দিনের নৌ মহড়া ‘SITMEX’-এ গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে অংশ নেয় কোন কোন দেশ?

উত্তর :

১. মধুকর কামাথ, DDB মুদ্রা গ্রুপ নামক বিজ্ঞাপন সংস্থার চেয়ারম্যান এমেরিটাস। ২. রূপা পাই। ৩. কেরালা। ৪. Social Stock Exchanges (SSE)। ৫. গম। ৬. উলানবাতর, মঙ্গোলিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট খাল্‌তামাগিন বাতুলগার সঙ্গে যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সাহায্যে সেখানে বুদ্ধের একটি সোনালি মূর্তি উন্মোচন করেন। ৭. পারো আনন্দ। ৮. National Educational Alliance for Technology (NEAT); কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য-চালিত কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের শিক্ষা প্রকল্প। ৯. গ্রেটার নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ। ১০. Nasscom’s Data Security Council of India (DSCI) ও Google। ১১. “Shuey Rhon Rhon”। ১২. ২৩ সেপ্টেম্বর। ১৩. নেহা জে হিরানন্দানি। ১৪. ইরান; ফাইনালে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে; তেহরানে। ১৫. পরিচালক জোয়া আখতারের ‘গাল্লি বয়’। ১৬. নির্মল চন্দ্র নির্দেশিত ‘মোতি বাগ’। ১৭. অভিনেতা গোবিন্দা। ১৮. Defence Research and Development Organisation (DRDO)। ১৯. তেলেঙ্গানা। ২০. National Centre for Clean Coal Research and Development। ২১. পূর্ব দিশায় ভারতের শেষপ্রান্তীয় গ্রাম। ২২. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক প্রদত্ত Certificates of Origin যা এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও উপলব্ধ। ২৩. ১৮ সেপ্টেম্বর। ২৪. কলম্বো, শ্রীলঙ্কা; ৩৫০ মিটার লম্বা, ১৭ তলার লোটাস টাওয়ার। ২৫. আয়োজক ভারতের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড।❑

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত অমিতাভ বচ্চন

ধুণ্ডীরাজ গোবিন্দ ফালকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ত্র্যম্বকেশ্বর নামক স্থানে একটি মারাঠি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদাসাহেব ফালকে নামেই তিনি অধিক পরিচিত। এই ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজকের মৃত্যু হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪। তাকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯১৩ সালে রাজা হরিশচন্দ্র নির্বাক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন যা ছিল ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এরপর তিনি প্রায় চব্বিশ বছর ধরে ৯৫-টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ও ২৬-টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যার মধ্যে অন্যতম *মোহিনী ভস্মাসুর* (১৯১৩), *সত্যবান সাবিত্রী* (১৯১৪), *লঙ্কা দহন* (১৯১৭), *শ্রীকৃষ্ণ জন্ম* (১৯১৮), *কালীয় মর্দন* (১৯১৯), *সেতু বন্ধন* (১৯২৩) ও *গঙ্গাবতরণ* (১৯৩৭)।

ভারতীয় সিনেমার জনক দাদাসাহেব ফালকের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর ফিল্মজগতের বিশিষ্টদের এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয় কেন্দ্র সরকারের তরফে। ১৯৬৯ থেকে এই পুরস্কার চালু হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর গত ২৪ সেপ্টেম্বর জানালেন, এ বছর দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন। একটি ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বয়ং অমিতাভকে ট্যাগ করে মন্ত্রী ঘোষণা করেন 'কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন, যিনি দু'টো প্রজন্মকে বিনোদন এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তিনি এ বছরের দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন' (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

'সাত হিন্দুস্তানি' ছবির মাধ্যমে পথ চলা শুরু; পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে দাপটে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন কিংবদন্তি অভিনেতা। সিনেমা জগতে তার নজিরবিহীন অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার অমিতাভ বচ্চনকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়াও ২০০১ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১৫ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পান। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লেজিয়ঁ দ্য'নর-ও পেয়েছেন।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'-এর ইমেজ দিয়ে যার হিন্দি ছবিতে উত্থান সেই অমিতাভ দর্শককে পর পর মাতিয়েছেন তার একের পর এক সুপারহিট ছবি দিয়ে। 'শোলে', 'শরাবি', 'কুলি', 'ডন', 'শাহেনশা', 'লাওয়ারিস', 'আজুবা', 'কালিয়া', 'দিওয়ার', 'কভি কভি', 'খুদা গাওয়া'—তার সুপারহিট ছবির নামের লিস্ট শেষ হওয়ার নয়। যত বয়স বেড়েছে তত সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে বদলেছেন। নিজেকে সমকালীন করেছেন। তার অভিনীত 'সরকার', 'বাগবান', 'চিনি কম', 'পিকু' বা 'পিঙ্ক'-এর মতো ছবিও হালের যুগে সুপারহিট হয়েছে।

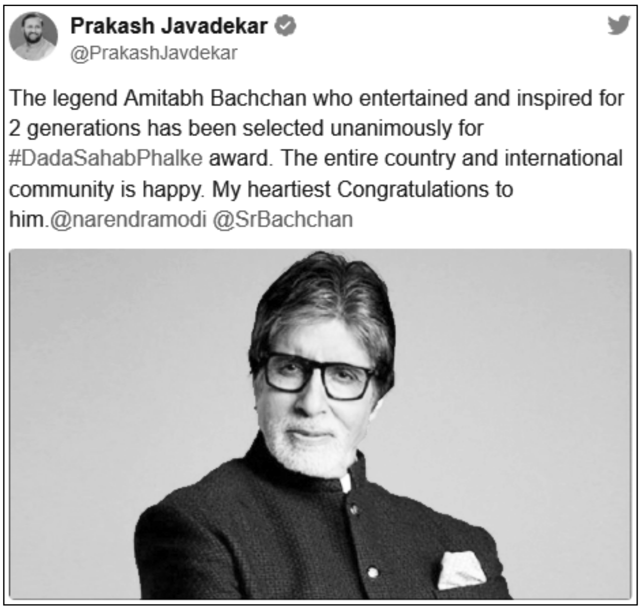

২০১৭ সাল পর্যন্ত (অর্থাৎ এখনও অবধি) ভারতীয় চলচ্চিত্রের ৪৯ জনকে এই দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আর সেই সব অভিনেতাদের তালিকায় রয়েছে পৃথ্বীরাজ কাপুর যিনি ১৯৭১ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০০৫ সালে চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগাল এবং ২০০৭ সালে গায়ক মান্না দে পেয়েছিলেন এই দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। ২০১৪ সালে শশী কাপুর এবং ২০১৭ সালে বিনোদ খান্নাকে এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল।❑

ছবির সূত্র : শ্রী প্রকাশ জাভড়েকরের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই সময় ও আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(সেপ্টেম্বর ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

➢ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লোগোয় গান্ধীজীর চশমাটি নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনের অংশ হিসেবে ভারতের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হল গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের। সেখানে প্রতিবেশী দেশ-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবেশনে নেতৃত্ব দিলেন মোদী। স্বচ্ছ ভারত থেকে প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে গণআন্দোলনের সরকারি প্রকল্পগুলির সঙ্গে গান্ধী দর্শনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সংযুক্ত করা গেল। এই অনুষ্ঠানের পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মূল ভবনেই উপস্থিত বাংলাদেশ, কোরিয়া, জামাইকা, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতাও সারলেন মোদী।

➢ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনের ফাঁকে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ঋণের পাশাপাশি ওই রাষ্ট্রগুলির অসমাপ্ত প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার জন্য পৃথকভাবে আরও আর্থিক সাহায্যের ঘোষণাও করেছেন তিনি। এই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন এই দেশগুলির বহুপাক্ষিক বৈঠক হল নিউ ইয়র্কে। মোদীর কথায়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলি আমাদের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে ভারত; এটা আমাদের 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস' নীতির অঙ্গও বটে। বৈঠকে ছিলেন ফিজি, পাপুয়া নিউগিনি, টোঙ্গা-সহ বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রগুলির শীর্ষ প্রতিনিধিরা।

➢ ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রৌহানির সঙ্গে বৈঠক সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগ দিতে মার্কিন মুলুকে গিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। তাদের বৈঠকের পর এদিন প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে ট্যুইট করে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের বৈঠকে দু'দেশের উন্নয়নমূলক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতে তেল রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ইরান তৃতীয়।

● **রাশিয়া-ভারত সম্পর্ক :**

প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় ইনিংসে রাশিয়ার সঙ্গে পুরনো মৈত্রী নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন নরেন্দ্র মোদী। 'ইস্টার্ন ইকনমিক ফোরাম'-এ প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, রাশিয়াকে ১০০ কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ দেবে ভারত। ভ্লাদিভস্তকে আয়োজিত 'ইস্টার্ন ইকনমিক ফোরাম'-এ আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, রাশিয়ার তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে ভারতীয় সংস্থাগুলি। শক্তি, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে রুশ সংস্থাগুলি ভারতে বিনিয়োগ করবে। মোদী বলেন, রাশিয়ার উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নিতে চায় ভারত; রাশিয়ার পূর্ব অংশের উন্নয়নে ভারত ১০০ কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ দেবে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এত দিন ভারতের নীতি ছিল 'অ্যাক্ট ইস্ট', এবার তাহল 'অ্যাক্ট ফার ইস্ট'। অর্থাৎ, পূর্ব থেকে আরও গভীর পূর্বের দিকে নজর দেবে দিল্লি।

প্রসঙ্গত, পঞ্চম ইস্টার্ন ইকনমিক ফোরামে প্রধান অতিথি ভারত। মস্কোতে গিয়ে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারতে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে তার সরকারের নয়া মন্ত্র 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এদিনও শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর দাবি এই বিকাশ শুধু ভারতবর্ষকেন্দ্রিক নয়। মিত্রশক্তির বিকাশও সুনিশ্চিত করতে চান তিনি। সেই কারণেই ঋণদানের এই উদ্যোগে আগ্রহ ভারতের।

● **বসবাস করার পক্ষে বিশ্বে সবচেয়ে ভালো শহর ভিয়েনা :**

দ্য ইকনোমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের বিচারে আবার বসবাস করার পক্ষে বিশ্বে সবচেয়ে ভালো শহরের স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিয়ে গেল ভিয়েনা। পরপর দু'বার এই স্বীকৃতি পেল আস্ট্রিয়ার রাজধানী। দুইয়ে রইল মেলবোর্ন। যারা এর আগে টানা সাতবার ছিল বিশ্বের শীর্ষে। সেরা ১৪০ শহরের তালিকায় ভারতের দু'টি শহরই জায়গা পেয়েছে। নয়াদিল্লি ক্রাইম ও দূষণের জন্য গতবারের তুলনায় ছয় ধাপ নেমে এবার ১১৮-তে। মুম্বই দু'ধাপ নেমে ১১৯। সেখানে নিচে নামার কারণ দেখানো হয়েছে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। তালিকায় লন্ডন ৪৮ নম্বর, নিউ ইয়র্ক ৫৮ নম্বরে। আমেরিকান শহরের মধ্যে হনলুলু সবার আগে, ২২ নম্বরে। প্রথম চল্লিশে রয়েছে আটলান্টা, পিটসবার্গ, সিয়াটল, ওয়াশিংটন। শিকাগো ৪১ নম্বরে। সিঙ্গাপুর ৪০ নম্বরে। দুবাই ৭০ নম্বরে। পরিবেশ, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, শিক্ষা খতিয়ে দেখে এই তালিকা তৈরি হয়। সেরা এগারো শহরের তালিকা এ রকম : (১) ভিয়েনা, (২) মেলবোর্ন, (৩) সিডনি, (৪) ওসাকা, (৫) কালগারি, (৬) ভ্যাঙ্কুভার, (৭) টরন্টো, (৮) টোকিও, (৯) কোপেনহাগেন, (১০) অ্যাডিলেড, (১১) জুরিখ। তালিকায় অস্ট্রেলিয়া, কানাডার জয়জয়কার। সবচেয়ে খারাপ শহরের তালিকায় এক নম্বর দামাস্কাস। তারপর রয়েছে লাগোস, ঢাকা,

ত্রিপোলি, করাচি, পোর্ট মোরেসবাই (পাপুয়া নিউ গিনি), হারারে, দৌয়ালা (ক্যামেরুন), আলজিয়ার্স, কারাকাস।

● **ব্রিটেনে রাজনৈতিক টানাপোড়েন :**

হাউস অব কমন্সে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে প্রথমবার ভোটাভুটির মুখে লজ্জাজনকভাবে হারতে হল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে। আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্রেক্সিট পিছিয়ে পার্লামেন্টে বিল আনতে ভোটাভুটি হয়েছিল। নিজের দল কনজারভেটিভ পার্টির ২১ এমপি-কে বরখাস্ত করার হুমকি দিয়েও সুরাহা হল না বরিসের। বিরোধী দলের সঙ্গে মিলে বিদ্রোহী কনজারভেটিভ সদস্যেরা সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে ৩২৮-৩০১ ভোটে জিতে গেলেন। আর এর পরের দিন চুক্তিহীন ব্রেক্সিট রুখতে বিরোধীরা বিল আনলে তার সমর্থনে ভোটাভুটিতেও হেরে যান বরিস। এবার ৩২৯-৩০০ ভোটে।

এর পর আবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বড়ো ধাক্কা খেলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। পাঁচ সপ্তাহের জন্য পার্লামেন্টের অধিবেশন সাসপেন্ড করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন জনসন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জনসনের সেই ঘোষণাকে, 'অবৈধ' বলে জানাল ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট। বাতিল করে দিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সেই নির্দেশ। ব্রেক্সিটের চূড়ান্ত সময়সীমার প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টের অধিবেশন পাঁচ সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এ দিনের শুনানিতে ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট ব্রেন্ডা হেল বলেন, নির্দেশটি (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর) অন্তঃসারশূন্য; তাই সেটি আর কার্যকর হবে না।

কেন প্রধানমন্ত্রী জনসনের নির্দেশটিকে বাতিল করা হল, তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট। বলেছেন, ওই ঘোষণাটি আইনবিরুদ্ধ ছিল। তার ফলে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই সাংবিধানিক কর্তব্যপালন থেকে পার্লামেন্টকে বাধা দেওয়া হ'ত। তাতে পার্লামেন্টের সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়তেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে বাতিল করার অর্থ যে, নির্ধারিত সূচি মেনেই পার্লামেন্টের অধিবেশন চলবে, সেকথাও তার রায়ে স্পষ্ট করে দেন ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট। ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট এই রায় ঘোষণা করার পরের দিনই ফের পার্লামেন্ট বসল। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশন ছেড়ে মাঝপথেই দেশে ফিরে আসতে হল প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে।

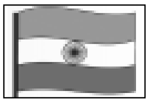

জাতীয়

➤ দেশের ২৬-তম বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে গত ৩০ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এয়ার চিফ মার্শাল রাকেশকুমার সিং ভাদৌরিয়া। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এয়ার চিফ মার্শাল বি. এস. ধানোয়ার স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। বায়ুসেনায় ৪১ বছরের চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করলেন এয়ার চিফ মার্শাল ধানোয়া।

● **প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তেজসে রাজনাথ সিং :**

দেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজসে উড়লেন রাজনাথ সিং। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বেঙ্গালুরুতে হ্যালের এয়ারপোর্ট থেকে তেজসে চাপেন তিনি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তার বিমানে চড়ার ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার হয়। এর দিন দুয়েক আগেই ঘোষণা করা হয় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী তেজসে চড়বেন। সেই মতো দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি এই হাল্কা যুদ্ধবিমান তেজস তৈরি, রাখা হয় বেঙ্গালুরুতে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্যাল লিমিটেড (হ্যাল)-এর রানওয়েতে। এদিন তেজসে ওড়ার পর বেঙ্গালুরুতে ডিআরডিও-র এক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন রাজনাথ। এর আগের সপ্তাহে গোয়ায় সফল অ্যারেস্ট ল্যান্ডিং করে তেজস। নামার পর দ্রুতগতি কমিয়ে থেমে যাবে বিমানটি। এর ফলে খুব ছোটো রানওয়েতেই নামতে পারবে।

ভিডিয়োতে দেখা যায়, রাজনাথ সিং বিমান ওড়ানোয় সি-স্যুট পরে সিঁড়ি বেয়ে তেজসে উঠছেন। বিমানের পিছনের আসনে তাকে অক্সিজেন মাস্ক, হেলমেট ও অন্যান্য সরঞ্জামেসজ্জিত হয়ে বসতে সাহায্য করেন বায়ুসেনার অধিকারিকরা। আসনে বসার আগে হাত নাড়েন উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে। বিমানের সামনের আসনে ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক সিনিয়র পাইলট। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সিনিয়র পাইলট যোগ দেওয়ার পর বিমান রানওয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। উড়ে যায় আকাশে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রায় ৩০ মিনিট আকাশে ছিলেন। তেজস থেকে নেমে নিজের অনুভূতির শেয়ার করেছেন ট্যুইটারে। লিখেছেন, তেজসে ওড়ার এই অভিজ্ঞতা অনন্য, অসাধারণ। তেজস ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মত প্রকাশ করেছেন রাজনাথ সিং।

● **নতুন রাজ্যপাল পাঁচ রাজ্যে :**

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ পাঁচটি রাজ্যের জন্যে নতুন রাজ্যপালের নাম ঘোষণা করলেন। তমিলিসাই সৌন্দররাজন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বান্দারু দত্তাত্রেয়, কলরাজ মিশ্র, আরিফ মহম্মদ খান ও ভগত সিং কোশারি; এই পাঁচজন রাজ্যপাল হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাচ্ছেন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শুধু নতুন রাজ্যপাল নিয়োগই নয়, বদলিও হচ্ছে। তেলেঙ্গানার নতুন রাজ্যপাল তমিলিসাই সৌন্দররাজন বরাবরই তামিলনাড়ু বিজেপি-র প্রধান মুখ। তমিলিসাই সৌন্দররাজনই নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার প্রথম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন। বান্দারু দত্তাত্রেয় হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রর স্থলাভিষিক্ত হবেন। কলরাজ মিশ্রকে রাজস্থানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পি. সদশিবনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় কেরলের রাজ্যপাল নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খান। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল নিযুক্ত হচ্ছেন ভগত সিং কোশারি। আরিফ মহম্মদ খান শাহ বানু মামলার সময়ে রাজীব গান্ধীর সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন। বর্তমান সরকারর তিনি তালাক বা কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের মতো সিদ্ধান্তগুলিকে আগাগোড়া সমর্থন জানিয়ে এসেছেন তিনি।

● **অনলাইন ভোটার তালিকা :**

ভোটার তালিকায় নামের বানান বা বয়স ভুল কিংবা ছবির গোলমাল এখন ঘরে বসেই ভোটার সংশোধন করতে পারবেন। ভোটার তালিকায় থাকা ঠিকানা বদল করতে চাইলেও সম্ভব হবে নির্বাচন কমিশনের নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে। শুধু একটা অ্যানড্রয়েড মোবাইল থাকলেই হল। পয়লা সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে নির্বাচন কমিশনের এই নয়া কর্মসূচি 'ইলেকর্টস ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম'। চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

মোবাইল অ্যাপ বা এনভিএসপি পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করুন কমিশনের ভোটার তালিকা। অ্যাপ থেকে ভোটার তালিকায় গিয়ে নিজের পরিবারের নাম দেখে নিন। যেখানে ভুল থাকবে সেখানেই ক্লিক করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইল স্ক্রিনে ফুটে উঠবে নির্দিষ্ট ফর্ম। ওখানেই তা পূরণ করুন। এই ত্রুটির সমর্থনে উপযুক্ত নথি মোবাইলে স্ক্যান করে ওই ফর্মের সঙ্গে যুক্ত করুন। এরপর সাবমিট করে দিন।

পরিবারের কেউ মারা গেলে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিয়ে ওই অ্যাপের মাধ্যমেই ভোটার তালিকা থেকে তাকে বাদ দেওয়া যাবে। একইভাবে ভোটার তার পরিবারের নতুন কারও নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদনও জানাতে পারবেন।

যাদের অ্যানড্রয়েড মোবাইল নেই, তাদের জন্য ভোটার সহায়ক কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে কমিশন। ব্লক অফিস, মহকুমাশাসকের অফিস বা জেলাশাসকের অফিসে খোলা হচ্ছে এই কেন্দ্র। সেখানেও গিয়েও একইভাবে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিয়ে ভোটার তালিকায় থাকা নিজের বা পরিবারের কারও ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া যাবে। টোল-ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করলেও জানতে পারবেন এই সহায়ক কেন্দ্রের অবস্থান। এইসব পরিবর্তিত তথ্য নির্বাচন কমিশনের বুথ স্তরের আধিকারিকেরা পরে প্রয়োজনমতো আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে যাচাই করে নেবেন।

● **সংশোধিত ইউএপিএ-তে প্রথম জঙ্গি ঘোষণা :**

আইন সংশোধন হয়েছে প্রায় এক মাস আগে। সেই নতুন 'আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট' (ইউএপিএ)-এ এই প্রথম চারজনকে 'ইন্ডিভিজুয়াল টেররিস্ট' বা স্বকীয় 'জঙ্গি' ঘোষণা করল ভারত। দাউদ ইব্রাহিম, হাফিজ সইদ, জাকিউর রহমান লকভি এবং মাসুদ আজহারদের জঙ্গি ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত ৪ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই মর্মে গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। যেহেতু জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত, তাই শুধু তাদের সংগঠন নয়, ব্যক্তিগতভাবেও তারা 'জঙ্গি'—বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে কেন্দ্র।

গত ২ আগস্ট রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল ইউএপিএ সংশোধনী। নয়া এই আইনে শুধু সংগঠন নয়, কোনও ব্যক্তি জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, নির্দিষ্ট করে সেই ব্যক্তিকে জঙ্গি ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই আইনেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, এই চারজনই জঙ্গি কার্যকলাপ, সন্ত্রাসবাদ প্রচার করা, জঙ্গি দলে লোক নিয়োগ করা, বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করে ভারত। কেউ কেউ আবার জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও মাথা। সেই কারণেই চারজনকে চঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করা হল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে চারজনের বিরুদ্ধেই কী ধরনের অভিযোগ রয়েছে, কোন কোন নাশকতা বা জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত জঙ্গি তালিকাতেও রয়েছে।

মাসুদ অজহার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে জঙ্গি দলে নিয়োগের কাজে যুক্ত। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে যেসব বক্তব্য পেশ করে মাসুদ আজহার, সেগুলি উগ্র ভারতবিরোধী আতঙ্কবাদে উৎসাহ দেয় এবং সেই কাজকে সমর্থন করে। পাঠানকোটে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে জঙ্গি হানায় তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে এনআইএ। পাক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা এবং জামাত-উদ-দাওয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও মাথা হাফিজ সইদ। ২০০০ সালে লালকেল্লায় হামলা, ২৬/১১ মুম্বই হামলা, উধমপুরে বিএসএফ-এর কনভয়ে হামলা-সহ একাধিক জঙ্গি হানার মাস্টারমাইন্ড। এইসব ঘটনায় অভিযুক্ত লস্কর-ই-তৈবার চিফ অপারেশনাল কম্যান্ডার জাকিউর রহমান লকভিও। তাকেও জঙ্গি ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের ঘোষিত জঙ্গি তালিকায় নাম রয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমেরও। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক একটি অপরাধচক্র চালায় দাউদ ইব্রাহিম কাসকর। ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসের পরিকল্পনা, মদত ও অর্থের জোগান দেওয়া, অস্ত্র চোরাচালান, জাল নোট পাচার, টাকা ও মাদক পাচার, তোলাবাজি, বেনামে সম্পত্তি কেনা-বেচা, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের খুনের চক্রান্ত, সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়ানোর মতো বহু অভিযোগ আনা হয়েছে ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্ত দাউদের বিরুদ্ধে।

● **নির্বাচন ও উপনির্বাচন :**

আস্থাভোটের আগে দল বদলের অভিযোগে বিধানসভার সদস্যপদ খারিজ হয়েছিল কর্ণাটকের ১৭ জন বিধায়কের। দু'টি আসন ঘিরে আইনি জটিলতা থাকায় বাকি ১৫-টি আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। কর্ণাটক-সহ গোটা দেশের ৬৪-টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে ২১ অক্টোবর। ফল ঘোষণা হবে ২৪ অক্টোবর।

নভেম্বরের প্রথম দিকেই শেষ হচ্ছে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভার মেয়াদ। তার আগে, গত ২১ সেপ্টেম্বর দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। একই দিনে ভোট হবে দুই রাজ্যে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানান, এই দুই রাজ্যেও আগামী ২১ অক্টোবর বিধানসভা নির্বাচন হবে। ভোট গণনা হবে ২৪ অক্টোবর। হরিয়ানা বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২ নভেম্বর। তার কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ, ৯ নভেম্বর বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে মহারাষ্ট্রে।

মহারাষ্ট্রে মোট আসন রয়েছে ২৮৮। হরিয়ানা বিধানসভায় আসন সংখ্যা ৯০। দুই রাজ্যেই অবশ্য এক দফাতেই ভোট হচ্ছে। দু'টি রাজ্যেই এই মুহূর্তে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। হরিয়ানায় এককভাবে এবং মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় রয়েছে তারা।

● **ই-সিগারেটে নিষেধাজ্ঞা :**

কেন্দ্র সরকার গত ১৯ সেপ্টেম্বর ই-সিগারেট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, ই-সিগারেট বন্ধে অধ্যাদেশ জারি হবে। দেশে ই-সিগারেটের ব্যবসা, বিক্রি বা বিপণন করলে প্রথমবার অপরাধে এক বছরের জেল বা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা দু'টি শাস্তিই হতে পারে। দ্বিতীয়বার ওই অপরাধ করলে সাজা হতে পারে ৩ বছর জেল ও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

● **সুপ্রিম কোর্ট তফসিলি আইনকে লঘু করা নিয়ে ক্ষুব্ধ :**

তফসিলি জাতি ও জনজাতি (নির্যাতন প্রতিরোধী) আইনকে লঘু করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে গত ১৮ সেপ্টেম্বর তুলোধোনা করল সর্বোচ্চ আদালতই। ওই রায় সংবিধানের মূল সুরের পরিপন্থী বলে বর্ণনা করে বিচারপতি অরুণ মিশ্র, বিচারপতি এম. আর. শাহ এবং বিচারপতি বি. আর. গাভানির বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও আমরা তফসিলি জাতি ও জনজাতির মানুষদের প্রতি 'বৈষম্য' এবং 'অস্পৃশ্যতা' দূর করতে পারিনি। ২০১৮-র ২০ মার্চের ওই রায়ের বিরুদ্ধে এদিন তিন বিচারপতির বেঞ্চ কোনও রায় না দিলেও সমালোচনায় ফালাফালা করেছে ওই রায়কে।

গত বছরের ওই রায়ের পরে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। আন্দোলনে নামেন তফসিলি ও দলিতেরা। চাপে পড়ে সেই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে মামলা করে কেন্দ্র। ১৮ মাস আগে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট মামলা শোনার জন্য তিন বিচারপতির এই বেঞ্চ গড়ে দেন। বিচারপতিরা এদিন শুনানির পরে রায়দান স্থগিত রাখলেও তফসিলিদের স্বার্থরক্ষায় বেশকিছু ব্যবস্থা প্রণয়নের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আগের রায়ে বলা ছিল, এই আইনে কেউ মামলা করতে গেলে পুলিশ আগে তদন্ত করে তার সত্যাসত্য যাচাই

করবে। এদিন নতুন বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট বাদীপক্ষকে নতুন করে আবেদনের নির্দেশ দিয়েছে।

- **জনগণনা ২০২১ :**

শুরু হতে যাচ্ছে ২০২১ সালের আদমশুমারি। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর। এবারের আদমশুমারি প্রক্রিয়ার নানা খুঁটিনাটি—

ডিজিটাল : এই প্রথমবার ভারতে জনগণনায় কোনও কাগজ ব্যবহার হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন যে ২০২১-এর আদমশুমারি করা হবে ডিজিটাল উপায়ে, একটি অ্যাপ-এর মাধ্যমে। তবে খরচ যদিও বাড়ছে বহু গুণ। ২০১১-র আদমশুমারিতে খরচ হয়েছিল ২২০০ কোটি টাকা, ২০২১-এ সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ ১২০০০ কোটি টাকা, দশ বছরে ৪৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি।

গোপনীয়তা : সেন্সাস অ্যাক্ট অব ইন্ডিয়া অনুযায়ী প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও এটি তথ্যের গোপনীয়তা সুনিশ্চিত করে। এই আইন অনুসারে, কোনও ব্যক্তির দেওয়া তথ্য প্রকাশ করা যাবে না এবং আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবেও পরিগণিত হবে না।

তারিখ : প্রত্যেক জনগণনায় একটি 'রেফারেন্স ডেট' থাকে, যাতে সেই সুনির্দিষ্ট সময়ের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। ২০২১ জনগণনায় জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের জন্য সেই তারিখটি হল ২০২০-র ১ অক্টোবর। বাকি দেশের জন্য ২০২১-এর ১ মার্চ। অর্থাৎ, এই তারিখের পরে কেউ জন্মালে বা এই তারিখের আগে কেউ মারা গেলে তার নাম গণনায় অন্তর্ভুক্তি হবে না।

তথ্য সংগ্রাহক : সহজে সারা দেশকে গণনার আওতায় আনার জন্য তথ্য-সংগ্রাহকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। ১৯৮১-তে ছিল ১২ লক্ষ তথ্য-সংগ্রাহক। ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬ লক্ষ, ২০ লক্ষ এবং ২৭ লক্ষ। ২০২১-এর জনগণনায় সেটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে ৩৩ লক্ষ।

পর্altBিভাগ : গণনার প্রথম পর্বে বাড়ি-ঘরের হিসেব নেওয়া হবে, যা সাধারণত জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহের ছ'মাস আগে থেকে করা হয়। তারপর আসবে মানুষ-গণনার পালা। বাড়িসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সময় সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার হবে, দেখা হবে বাড়িতে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে, কী দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়েছে ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বে দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি সংগৃহীত হবে, তিনি ভারতীয় নাকি বিদেশি ইত্যাদি।

সীমানা : জনগণনা শুরু হওয়ার আগে বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা বেঁধে দেওয়া হবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করা হবে তারা যেন তার কোনও পরিবর্তন না করে। এটি তথ্য সংগ্রাহকদের সুবিধার্থে করা হয়, যেন তাদের কাছে একটি নির্ভুল মানচিত্র থাকে এবং একই এলাকা থেকে একাধিকবার তথ্য সংগ্রহ করা না হয়।

বহুভাষিক : ষোলটি ভাষায় জনগণনা সম্পন্ন হবে। ২০১১ সালেও ষোলটি ভাষাতেই হয়েছিল। ২০১১-র জনগণনায় স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ছিল ১২১-টি এবং মাতৃভাষার সংখ্যা ১৯,৫৬৯।

এক দশক আগের জনগণনা থেকে উঠে আসা কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য :

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী কোন রাজ্যের জনসংখ্যা কমেছে?
নাগাল্যান্ড। এই রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার –০.৫৮ শতাংশ।

❖ ২০১৯-র আদমশুমারি অনুযায়ী কোন রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক?
মেঘালয়। এই রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৭.৯ শতাংশ।

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
১৭.৭১ শতাংশ।

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১১-র মধ্যে কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যা সব থেকে দ্রুত হারে বেড়েছে?
দাদরা ও নগর হাভেলি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫৫.৮৮ শতাংশ। এর পরেই আছে দমন ও দিউ।

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী কোন রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে কম?
কেরালা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪.৯১ শতাংশ।

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী কোন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সমান বা কাছাকাছি?
চণ্ডীগড়, উত্তরাখণ্ড, আসাম। তিনটিতেই এই হার ১৭ শতাংশের কাছাকাছি।

❖ ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সব থেকে কম?
লাক্ষাদ্বীপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ।

❖ ভারতের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ উত্তরপ্রদেশে বাস করে?
১৬ শতাংশ।

- **৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্যান-আধার সংযুক্তিকরণ :**

প্যান ও আধার সংযুক্তিকরণের সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্যান ও আধার সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক হল। গত ২৮ সেপ্টেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এই নিয়ে মোট সাতবার আধার ও প্যান সংযুক্তিকরণের সময়সীমা বাড়াল কেন্দ্র। এর আগে, এবছরই মার্চ মাসে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছ'মাসের জন্য সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আধার আইনের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। গত বছর সেই নিয়ে শুনানিতে আধার প্রকল্পকে বৈধ ঘোষণা করে শীর্ষ আদালত। জানিয়ে দেওয়া হয়, আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করতে হলে আধার নম্বরের উল্লেখ বাধ্যতামূলকই থাকবে।

তবে সম্প্রতি সংসদে বাজেট পেশ করার সময় সরকার জানিয়ে দেয়, আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্যানের পরিবর্তে শুধুমাত্র আধার নম্বর দিলেই চলবে। আর আধার সংযুক্ত হলে আপনা-আপনিই প্যান নম্বর হাতে চলে আসবে বলে জানানো হয় কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ বোর্ডের তরফে।

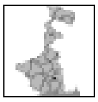

পশ্চিমবঙ্গ

➢ পদ্ধতিগত বিতর্ক থাকলেও বিনা বিরোধিতায় বিধানসভায় পাস হয়ে গিয়েছে গণপ্রহার প্রতিরোধ বিল। গণপ্রহার প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের প্রাথমিক বিলে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানার কথা ছিল। কিন্তু যে বিল পেশ ও পাস

হয়েছে, তাতে শেষ মুহূর্তে প্রাণদণ্ডের সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকার পক্ষের বক্তব্য, গণপ্রহার ঘিরে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাকে কড়া হাতে মোকাবিলার জন্যই প্রাণদণ্ডের সংস্থান রাখা হয়েছে।

● **বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেউচা-পাচামি খনি :**

অবশেষে বীরভূমের দেউচা-পাচামি কয়লা খনির কাজ শুরুর বিষয়ে সবুজ সংকেত দিল কেন্দ্র সরকার। গত ১১ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খনি থেকে উৎপাদন শুরু হলে আগামী ১০০ বছর পশ্চিমবঙ্গে আর কয়লার ঘাটতি হবে না। একইসঙ্গে আগামীদিনে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

২০১৫ সালে মোট ১৭-টি কয়লা ব্লককে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের তরফ থেকে বণ্টন করা হয়। যার মধ্যে দেউচা-পাচামি কয়লা খনিও রয়েছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি। সেখানে ২১০২ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দেউচা-পাচামি খনিকে ঘিরে আগামীদিনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা হাব গড়ে উঠবে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে মোট ১২ হাজার কোটি টাকা লগ্নি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ওই খনিতে ২০০ মিলিয়ন টনের বেশি কয়লা আছে, যা রাজ্যের চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ওই কয়লা ব্লক প্রকল্প ১১,২২৫.৫ একর জমিতে গড়ে ওঠার কথা। তার প্রায় ২,০০০ একরই খাস। রায়ত জমি প্রায় ৯,০০০ একর। এছাড়া রয়েছে বনাঞ্চল।

প্রায় ১২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত দেউচা-পাচামি কোল ব্লক এলাকায় প্রায় ৪০০ পরিবারের বসবাস। এদের অধিকাংশই আদিবাসী। এই সমস্ত বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের পরই সেখানে খনির কাজ শুরু হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। দেউচা-পাচামি কয়লা ক্ষেত্রটি চালু হতে ৫ বছর সময় লাগবে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন; তবে এটি চালুর পরে রাজ্যের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

● **হস্তশিল্পীদের আয় বৃদ্ধি :**

বছর ছয়েক আগে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী ১০-টি হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসারে 'রুরাল ক্রাফট হাবস' (আরসিএইচ) প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্যের অতিক্ষুদ্র-ছোটো-মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) দপ্তর। ২০১৬ সালে যার আওতায় ঠাঁই পায় কিছু লোকশিল্পও। রাজ্যের দাবি, এই পথে হেঁটে ইতোমধ্যেই হস্ত ও লোকশিল্পীদের আয় বেড়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসব প্রকল্প ঘিরে তৈরি হচ্ছে পর্যটন ব্যবসারও নতুন সূত্রও।

রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রের দাবি, ৩,০০০ থেকে বেড়ে হস্ত ও লোকশিল্পীর সংখ্যা এখন ২৫,০০০। তাদের প্রত্যেকের আয়ও আগের তুলনায় গড়ে ১৪ গুণ বেড়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ৩৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। ব্যবসার মোট পরিমাণ এখন ১০০ কোটি টাকারও বেশি। আগামী দু'বছরে তা ২০০ কোটিতে নিয়ে যেতে হবে। ১০-টির মধ্যে আটটি হস্তশিল্প ভৌগোলিক স্বীকৃতি (জিয়োগ্রাফিকাল আইডেন্টিফিকেশন বা জিআই) পেয়েছে।

আর ভারতে ইউনেস্কোর ডিরেক্টর এরিক ফল্ট (নয়াদিল্লি অফিস) জানাচ্ছেন, এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ এবার পথ দেখাচ্ছে অন্য রাজ্যকেও। যেমন, রাজস্থানের স্থানীয় হস্ত ও লোকশিল্পের প্রসারে এবার সেখানে এই প্রকল্প চালুর জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন তারা। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটনকেও জুড়তে চাইছে রাজ্য। অমিতবাবু জানান, আরসিসিএইচগুলিতে দিনে গড়ে ১.২০ লক্ষ পর্যটক ঘুরতে গিয়েছেন।

২০১৩ সালে রাজ্যে ১০-টি আরসিএইচ গড়ার পরিকল্পনা নেয় ছোটো-মাঝারি শিল্প দপ্তর। যন্ত্রাংশ-সহ পরিকাঠামো গড়ার ভার দপ্তরের খাদি বোর্ডের উপর। আর শিল্পীদের প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্ব ছিল ইউনেস্কোর। প্রায় ৩,০০০ হস্তশিল্পী তাতে যুক্ত হন। ২০১৬ সালে কিছু লোকশিল্পকেও যুক্ত করে আরসিএইচ-কে সম্প্রসারণ করে 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব' (আরসিসিএইচ) গঠনের পরিকল্পনা নেয় রাজ্য।

● **অনলাইন সাফল্য তন্তুজের :**

বাণিজ্যে এখন ডিজিটাল দুনিয়ার প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়ছে। ছোটো-বড়ো সব সংস্থাই চালু করেছে অনলাইন পোর্টাল। ব্যতিক্রম নয় রাজ্য সরকারি সংস্থা তন্তুজও। এই তন্তুজই একসময়ে লোকসানে নুইয়ে পড়েছিল। শেষ তিন বছরে তন্তুজের শুধু অনলাইন ব্যবসাই বেড়েছে ৮০০ গুণ। দেখা যাচ্ছে, তন্তুজ চলতি আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসেই ৫১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরের শুরুতে তন্তুজ অনলাইনে ৩২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩১৫ টাকার ব্যবসা করেছিল। ২০১৮-'১৯-এর আর্থিক বছরে অনলাইনে সংস্থার মোট ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৪০ টাকা। গত বছর তন্তুজ ২৫২ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে, লাভ হয়েছে ১৪ কোটি টাকা।

● **এসএসসি বিল পাস :**

আগের দিন যে প্রশ্নে আটকে গিয়েছিল স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, সেই প্রশ্ন খারিজ করেই বিধানসভায় দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাস হয়ে গেল সেই সংক্রান্ত বিল। সরকারি তরফে জানানো হল, দু'বছর আগের আইন বাতিল করে ২০১১ সালে এমএসসি গড়ার আইন যেহেতু পুনর্বহাল হচ্ছে, তাই বর্তমান বিলে আর নতুন করে আর্থিক দায়ভারের প্রসঙ্গ রাখার প্রয়োজন নেই।

'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন (রিপিলিং) বিল, ২০১৯' বিধানসভায় পেশ করে আলোচনার মাঝপথেই তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার পক্ষ। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল, আর্থিক দায়ভারের কথা বিলে নেই। একই বিল আবার পেশ হওয়ার পরে এদিন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই বিলে অর্থনৈতিক দায়ভার কিছু থাকছে না এবং সেই জন্য রাজ্যপালের সম্মতি নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। ২০১১ সালের বিলটিতেই রাজ্যপালের সম্মতি নেওয়া রয়েছে।

একবারের সিদ্ধান্ত বাতিল করার আইনকে আবার বাতিল করার ক্ষেত্রেও কোনও আইনি বাধা নেই বলে আইনমন্ত্রী জানান। তার কথায়, কী উদ্দেশ্য, তা বলা থাকলে পুরনো বিলেই কাজ হয়ে যায়; ফলে বিলটি বৈধ। বিলটি সম্পর্কে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের (এজি) লিখিত বক্তব্যও বিধানসভায় পড়ে শোনান আইনমন্ত্রী। সরকারি মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের আনা সংশোধনী গ্রহণ করে সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এসএসসি না থাকাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবই ২০১১ সালের এসএসসি আইনের এক্তিয়ারভুক্ত করা হবে।

● **নয়া ৩ বিদ্যুৎ সাবস্টেশন :**

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহণ সংস্থা বা ডব্লিউবিএসইটিসিএল-এর কাছ থেকে ৯০ কোটি টাকা কাজের বরাত পেয়েছে জিইটি অ্যান্ড ডি ইন্ডিয়া লিমিটেড। তারা রামনগর, মানবাজার ও বিড়লাপুরে তিনটি নয়া বিদ্যুতের সাবস্টেশন গড়ে তুলবে। এছাড়া হুরান্ড, শিরাকোল ও ইন্দাসে তিনটি সাবস্টেশনের সম্প্রসারণও করবে। গত ৪ সেপ্টেম্বর এই ঘোষণা করেছে জিইটি অ্যান্ড ডি ইন্ডিয়া লিমিটেড। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে এই সংস্থাটি। জিইটি অ্যান্ড ডি ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল ওয়াধা বলেন, ডব্লিউবিএসইটিসিএল-এর সঙ্গে তাদের ৩০ বছরের সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে তারা গর্বিত। জিইটি অ্যান্ড ডি ইন্ডিয়া লিমিটেড ডব্লিউবিএসইটিসিএল-কে অত্যাধুনিক গ্রিড প্রযুক্তি দিচ্ছে, যাতে তারা বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা সাফল্যের সঙ্গে পূরণ করতে পারে। এই নয়া তিন সাবস্টেশন গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে সহায়তা করবে।

● **'ইনস্টিটিউশন অব এমিনেন্স' খড়্গপুর আইআইটি :**

শিক্ষক দিবসে 'ইনস্টিটিউশন অব এমিনেন্স (আইওই)' সম্মান পেল আইআইটি খড়্গপুর। এদিন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। আইআইটি খড়্গপুর ছাড়াও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটি মাদ্রাজকেও 'আইওই' সম্মান দিয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। গত আগস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর পক্ষ থেকে ওই পাঁচটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে এদিন এই ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক নামগুলি ঘোষণা করেন।

মাস সাতেক আগে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই সম্মান জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর পরে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। বেঁধে দেওয়া হয় মাপকাঠিও। সেই অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইআইটি খড়্গপুরও আবেদন জমা দিয়েছিল। তাতে অন্তত ৪০-টি প্রতিষ্ঠানের ৫ জন করে প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠায় মন্ত্রক। প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে সেখানে।

● **নয়া বিশ্ববিদ্যালয় :**

হাওড়ায় প্রস্তাবিত হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রয়োজনীয় আইন পাস হল রাজ্য বিধানসভায়। গত ৫ সেপ্টেম্বর সেই বিল নিয়ে আলোচনায় হাজির হয়ে সাঁওতালি ভাষায় আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিলটি পেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই বিলে বেশ কয়েকটি সংশোধনী দিয়েছিলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। শিক্ষামন্ত্রী তা গ্রহণ করেননি। মুন্সী প্রেমচন্দের নামে এই হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের দাবি করেন সুজনবাবু। সভায় উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হোক; পরে ঠিক করে নেব নাম কী হবে। সেই সূত্রেই তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সাঁওতালি ভাষাভাষীদের জন্য একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করবে।

● **জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধে দেশের প্রথম শিবির :**

পরাক্রমী ব্যাক্টিরিয়া-ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে কলকাতা থেকে জয়ের দিশা দেখাবেন গবেষকেরা। কলকাতার আইডি হাসপাতালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস (নাইসেড) চত্বরে তৈরি হয়েছে 'অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল হাব'। তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর-এর অধীন সেই হাবের উদ্বোধন হল গত ১৬ সেপ্টেম্বর। তিন লক্ষ্য হল গবেষণা, নীতি নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য ওষুধের দিশা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন আইসিএমআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য গবেষণা মন্ত্রকের সচিব ও চিকিৎসক বলরাম ভার্গব, ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ আই জাস্টার এবং স্বাস্থ্য গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

অর্থনীতি

- আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পুঁজির হাল ফেরাতে ৯,৩০০ কোটি টাকা ঢালার কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। এর মধ্যে ৪,৭৪৩ কোটি টাকা (প্রায় ৫১ শতাংশ) আসবে ব্যাঙ্কটির বৃহত্তম প্রোমোটার এলআইসি-র হাত ধরে। বাকি ৪,৫৫৭ কোটি জোগাবে কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ৭০,০০০ কোটি টাকা ঢালা হবে। তার পরেই এই ঘোষণা। কেন্দ্র জানিয়েছে, যে অঙ্কের পুঁজি ঢালা হবে তার সমান অঙ্কের রিক্যাপিটালাইজেশন বন্ড সরকারের কাছ থেকে কিনবে ব্যাঙ্কটি।
- গত ৩০ সেপ্টেম্বর সরকারি পরিসংখ্যান জানাল, আগস্টে আটটি প্রধান পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উৎপাদন সরাসরি কমে গিয়েছে ০.৫ শতাংশ। যে হার প্রায় সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম। এর আগে ২০১৫ সালে উৎপাদন কমেছিল ১.৩ শতাংশ। কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ—এই পাঁচটিতেই দেখা গিয়েছে সংকোচন। এর আগে জুলাইয়েও পরিকাঠামোয় বৃদ্ধির গতি কমেছিল, তবে তা সংকোচিত হয়নি। গত বছর আগস্টে তা বেড়েছিল ৪.৭ শতাংশ হারে।
- সরকারি পরিসংখ্যান জানাল, এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের প্রায় সব ধরনের কৃষিপণ্যের রপ্তানি ১৪.৩৯ শতাংশ কমেছে। ফলে রপ্তানির অঙ্ক নেমেছে প্রায় ৩৮,৭০০ কোটি টাকায়। এমনিতে বিদেশের বাজারে ভারতের সব চালেরই (বাসমতি ও অন্যান্য) যথেষ্ট কদর আছে। কেন্দ্রের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদ প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, ওই চার মাসে দু'ধরনের চালের রপ্তানিই কমেছে ৯.২৬ শতাংশ। বেশ খানিকটা মার খেয়েছে বাদাম, বিভিন্ন ধরনের মাংস, পোল্ট্রি ও দুগ্ধজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত ফল, আনাজের রপ্তানিও।

● **বিপুল সংখ্যায় আয়কর রিটার্ন জমা :**

আয়কর রিটার্ন জমা করার শেষ দিনে ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার রিটার্ন জমা পড়ায়, দৈনিক রিটার্ন জমার রেকর্ড হয়েছে বলে মনে করছেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর তরফে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, শুধু ৩১ আগস্ট, প্রায় ৫০ লক্ষ রিটার্ন ধরলে শেষ পাঁচ দিনে দেড় কোটি আয়কর রিটার্ন জমা পড়েছে সংস্থার সার্ভারে। তথ্য বলছে, এই ক'দিনের হিসেব বলছে, প্রতি সেকেন্ডে সর্বাধিক ১৯৬-টি, প্রতি মিনিটে ৭,৪৪৭-টি এবং ঘণ্টায় ৩,৮৭,৫৭১-টি রিটার্ন জমা পড়েছে সংস্থার সার্ভারে। যার ফলে সামগ্রিক হিসেবে চলতি অর্থবর্ষে আয়কর রিটার্ন জমার পরিমাণ ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের ৫.৪২ কোটি থেকে ৪ শতাংশ ছাপিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ৫.৬৫ কোটিতে। এর পাশাপাশি চলতি বছরে

আয়কর দপ্তরের সার্ভার দখল করে নেওয়ার হ্যাকারদের ২,২০৫-টি চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে।

- **নয়া ই-কমার্স বিধি :**

মরগ্যান স্ট্যানলির সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে ভারতে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে বিক্রির পরিমাণ প্রতি বছর গড়ে ১০ শতাংশ হারে বেড়ে আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে পৌঁছে যাবে প্রায় ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকায় (১ ডলার = ৭১.৪৯ টাকা)। কিন্তু সেই বিক্রির ভাঁড়ার ভরবে যে ক্রেতাদের পকেট থেকে, কার্যকর হতে যাওয়া নতুন ক্রেতা সুরক্ষা আইনে তাদের স্বার্থ সর্বতোভাবে দেখা হবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ওই আইন মানা সমস্ত ই-কমার্স সংস্থার জন্যই বাধ্যতামূলক থাকবে। যা ভাঙলে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া শাস্তি দেওয়া যায়, তার জন্য আলাদা করে একটি নিয়ামক সংস্থা গড়া হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই নতুন আইন দেশে কার্যকর করতে চাইছে কেন্দ্র। যে জন্য ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের থেকে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। একইভাবে ই-কমার্স সংস্থাগুলির জন্য যে নতুন আইনের খসড়া তৈরি হচ্ছে, সে সম্পর্কেও ওই একই দিনের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানাতে হয় সংস্থাগুলিকে।

আইনের খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে, তা কার্যকর হয়ে যাওয়ার পর দেশে ব্যবসা করা প্রত্যেকটি ই-কমার্স সংস্থাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, যে তারা সবাই ওই আইন মেনে চলবে। যার মধ্যে রয়েছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে টাকা ফেরৎ দেওয়া, পণ্য বিক্রি করা সংস্থার বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে নথিবদ্ধ রাখা, গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা-সহ একাধিক বিষয়। কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব অবিনাশ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, এইসব নিয়ম সংস্থাগুলি মানছে কি না, বা তা না মানলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা দিয়ে সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি গড়া হচ্ছে।

- **ঋণে সুদের নয়া পদ্ধতি :**

গত ৪ সেপ্টেম্বর শীর্ষ ব্যাঙ্ক বিজ্ঞপ্তিতে জানাল, পয়লা অক্টোবর থেকে সমস্ত নতুন ঋণের পরিবর্তনশীল সুদের হার (ফ্লোটিং রেট) স্থির করার নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে। যার মাধ্যমে রেপো রেট অথবা তৃতীয় কোনও মাপকাঠির (এক্সটার্নাল বেঞ্চমার্ক) ভিত্তিতে সুদ ঠিক করতে হবে তাদের। লক্ষ্য, রেপো রেট কমলে ঋণের সুদে তার সুবিধা দ্রুত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ইতোমধ্যেই অবশ্য বেশকিছু ব্যাঙ্ক রেপো রেটের সঙ্গে ঋণে সুদ যুক্ত করার পথে হেঁটেছে। শীর্ষ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে—

- ❖ নতুন অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) থেকে শুরু করে গৃহ, বাড়ি, ব্যক্তিগত ঋণ সবই আসবে এই নতুন পদ্ধতির আওতায়।
- ❖ রেপো রেট ছাড়াও ফিনান্সিয়াল বেঞ্চমার্কস ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তিন মাস ও ছ'মাসের সরকারি ঋণপত্রের (ট্রেজারি বিল) ইল্ড বা প্রকৃত আয়-সহ বিভিন্ন মাপকাঠি ঋণে সুদের হার স্থির করতে ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ ব্যাঙ্কগুলি চাইলে নির্দিষ্ট ঋণ ছাড়াও অন্যান্য ঋণে এই সুবিধা দিতে পারবে।
- ❖ অন্তত প্রতি তিন মাস অন্তর সুদের হার ফিরে দেখতে হবে তাদের।
- ❖ মাপকাঠির তুলনায় কত বেশি সুদ নেওয়া যাবে, তা ঠিক করবে ব্যাঙ্কই। ঋণে ঝুঁকির ভিত্তিতে হার স্থির হবে।
- ❖ বর্তমানে যে সমস্ত ঋণে তহবিল সংগ্রহের ভিত্তিতে সুদ স্থির হয় (এমসিএলআর) অথবা বেস রেটের ভিত্তিতে সুদ ঠিক করা হয়, তা চালু থাকবে (যত দিন না ঋণ শেষ হচ্ছে অথবা তা বদলানো হচ্ছে)।
- ❖ এক ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে কোনও ব্যাঙ্কে একটি মাপকাঠি ব্যবহার হবে।

- **১০০ লক্ষ কোটি লগ্নির লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্স :**

পরিকাঠামোর পোক্ত ভিত ছাড়া যে দীর্ঘমেয়াদে বৃদ্ধির চড়া হার ধরে রাখা অসম্ভব, তা বার বারই বলেছে কেন্দ্র। একই কারণে পাঁচ বছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে উঠতে আর্থিক ও সামাজিক পরিকাঠামো খাতে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নি জরুরি বলে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এবার সেই লগ্নি কোথা থেকে আসবে ও কোথায় ঢালা হবে, তা দ্রুত ঠিক করতে আর্থিক বিষয়ক সচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গড়ল কেন্দ্র। যাতে থাকছেন নীতি আয়োগের সিইও বা তার মনোনীত প্রতিনিধিও। ২০০৭-'০৮ থেকে ২০১৬-'১৭ সালের মধ্যে পরিকাঠামোয় মোট লগ্নি ছিল ১.১ লক্ষ কোটি ডলার। কিন্তু এবার পাঁচ বছরেই (২০১৯-'২০ থেকে ২০২৪-'২৫) তাতে ১.৪ লক্ষ কোটি ডলার (১০০ লক্ষ কোটি টাকা) ঢালার পণ করেছে কেন্দ্র।

- **শুল্ক-যুদ্ধের ধাক্কা দুনিয়াজুড়ে :**

চিন-মার্কিন শুল্ক যুদ্ধ বিশ্বের আর্থিক বৃদ্ধিকে ১ শতাংশ টেনে নামাতে পারে বলে সতর্ক করেছিল মার্কিন শীর্ষ ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের সমীক্ষা। একই পথে হেঁটে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও (আইএমএফ) জানাল, বাণিজ্য নিয়ে বৃহত্তম দুই অর্থনীতির দেশের মধ্যে সংঘাতের জেরে ২০২০ সালে বৃদ্ধি কমাতে পারে ০.৮ শতাংশ। যা তাদের গত বছরের ০.৫ শতাংশের পূর্বাভাসের তুলনায় বেশি। অবস্থা না বদলালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে অর্থ ভাণ্ডার। ২০১৯ সালের বিশ্বে বৃদ্ধির পূর্বাভাসও কমিয়ে ৩.৩ শতাংশ করেছে তারা। মন্দার পর থেকে যা সবচেয়ে কম।

আইএমএফ-এর মুখপাত্র জেরি রাইসের মতে, বাণিজ্য নিয়ে উত্তেজনা অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত উৎপাদন শিল্প যেভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে, তা ২০০৭-'০৮ সালে বিশ্ব মন্দার পরে দেখা যায়নি। ফলে অর্থনীতি ঘিরে আশঙ্কা আরও বাড়ছে। তবে আমেরিকার অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়বে না বলেই দাবি মার্কিন অর্থসচিব স্টিভেন মনুচিনের। এদিকে, চিন শুল্কের আওতার বাইরে ইতোমধ্যেই ১৬ ধরনের পণ্যে ছাড় দিয়েছে।

- **জিএসটি পরিষদের বৈঠক :**

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ জিএসটি পরিষদের বৈঠক শেষে ঘোষণা করলেন, দিনে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত হোটেল ভাড়ায় জিএসটি তো গুণতে হবেই না, পয়লা অক্টোবর থেকে তার বোঝা কমছে তুলনায় দামি হোটেল ঘরেও। ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়ায় কর ১৮ শতাংশ থেকে কমে হচ্ছে ১২ শতাংশ। আর ভাড়া ৭,৫০০ টাকা ছাড়ালে, ওই হার দাঁড়াবে ১৮ শতাংশ। আগে যা ছিল ২৮ শতাংশ। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কমছে সেখানে ক্যাটারিং-এ কর। জিএসটি থেকে পুরোপুরি ছাড় পাচ্ছে বাংলা শস্য বিমাও।

তবে তারই মধ্যে পর্যটন শিল্প-সহ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করতে জিএসটি দাওয়াই প্রয়োগ করতে চেয়েছে পরিষদ। যেমন, পালিশ করা

তুলনায় কম দামের পাথরে করের হার ৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ০.০২৫ শতাংশ। কিছু সুবিধা জুটেছে গয়না রপ্তানিকারীদের বরাতে। জিএসটি কমেছে হিরে, বাসের বডি তৈরির মতো বিভিন্ন শিল্পে বরাত নেওয়া কাজেও। আবার এই সমস্ত কর ছাঁটাইয়ের ফলে ধাক্কা খাওয়া রাজস্ব আদায়কে সামাল দিতে লাফিয়ে কর বেড়েছে ক্যাফেনযুক্ত পানীয়ে। বসেছে সেসও।

● **কর্পোরেট করে ছাড় :**

বাজারে লগ্নি টানতে ভারতীয় সংস্থাগুলিকে করের হারে ছাড়ের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। গত ২০ সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের আগে করা তার ঘোষণা অনুযায়ী, সমস্ত সারচার্জ ধরেই নতুন কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫.২ শতাংশ করা হয়েছে। কেউ অগ্রিম কর মেটালেও সেক্ষেত্রে নতুন হারে হিসাব করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার কথায়, নতুন কোম্পানিকে মিনিমাম অল্টারনেট ট্যাক্স বা ম্যাট দিতে হবে না। এছাড়াও, চলতি বছরের পয়লা অক্টোবর বা তারপরে তৈরি হয়েছে এমন সংস্থাকে ইনসেনটিভ ছাড়া ১৫ শতাংশ কর ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে এই নতুন কর ধার্য হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দেশীয় সংস্থার কর্পোরেট কর কমার ফলে বিনিয়োগ এবং আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়তে পারে বলে জানাল মূল্যায়ন সংস্থা ফিচ। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের সতর্কবার্তা, এই ধরনের ইতিবাচক ফলের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। বিনিয়োগ ও বিক্রিবাটা বাড়া এবং তার ফলে কর আদায় বৃদ্ধির জন্যও মধ্যমেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। ২০২০-'২১ এবং ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে ভালো হতে পারে বৃদ্ধির হার।

● **পিএফ-এ সুদের হার ৮.৬৫ শতাংশ :**

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের (ইপিএফও) আওতায় থাকা ৬ কোটিরও বেশি কর্মচারীদের পক্ষে সুখবর। প্রভিডেন্ট ফান্ডে (পিএফ) কর্মচারীদের যে পরিমাণ টাকা জমা হয়েছে, গত অর্থবর্ষে (২০১৮-'১৯) তার উপর ৮.৬৫ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া হবে। ইপিএফও-র আওতায় থাকা ছয় কোটিরও বেশি কর্মচারী এই হারে সুদ পাবেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার গত ১৭ সেপ্টেম্বর একথা জানিয়েছেন। এখন জরুরি প্রয়োজনে পিএফ-এর টাকা তোলার সময় সুদ দেওয়া হয় ৮.৫৫ শতাংশ হারে। সুদের এই হার নির্ধারিত হয়েছিল ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের জন্য।

● **আরও কঠোর বিদেশি অর্থসাহায্য আইন :**

বিদেশ থেকে অর্থসাহায্যের ব্যাপারে সরকারের নিয়ম মানছে না দেশের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ উঠছিল। এব্যাপারে রাশ টানতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। আরও কড়াকড়ি করল বিদেশি অর্থসাহায্য আইন, ২০১১-র। এবিষয়ে গত ১৬ সেপ্টেম্বর একটি নোটিসও জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

নতুন এই নিয়মে বলা হয়েছে, বিদেশি অর্থসাহায্য পেতে গেলে এবার থেকে দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সব কর্মী এবং আধিকারিককে একটা ঘোষণাপত্র দিতে হবে। ধর্মান্তরণের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা চলছে না বা এমন কোনও অভিযোগও নেই তাদের বিরুদ্ধে। আগে এই সুযোগ পেতে গেলে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ডিরেক্টর অথবা শীর্ষ আধিকারিকদের এই ঘোষণাপত্র দিতে হ'ত সরকারের কাছে। তবে এখন থেকে তা আর হবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নতুন নিয়মে।

এর পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, এখন থেকে শুধু আবেদনকারীই নয়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমস্ত সদস্যকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তারা যেন কখনওই বিদেশি অর্থকে কোনও উস্কানিমূলক বা হিংসা ছড়াতে পারে এমন কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তিত এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে উপহার হিসেবে কোনও ব্যক্তি যদি এক লক্ষ টাকা পান, তাহলে সরকারের কাছে কোনও ঘোষণাপত্র দিতে হবে না। আগে ২৫ হাজারের উপর এমন কোনও উপহার এলেই সরকারকে সেটার যাবতীয় তথ্য দিতে হ'ত।

● **মার্কিন সংস্থার সঙ্গে ২৫০ কোটি ডলারের মউ :**

সেপ্টেম্বর মাসেই এক সপ্তাহব্যাপী হিউস্টন সফরে যান নরেন্দ্র মোদী। বেকার হিউজ, ডমিনিয়ন এনার্জি, এমার্সন ইলেকট্রিক কোম্পানি-সহ মোট ১৭-টি শীর্ষস্থানীয় সংস্থার সিইও-দের সঙ্গে গোলটেবল বৈঠক করেন তিনি। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক শক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কে উন্নতি ঘটাতেই এই উদ্যোগ বলে জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রভিস কুমার।

মার্কিন সংস্থা টেলিউরিয়ান আইএনসি-তে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে ভারতের বৃহত্তম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিকারী সংস্থা পেট্রোনেট। এর ফলে এবার থেকে প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০ লক্ষ টন এলএলজি আমদানি করতে পারবে ভারত। মার্কিন শিল্পপতিদের ভারতে বিনিয়োগে উৎসাহী করে তুলতে এবং বিভিন্ন তেল উৎপাদনকারী সংস্থার সিইও-দের সঙ্গে বৈঠক করতে হিউস্টনে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২১ সেপ্টেম্বর সেখানেই এমন ঘোষণা হল। টেলিউরিয়ান আইএনসি ও পেট্রোনেটের মধ্যে এই সংক্রান্ত একদফা কথাবার্তা গত ফেব্রুয়ারি মাসেই হয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক মউ স্বাক্ষরিত হলেও, ভারতের সুবিধার্থে তাতে বেশকিছু রদবদল ঘটানো হয়েছে। ২০২০-র ৩১ মার্চ এই সমঝোতায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়বে।

টেলিউরিয়ান আইএনসি-র তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়, নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে কম দামে, পরিশোধিত, প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে পারবে ভারতের বৃহত্তম এলএনজি আমদানিকারী সংস্থা পেট্রোনেট। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়লে ভারতের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আরও দ্রুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫ লক্ষ কোটি অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। সেইসঙ্গে কম হবে পরিবেশ দূষণও।

● **ভারতের বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আইএমএফ :**

এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ছ'বছরের তলানি ছুঁয়ে ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধি। এবার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও (আইএমএফ) জানাল, ভারতে বৃদ্ধির এই গতি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল। কারণ হিসেবে শিল্প সংস্থা ও পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের বিধি নিয়ে অনিশ্চয়তাকে দায়ি করেছে তারা। কাঠগড়ায় তুলেছে ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক সংস্থাগুলিতে (এনবিএফসি) নগদের সমস্যাকেও। যে সমস্যার জেরে গাড়ি, ছোটো-মাঝারি শিল্পের মতো নানা ক্ষেত্রে ধার দেওয়ায় রাশ টেনেছে অনেক এনবিএফসি। দেশের বাজারে চাহিদা ধাক্কা খাওয়ায় ইতোমধ্যেই চলতি ও পরের বছরে ভারতের বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছেঁটে যথাক্রমে ৭ শতাংশ ও ৭.২ শতাংশ করেছে আইএমএফ। তবে একই সঙ্গে তাদের দাবি, ভারত এখনও বিশ্বের দ্রুততম গতিতে বাড়তে থাকা অর্থনীতি এবং চিনের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

● **পরিচয়হীন কর যাচাই :**

গত ১৩ সেপ্টেম্বর প্রযুক্তি-নির্ভর ই-অ্যাসেসমেন্ট স্কিম আনার কথা ঘোষণা করে পরিচয়হীন কর যাচাইয়ের রাস্তায় প্রথম পদক্ষেপ করল

কেন্দ্র। অর্থাৎ এর আওতায় করদাতার পরিচয় জানবেন না অফিসার। জানবেন শুধু নম্বর। তার ভিত্তিতেই চলবে পুরো প্রক্রিয়া। অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, বিজয়া দশমীর দিনে ৮-টি অঞ্চলে প্রকল্প পরীক্ষামূলক চালু হলেও, পরে তা সারা দেশে চালু হবে। আয়কর রিটার্নে অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা বিশদে জানিয়ে করদাতাকে নোটিস পাঠাবে ওই প্রকল্পের আওতায় তৈরি জাতীয় ই-অ্যাসেসমেন্ট কেন্দ্র। করদাতা যে রাজ্যের বা অঞ্চলের,তার বাইরের কোনও অঞ্চলের অফিসারের উপর দেওয়া হবে তার কর সংক্রান্ত তদন্তের ভার। তদন্তকারী অফিসার তার রিপোর্টও পাঠাবেন ওই ই-অ্যাসেসমেন্ট কেন্দ্রেই। সেখান থেকে বেরোবে চূড়ান্ত রায়। অর্থমন্ত্রীর দাবি, প্রযুক্তির হাত ধরে কর-দুর্নীতি দূর করা এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

- **আঞ্চলিক সংগঠিত বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে :**

প্রস্তাবিত আঞ্চলিক সংগঠিত বাণিজ্য চুক্তি (আরসিইপি) ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি রপ্তানিকারীদের ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নিশ্চিত করাই হবে ভারতের লক্ষ্য। গত ১১ সেপ্টেম্বর একথা জানান বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তার দাবি, নির্বিচারে আমদানি যাতে না হয় সে বিষয়েও ভারতের নজর থাকবে। লক্ষ্য থাকবে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরির দিকেও। ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য আরসিইপি সদস্যভুক্ত দেশগুলিকে দিল্লিতে আহ্বান জানায় ভারত। গত ২০১২ সাল থেকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অংশীদারি নিয়ে চুক্তির বিষয়ে ১৬-টি দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত ১০-টি দেশ ছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে ভারত, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। মন্ত্রীর মতে, সব চুক্তিতেই কোনও-না-কোনও মহলের আপত্তি থাকে। কিন্তু সেসব সামলেই চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সমস্ত পক্ষের কথা শুনতে গেলে কোনও চুক্তিই হবে না। এই প্রসঙ্গেই গোয়েলের দাবি, ভারত চুক্তিতে যোগ দিলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থের কথা অবশ্যই মাথায় রাখা হবে।

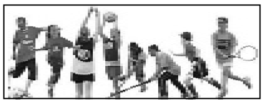

খেলা

- বদলে গেল ফিরোজ শাহ কোটলার নাম। প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কোটলার নামকরণ করা হল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম। গত ১২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিখ্যাত এই স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করা হল। জেটলির সঙ্গে ডিডিসিএ-র (দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন) সম্পর্ক ১৪ বছরের। এদিন বিরাট কোহালির নামেও কোটলায় স্ট্যান্ড উদ্বোধন করা হয়।
- শৃঙ্গ জয়ের অনন্য নজির গড়ল বিশেষভাবে সক্ষম এবং দৃষ্টিহীন পর্বত আরোহী চার যুবক। গত ২১ সেপ্টেম্বর রুদ্রগয়ার (১৯ হাজার ৯০ ফুট) পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন ওই চারজন। কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর গঙ্গোত্রী থেকে ১৪ জন যাত্রা শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ৬ জন পৌঁছন রুদ্রগয়ার শিখরে। এদের প্রত্যেকেরই বয়স ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। শুভেন্দু মাজি দৃষ্টিহীন, বাসুদেব ভাল্লা এবং সুকদেব ভাল্লা আংশিক দৃষ্টিহীন, উজ্জ্বল ঘোষ বিশেষভাবে সক্ষম। দু'জন সাহায্যকারী পর্বত আরোহী, দেবস্মিতা রায় এবং তারক সর্দার অবশ্য তাদের সঙ্গেই ছিলেন।
- গত ২১ সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের নূর-সুলতান শহরে কুস্তির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৬ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন ২০ বছরে দীপক। এত কম বয়সে কোনও ভারতীয় কুস্তিগির কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে পারেননি। তবে পরের দিন চোটের জন্য ফাইনালে নামতে পারলেন না। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাকে। এদিন বিকেলে ৬১ কেজি বিভাগে রাহুল আওয়ারে ব্রোঞ্জ পাওয়ায় একটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফেরে ভারতীয় কুস্তিগিররা।

- **নেপালের অধিনায়কের টি-২০-তে নজির :**

নেপালের হয়ে টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করলেন পরস খাড়কা। যিনি আবার নেপালের অধিনায়কও। গোট ২৮ সেপ্টেম্বর ত্রিদেশিয় সিরিজে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে তার ইনিংসের সুবাদেই ৯ উইকেটে জিতল নেপাল। পরস খাড়কা আরও এক রেকর্ড করলেন। টি-২০ আন্তর্জাতিকে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে রান তাড়া করে সেঞ্চুরি এল তার ব্যাটে। এর আগে আর কোনও ক্যাপ্টেন কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে রান তাড়া করে শতরান পাননি। ৩১ বছর বয়সি পরস ৫২ বলে অপরাজিত থাকলেন ১০৬ রানে। তার ইনিংসে ছিল সাতটি বাউন্ডারি ও ন'টি ছয়। তার শতরান আসে ৪৯ বলে। যা এশিয়ার কোনও ব্যাটসম্যানের এই ফরম্যাটে চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জেতার জন্য ১৫২ রান তাড়া করছিল নেপাল। মাত্র ১৬ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা (১৫৪-১)। জয় আসে নয় উইকেটে।

- **অ্যাশেজ সিরিজ ড্র :**

এবারের অ্যাশেজ সিরিজে নিজের সবচেয়ে কম রানের ইনিংস খেলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর আউট হয়ে গেলেন স্টিভ স্মিথ (২৩)। স্মিথের ব্যর্থতার দিনে পঞ্চম টেস্ট ১৩৫ রানে জিতল ইংল্যান্ড। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৩৯৯ রান তাড়া করতে নেমে চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে গেল ২৬৩ রানে। ম্যাথু ওয়েড করেন ১১৭ রান। ইংল্যান্ডের হয়ে চারটি করে উইকেট নেন স্টুয়ার্ট ব্রড এবং জ্যাক লিচ। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং পুরোপুরি স্মিথ-নির্ভর হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ডেভিড ওয়ার্নার ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়ায় স্মিথের উপরে পুরো চাপটা এসে পড়ে। কিন্তু ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দলকে টানতে ব্যর্থ হলেন তিনি এবং, অস্ট্রেলিয়াও হেরে গেল। এর ফলে অ্যাশেজ সিরিজ শেষ হল ২-২ অবস্থায়। কিন্তু শেষবার সিরিজ জেতার কারণে অ্যাশেজ থেকে গেল অস্ট্রেলিয়ার কাছেই।

- **দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ভারত 'রেড' দল :**

অভিমন্যু ঈশ্বরণের দাপটে এবারের দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ভারত 'রেড' দল। গত ৭ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ইনিংস ও ৩৮ রানে ভারত 'গ্রিন'-কে হারালেন অভিমন্যুরা। ভারত 'গ্রিন'-এর প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৩১ রানে। জয়দেব উনাদকাটের চার উইকেটের দাপটে ধস নামে ফৈয়জ ফজলের ব্যাটিং অর্ডারে। জবাবে প্রথম ইনিংসে ৩৮৮ রানে অলআউট ভারত 'রেড'। ৩০০ বলে ১৫৩ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন বাংলার অধিনায়ক। মোট ১৬-টি চার ও দু'টি ছয়ের সৌজন্যে এই ইনিংস গড়েন 'রেড' দলের ওপেনার। কঠিন পিচে অভিমন্যুর এই ইনিংস বিপক্ষ শিবিরে চাপ তৈরি করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রানে পিছিয়ে থাকা ভারত 'গ্রিন' শেষ হয়ে যায় ১১৯ রানে। ৫.৫ ওভার বল করে ১৩ রানে পাঁচ উইকেট অফস্পিনার অক্ষয় ওয়াখরের। ম্যাচ সেরার পুরস্কার যদিও দেআয় হয় অভিমন্যুকে। দলীপের ফাইনালে তার দলের বাকি

ব্যাটসম্যানেরা যেখানে কোনও হাফসেঞ্চুরিও করতে পারেননি, সেখানে ক্রিজ কামড়ে পড়েছিলেন বাংলার অধিনায়ক।

● **ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয় ভারতের :**

এক নম্বর টেস্ট টিমের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাদের মাঠেই ২-০ উড়িয়ে সিরিজ জয় ভারতের। গত ২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ ২১০ রানে। ভারতের টেস্ট জয় ২৫৭ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তিন ফর্ম্যাটেই জিতে ফিরল বিরাট কোহলির দল। একটা ম্যাচও জিততে পারেননি ক্যারিবিয়ানরা। জয়ের সঙ্গে এদিন ভারতের সর্বোচ্চ টেস্ট জয়ী ক্যাপ্টেন হিসেবে শীর্ষে চলে এলেন বিরাট। জিতলেন ২৮-টি টেস্ট। টপকে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (২৭)। ম্যাচের সেরা হনুমা বিহারি। সাবাইনা পার্কে প্রথম ইনিংসে ১১১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৫৩ করার সুবাদে।

এর আগে তৃতীয় দিন ১৬৮-৪ অবস্থায় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ভারত। ৫৭ রানে চার উইকেট চলে যাওয়ার পরে অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেট জুটিতে অজিত রাহানে ও হনুমা বিহারি যোগ করেন ১১১ রান। রাহানে ৬৫ রানে এবং হনুমা ৫৩ রানে অপরাজিত থাকা অবস্থায় ইনিংস ছাড়েন বিরাট। জেতার জন্য ৪৬৮ রানে অবিশ্বাস্য টার্গেটের মুখে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেখান থেকে মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না ক্যারিবিয়ানদের।

● **বিশ্বকাপ শুটিংয়ে ভারত শীর্ষে :**

চমকে দিলেন মনু ভাকের-সৌরভ চৌধুরি। বিশ্বকাপ শুটিংয়ের মিক্সড ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে পিছিয়ে পড়েও সোনা জিতে। মনু-সৌরভ জুটি এই মরসুমে আইএসএসএফ-এর চারটি শুটিং বিশ্বকাপেই সোনা জিতল। রিয়ো দে জেনেইরোয় বিশ্বমঞ্চে এবার ভারতের পারফরম্যান্সও বেশ ভালো। মনুদের ইভেন্টেই যেমন রুপো জিতলেন ভারতের অন্য এক জুটি যশস্বিনী দেশোয়াল ও অভিষেক বর্মা। আর টুর্নামেন্টের শেষ দিন ভারতই জিতল সর্বাধিক পদক।

শেষ দিন ভারতকে আর একটি সোনা দিয়েছেন মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে এক নম্বর অপূর্বী চান্ডিলা ও দীপক কুমার জুটি। যা গত ২ সেপ্টেম্বর ভারতের জেতা চতুর্থ সোনা। অপূর্বীরা সোনা জেতেন মিক্সড ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে। ব্রাজিলের ফুটবলের শহর রিয়োয় ভারত এবার জিতল মোট পাঁচটি সোনা, দু'টি রুপো এবং দু'টি ব্রোঞ্জ। পেল পদক তালিকায় শীর্ষস্থান। এ'বছর যে ক'টি শুটিং বিশ্বকাপ হল তার মধ্যে রিয়োতে ভারত সব থেকে ভালো ফল করল। জুনিয়র বিশ্বকাপ শুটিংয়েও এবার ভারত দারুণ সফল। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে আগের দু'টি বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিল অঞ্জুম মোদগিল-দিব্যাংশ সিং পানোয়ার জুটি। রিয়োতে তাদের ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

শেষ দিন দুই ভারতীয় জুটির মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজক লড়াই হয়েছে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে। যা মনুরা শেষপর্যন্ত জেতেন ১৭-১৫ ফলে। অথচ ম্যাচ চলাকালীন মনু আর সৌরভ দু'বার যথাক্রমে ৩-৯, ৯-১৫ ফলে পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ বার করে। এদিন তারা দু'টি যোগ্যতা অর্জন রাউন্ডে যথাক্রমে ৩৯৪ ও ৪০০ স্কোর করে। তার মধ্যে একবার ১০ শটের সিরিজে পুরো ১০০ পয়েন্ট পান। মনুদের বিরুদ্ধে শেষরক্ষা করতে না পারলেও রিয়োতে নজর কেড়েছেন যশস্বিনী ও অভিষেক। এখানে দু'জনেই তাদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছেন।

● **যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ট্রফি :**

১৯-তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন নাদাল—৩৩ বছরের স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের হাতেই উঠল এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ট্রফি। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ৫০ মিনিটের লড়াইয়ের পর রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে দিলেন ৭-৫, ৬-৩, ৫-৭, ৪-৬ এবং ৬-৪ ফলে। তৃতীয় গেম পয়েন্ট জিতে কোর্টেই শুয়ে পড়েন নাদাল। ইউএস ওপেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় দীর্ঘতম ফাইনাল খেলে। ১৯-তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে তিনি এখন সুইস তারকা রজার ফেডেরারের থেকে মাত্র একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম দূরে রইলেন। গ্রিগর দিমিত্রোভের কাছে হেরে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন রজার। তার আগে শীর্ষ বাছাই নোভাক জকোভিচকে বিদায় নিতে হয় চোটের জন্য। দ্বিতীয় বাছাই নাদালের জন্য তাই খানিকটা হলেও সহজ হয়ে যায় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রাস্তাটা। ২৩ বছরের মেদভেদেভ ছিলেন পঞ্চম বাছাই।

দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষের দিকে নিজের থেকে দশ বছরের ছোটো মেদভেদেভের বিরুদ্ধে লড়াই করে ট্রফি জিতে নেন নাদাল। শেষ ১২-টা ইউএস ওপেনে প্রতিবারই ট্রফি উঠেছে রজার, নাদাল বা জোকার-এর হাতে। এবারেও তার অন্যথা হল না। ফেডেরার দখলে রয়েছে পাঁচটি ইউএস ওপেন, জোকারের দখলে তিনটি এবং এবার নাদালের দখলে এল চারটি খেতাব। ওপেন যুগের টেনিসে এই খেতাব জয়ের পর ৩৩-এর নাদাল দ্বিতীয় বয়স্ক প্লেয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন বিজয়ী হলেন। ১৯৭০ সালে ৩৬ বছরের কেন রজওয়েল বয়স্কতম ইউএস ওপেন বিজেতা। নাদালের সামনে এখন লক্ষ্য জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফেডেরারের ২০-টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলার।

প্রথম কানাডীয় হিসাবে আন্দ্রেস্কুর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন—যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে রচিত হল ইতিহাস। তবে সেরেনা উইলিয়ামস নন, তাকে ৬-৩, ৭-৫ স্কোরে হারিয়ে প্রথম কানাডীয় মহিলা হিসাবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন বিয়ানকা আন্দ্রেস্কু। ২০০৬ সালে মরিয়া শারাপোভার পর কনিষ্ঠতম মহিলা হিসাবে ১৯ বছর বয়সি আন্দ্রেস্কু নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালেই জিতলেন। ছুঁয়ে ফেললেন মনিকা সেলেসকে। ওপেন যুগের দ্রুততম মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে নিজের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যামেই খেতাব জিতলেন তিনি। আন্দ্রেস্কু এবারের ইউএস ওপেনের আগে তার কেরিয়ারে মাত্র দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ জিতেছিলেন।

আন্দ্রেস্কু জেতায় ২৪ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার মুখে এসেও ফের অধরাই থেকে গেল সেরেনার স্বপ্ন। এই নিয়ে টানা চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল হারলেন তিনি। দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না ৩৩ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলা সেরেনা। ৩৭ বছর বয়সি সেরেনা ১৯৯৯ সালে যখন প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেন, তখনও জন্মাননি আন্দ্রেস্কু। আইস হকির দেশের আন্দ্রেস্কুর এই জয় যে কানাডীয়দের মধ্যে টেনিসের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই জয়ের ফলে মহিলাদের র‍্যাঙ্কিং-এ পাঁচ নম্বরে উঠে আসবেন এই কানাডীয় যা তার কেরিয়ারের সর্বোচ্চ।

সেরিনা উইলিয়ামসের শততম জয়—নিজের শততম জয় পেতে সেরিনা উইলিয়ামসের লাগল মাত্র ৪৪ মিনিট। সাতাশ বছরের চিনা প্রতিপক্ষ ওয়াং কুইয়াংকে ২৩-টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক হারালেন ৬-১, ৬-০ সেটে। এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কোনও ম্যাচ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়নি। মার্কিন কিংবদন্তি এমন একপেশে জয় পেয়ে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হন ইউক্রেনের এলিনা সিতোলিনার। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে

শততম ম্যাচ জিতে সেরিনা ক্রিস এভার্টের নিউ ইয়র্কে একশো ম্যাচ জয়ের ক্লাবে নাম লেখালেন। ৩৭ বছরের টেনিস কিংবদন্তির আসল লক্ষ্য অবশ্য মার্গারেট কোর্টের ২৪-টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অনন্য নজির স্পর্শ করা।

● **মালিঙ্গার রেকর্ড :**

৩৬ বছরের লাসিথ মালিঙ্গা। গত ৬ সেপ্টেম্বর পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে ফের নতুন কীর্তি গড়লেন শ্রীলঙ্কার ডানহাতি পেসার। নিজের দ্বিতীয় ওভারের শেষ চার বলে তিনি ফিরিয়ে দেন কলিন মুনরো, হামিশ রাদারফোর্ড, কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম ও রস টেলরকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চার বলে চার উইকেট। এর আগে ২০07 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ম্যাচে চার বলে চার উইকেট নেন তিনি। পাশাপাশি এদিনই টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম বোলার হিসেবে ১০০ উইকেটও নিলেন মালিঙ্গা। কলিন মানরোকে ফিরিয়ে উইকেট-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন।

● **এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বে ভারত :**

কল্যাণী স্টেডিয়ামে মাসখানেক আগে তার দুরন্ত হ্যাটট্রিকেই নেপালকে ৭-০ চূর্ণ করে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল ভারত। গত ২২ সেপ্টেম্বর তাসখন্দে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৬ এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে সেই স্রিদার্থ নংমেইকাপাম-ই ৬৮ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেন ভারতকে। যদিও ম্যাচ শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে সমতা ফেরায় উজবেকিস্তানের রিয়ান ইসলামভ। তাতে অবশ্য আগামী বছর বাহরিনে অনূর্ধ্ব-১৬ এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন আটকায়নি ভারতীয় দলের। এই নিয়ে টানা তিনবার (সব মিলিয়ে মোট ন'বার) মূল পর্বে ভারতের খুদেরা। শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে জয় হাতছাড়া হলেও ভারতীয় শিবিরের কোনও হতাশা নেই।

● **প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৮ সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত :**

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ফুটবলে এসেছে পরিবর্তনের জোয়ার। কল্যাণীতে গত আগস্ট মাসে অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সাত দিন আগে এএফসি কোয়ালিফায়ার্সে উজবেকিস্তানকে হারিয়ে মূলপর্বে ওঠার ছাড়পত্র আদায় করেছেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ফুটবলাররা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সেই তালিকায় যুক্ত হল অনূর্ধ্ব-১৮ ভারতীয় দলের নামও। এদিন কাঠমান্ডুতে ফাইনালে ভারত ২-১ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য জিতল এই ট্রফি। ম্যাচের দু'মিনিটে বিক্রম প্রতাপ সিং গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন। পরে সংযুক্ত সময়ে ব্যবধান বাড়িয়ে যান রবি বাহাদুর রানা। বাংলাদেশের পক্ষে গোল করেন ইয়েসিন আরাফত। এদিন ফাইনালে শুরু থেকে দাপট ছিল ভারতীয় দলের। বিশেষ করে, নিনথোইনগানবা মিতেই দারুণ খেলেছেন। তিনিই প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, এই ভারতীয় দলের কোচ ফ্লয়েড পিন্টো।

● **বিশ্ব বক্সিংয়ে ইতিহাস অমিত পাঙ্ঘালের :**

গত ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজি বিভাগের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের অমিত পাঙ্ঘাল। বিপক্ষে রিয়ো অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী উজবেকিস্তানের বক্সার শাখোবিদিন জইরভ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এর আগে ব্রোঞ্জ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতকে। ২০09 সালে বিজেন্দ্র সিং, ২০১১ সালে বিকাশ কৃষাণ, তার পরে ২০১৫ সালে শিবা থাপা আর দু'বছর আগে গৌরব বিধুরি। সকলেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফিরেছে। তাই এদিন এশিয়ান গেমস ও এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী অমিতের লড়াইটা ছিল ভারতের বক্সিংয়ের ইতিহাসেই একটি বিরল দিন। ফাইনালে উঠেই সে নিশ্চিত করে দিয়েছিল, এই প্রথম অন্তত রুপো জিতে ইতিহাস সৃষ্টি হবে। কিন্তু অপেক্ষা ছিল ফাইনালটাও জিতে সোনালি দিন উপহার দিতে পারে কি না। শেষপর্যন্ত ও পারল না। ০-৫ হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

● **কুস্তিতে বিনেশ ও পূজার ব্রোঞ্জ :**

মেয়েদের কুস্তিতে যাবতীয় উদ্বেগ কাটিয়ে বিনেশ ফোগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতলেন এবং টোকিও অলিম্পিক্সে নামার যোগ্যতা অর্জন করলেন। কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী বিনেশ গত ১৮ সেপ্টেম্বর ৫৩ কেজি বিভাগে কাজাখস্তানের মারিয়া প্রেভোলারাকিকে হারিয়ে দিলেন। এদিনই প্রথম ম্যাচে তিনি অসাধারণ রক্ষণ দেখিয়ে রুখে দেন বিশ্বের এক নম্বর সারা আন হিল্ডারব্র্যান্ডটকে। চমকে দিয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন পূজা ধন্ডও। তিনি ৫৯ কেজি বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছেন জাপানের ইউজুকা ইনাগাকিকে হারিয়ে। তবে এই ওজন বিভাগটি অলিম্পিক্সে নেই।

● **চিন ওপেন জয়ী ক্যারোলিনা মারিন :**

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন অলিম্পিক্স সোনাজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকার। চোট সারিয়ে ফিরেই চিন ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন ক্যারোলিনা মারিন। রিয়ো অলিম্পিক্সে ভারতের পি. ভি. সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন স্প্যানিশ তরুণী। কিন্তু তার ব্যাডমিন্টন জীবন নিয়েই সংকট তৈরি হয়েছিল জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের ফাইনালে। লিগামেন্টে চোট পেয়ে আট মাস কোর্টের বাইরে থাকতে হয় তাকে। গত ২২ সেপ্টেম্বর চাংঝউয়ে তাই জু ইংয়ের বিরুদ্ধে ১৪-২১, ২১-১৭, ২১-১৮ গেমে জিতলেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে শেষ ছয় সাক্ষাৎকারেই হেরেছিলেন মারিন।

● **পঙ্কজের ২২-তম বিশ্বখেতাব :**

পঙ্কজ আডবাণী। বিশ্বখেতাব জেতা তিনি যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। বছরের পর বছর তার সাফল্যের যে ধারাবাহিকতা তা ভারতীয় ক্রীড়াজগতে তো বটেই বিশ্বের খেলাধুলোর মানচিত্রেও বিরল। গত ১৫ সেপ্টেম্বর মায়ানমারে ভারতের বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার তারকা আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন বিশ্বমঞ্চে। আইবিএসএফ বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে ২২-তম বিশ্বখেতাব জিতে। ১৫০-আপ ফর্ম্যাটে পঙ্কজ এই নিয়ে টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হলেন। ইংল্যান্ডে পেশাদার খেলোয়াড়জীবন শেষ করে ২০১৪ সালে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ৩৪ বছর বয়সি পঙ্কজ প্রতি বছর দেশকে একটি করে বিশ্বখেতাব এনে দিয়েছেন। গত ছ'বছরে এই ফর্ম্যাটে পঙ্কজের এটি পঞ্চম খেতাব। বিলিয়ার্ডসে তার মতো সাফল্য আর কোনও খেলোয়াড় পাননি। এরকম ধারাবাহিকতাও কেউ দেখাতে পারেননি।

● **বেলজিয়ামে চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্য সেন :**

লক্ষ্যভেদ করলেন লক্ষ্য সেন। চ্যাম্পিয়ন হলেন বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জারে। ফাইনালে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই ডেনমার্কের ভিক্টর সেভসেনকে অবিশ্বাস্যভাবে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে। লক্ষ্য জিতলেন ২১-১৪, ২১-১৫ ফলে। তাও মাত্র ৩৪ মিনিটে। ভারতের প্রতিশ্রুতিমান ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন অবশ্য আগেই অঘটন ঘটান সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে ডেনমার্কেরই কিম ব্রানকে হারিয়ে। আঠারো বছরের তরুণ জেতেন ২১-১৮, ২১-২২ ফলে। ব্রানের বিরুদ্ধে তার জিততে লেগেছিল ৪৮ মিনিট।

● **ভিয়েতনাম ওপেনে জয়ী সৌরভ বর্মা :**

এবছরে এর আগে হায়দরাবাদ ওপেন এবং স্লোভেনিয়ান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে আরও একটা ট্রফি এনে দিলেন সৌরভ বর্মা। চিনের সুন ফেই জিয়াংকে ২১-১২, ১৭-২১, ২১-১৪ গেমে হারিয়ে ভিয়েতনাম ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। উল্লেখ্য, এর আগের দিনই বেলজিয়ামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লক্ষ্য সেন। সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই সৌরভ হারান জাপানের মিনোরু কোগাকে। সৌরভের পক্ষে ফল ২২-২০, ২১-১৫। খেলা শেষ হয় ঠিক ৫১ মিনিটে। এই টুর্নামেন্টে এবার সৌরভ একটিও গেম হারেননি।

● **এশিয়া কাপ ফাইনালে জয় ভারতের :**

শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনার মধ্যে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। গত ১৪ সেপ্টেম্বর কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ফাইনালে মাত্র পাঁচ রানে বাংলাদেশকে হারাল ভারত। পাঁচ উইকেট নিয়ে নায়ক বাঁ-হাতি স্পিনার আনকোলেকর। এদিন টস জিতে ব্যাট করতে নেমে চাপে পড়ে যায় ভারত। ৩২.৪ ওবারে মাত্র ১০৬ রানে শেষ হয়ে যায় ইনিংস। অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল (৩৩) ও লোয়ার-অর্ডার ব্যাটসম্যান করণ লাল (৩৭) ছাড়া কেউ তেমন রান করেননি। এছাড়া দুই অঙ্কের রান করেছেন শুধু শাশ্বত রাওয়াত (১৯)। বাংলাদেশের সফলতম বোলার হলেন শামিম হোসেন (আট রানে তিন উইকেট) ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরি (১৮ রানে তিন উইকেট)। ৫০ ওভারে ১০৭ রানের জয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সহজেই পৌঁছে যাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু ভারতীয় বোলাররা কখনোই স্বস্তিতে থাকতে দেননি বিপক্ষকে। শেষপর্যন্ত ৩৩ ওভারে ১০১ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। ১৮ বছর বয়সি আনকোলেকর ২৮ রান দিয়ে নেন পাঁচ উইকেট। ১২ রানে তিন উইকেট নেন পেসার আকাশ সিং।

● **ফিফার বর্ষসেরা মেসি :**

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হলেন লিয়োনেল মেসি। মোট ৪,৬৪৬ মিনিট মাঠে থেকে ৫৮ ম্যাচ ৫৪ গোল করার পুরস্কার। তার পাস থেকে ২০-টি গোলও হয়েছে গত মরসুমে। এবারের ভোটে ৪৬ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছেন মেসি। পরের চারজন ভার্জিল (৩৮ পয়েন্ট), ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (৩৬ পয়েন্ট), মহম্মদ সালাহ (২৬ পয়েন্ট) ও সাদিয়ো মানে (২৩ পয়েন্ট)। মেসি মোট ছ'বার এই পুরস্কার পেলেন। ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৫ সালের পরে। গত মরসুমে তার ক্লাব বার্সেলোনা লা লিগা জিতেছে, চ্যাম্পিয়ন লিগে সেমিফাইনালে উঠেছে। ইউরোপের সেরা ক্লাব টুর্নামেন্টে গতবার আর্জেন্টাইন তারকার গোল ১২-টি । এত গোল আর কেউ করতে পারেননি।

সেরা মহিলা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেগান রাপিনো। যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক টানা দ্বিতীয়বার দলকে বিশ্বকাপ জেতাতে প্রধান ভূমিকা নেন। সেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন লিভারপুরের য়ুর্গেন ক্লপ। ক্লপের মতোই সেরা কোচের লড়াইয়ে ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা এবং টটেনহ্যামের মাউরিসিয়ো পচেত্তিনো। সেরা মহিলা কোচ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ জয়ী জিল এলিস। লিভারপুলের ব্রাজিলীয় গোলকিপার অ্যালিসন বেকার জিতলেন পুরুষদের সেরা গোলকিপারের পুরস্কার।

● **দোহায় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিট :**

নিজের রেকর্ড ভেঙে দোহা বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিটে জ্যাভলিন থ্রো বিভাগের ফাইনালে উঠলেন ভারতের অনু রানি। দ্বিতীয় রাউন্ডে অনু ছোঁড়েন ৬২.৪৩ মিটার। ভেঙে দেন তার আগের জাতীয় রেকর্ড ৬২.৩৪ মিটার। এই পারফরম্যান্সের জোরেই তিনি পয়লা অক্টোবরের ফাইনালে জায়গা করে নেন। শুধু জাতীয় রেকর্ড ভাঙাই নয়, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রো বিভাগে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার নজিরও গড়লেন মেরঠের মেয়ে।

অন্যদিকে, জামাইকার 'স্প্রিন্ট কুইন' শেলি অ্যান ফ্রেসার প্রাইস ১০০ মিটারের চার নম্বর সোনা জিতলেন দুরন্তভাবে। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা অ্যালিসন ফেলিক্স ভেঙে দিলেন ইউসেইন বোল্টের ১১ সোনা জেতার রেকর্ড। ফ্রেসার প্রাইস এবং ফেলিক্স দু'জনেই মা হওয়ার জন্য এতদিন ট্র্যাকের বাইরে ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে তাদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগিতা ছিল দোহা বিশ্ব মিটই। ৩২ বছর বয়সি ফ্রেসার প্রাইস ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ন হন ১০.৭১ সেকেন্ড সময় করে। ৩৩ বছর বয়সি ফেলিক্স ৪০০ মিটার মিক্সড রিলে বিভাগে সোনা জেতেন। যা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তার ১২ নম্বর পদক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

➢ সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও গাইডলাইন তৈরি করেছে কি না, তিন সপ্তাহের মধ্যে আদালতে তা জানাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৪ সেপ্টেম্বর শুনানির সময় অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক গুপ্তা।

● **'বিক্রম'-এর অবস্থান :**

পাখির পালকের মতো নয়। চাঁদের বুকে আছড়েই পড়েছিল চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার 'বিক্রম'। সেই অবতরণ স্থলের একটি ছবি টুইট করে একথা জানাল নাসা। এও জানানো হয়েছে, ঠিক কোন জায়গায় বিক্রম ভেঙে পড়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এর আগে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র চেয়ারম্যান কে. শিবনও জানিয়েছিলেন, সফ্‌ট ল্যান্ডিং নয়, চাঁদের বুকে হার্ড ল্যান্ডিং (আছড়ে পড়া) হয়েছে বিক্রমের। যে ছবি নাসা প্রকাশ করেছে, সেটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর তুলেছিল তাদের মহাকাশযান 'লুনার রিকনাইস্যান্স অরবিটার (এলআরও)। নাসা জানিয়েছে, ছবিটি চাঁদে সন্ধ্যা নেমে আসার সময় তোলা হয়েছিল। তাই বিজ্ঞানীরা বিক্রম-এর সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেননি। তবে অক্টোবরে এলআরও ফের ছবি তোলার চেষ্টা করবে বলে নাসা জানিয়েছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে 'সিম্পেলিয়ান এন' এবং 'ম্যানজিনাস সি', এই দু'টি ক্রেটারের মাঝে সমতলভূমিতে অবতরণের কথা ছিল ল্যান্ডার বিক্রম-এর। কিন্তু চাঁদের মাটি ছোঁয়ার আগেই সেটার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইসরো-র পাঠানো 'চন্দ্রযান-২'-এ থাকা অরবিটার ও ইসরোর 'গ্রাউন্ড স্টেশন'-এর। গত ২২ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-২। ইসরো সূত্রে জানানো হয়েছিল, চাঁদের পিঠ (লুনার সারফেস) থেকে ১০০ কিলোমিটার উপরের কক্ষপথে অরবিটার থেকে আলাদা হয়ে চাঁদের বুকে নামতে শুরু করবে ল্যান্ডার বিক্রম। সময় লাগবে ১৫ মিনিট। রোভারটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দেড় টন ওজনের ল্যান্ডার খুব ধীরে পা ছোঁয়াবে (সফ্‌ট ল্যান্ডিং) চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ৭০ ডিগ্রি অক্ষাংশে। পরিকল্পনা মতো এই মিশনের সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু ৭ সেপ্টেম্বর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন হাজির হল, দুঃসংবাদটা তখনই পৌঁছেছিল ইসরোর গ্রাউন্ড সেন্টারে!

- **দৃষ্টিহীনদের জন্য আরবিআই-এর অ্যাপ :**

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা যাতে সঠিক মূল্যের নোট চিহ্নিত করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে মোবাইল অ্যাপ আনছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ওই অ্যাপটি তৈরি করার জন্য ইতোমধ্যেই একটি ভেন্ডরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর বম্বে হাইকোর্টকে আরবিআই জানায়, তাদের প্রস্তাবিত মোবাইল অ্যাপটির জন্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন। ওই অ্যাপটি তৈরির জন্য ১৬-টি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে ড্যাফোডিল সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড-কে অ্যাপটি তৈরির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ২,০০০ টাকার নোট প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা যাতে সঠিক মূল্যের নোট শনাক্ত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে ১০০ টাকা ও তদোর্দ্ধ নোটে ইন্ট্যাগলিয়ো প্রিন্টিংভিত্তিক চিহ্ন রয়েছে, যা আঙুলের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়।

- **গগনযান অভিযান :**

গগনযান অভিযানের জন্য প্রথম দফার মহাকাশচারীদের বেছে নিল ইসরো। ভারতীয় বায়ুসেনার ২৫ জন পাইলটকে প্রাথমিকভাবে এই মহাকাশে মানুষ পাঠানোর ইসরোর অভিযানের জন্য বাছা হয়েছে। প্রথম দফার তালিকায় ঠাঁই পাওয়া ২৫ জন পাইলটেরই গড় বয়স ৪০ বচরের মধ্যে। দলে কোনও মহিলা নেই। গত ৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট অব এরোস্পেস মেডিসিনে এই পাইলটদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়। বেঙ্গালুরুর এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় বায়ুসেনার অধীনস্থ। এ প্রসঙ্গে বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দফার মহাকাশচারীদের বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তালিকায় থাকা পাইলটদের কঠিন পর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের রেডিয়োলজিক্যাল পরীক্ষা ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাও করা হয়েছে। চূড়ান্ত বাছাই করা মহাকাশচারীদের নভেম্বরে রাশিয়ায় চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে। সম্প্রতি রাশিয়া সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘোষণা করেন। তার সঙ্গে ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়া মহাকাশ গবেষণায় বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে। সফল মহাকাশ অভিযানের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে রাশিয়ার। ভারতের সঙ্গেও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে মস্কোর সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তাই ইসরোর গগনযান অভিযানের মহাকাশচারীদের রাশিয়ায় চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর এই সিদ্ধান্ত।

রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমস-এর সঙ্গে ইসরোর এনিয়ে একটি মউ চুক্তিও স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী মস্কোতে একটি টেকনিক্যাল ইউনিট গঠন করবে ইসরো। ২০১৮ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী গগনযানের প্রসঙ্গে জানান। ২০২২ সালের শেষার্ধে মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর। তিনজন মহাকাশচারীকে গগনযানে মহাকাশে পাঠানো হবে। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চালাচ্ছে ইসরো। মহাকাশচারী বাছার ক্ষেত্রে যেকোনও দেশেই বায়ুসেনার পাইলটরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাও ছিলেন বায়ুসেনার পাইলট। গগনযানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

- **ইসরোর প্রযুক্তিগত দেশীয় জিপিএস :**

এবার সাধারণের জন্য দেশীয় জিপিএস পরিষেবা বাজারে আসার পথ প্রশস্ত হল। এতদিন ভারতে মোবাইলে জিপিএস পরিষেবা বা অবস্থানের হদিশ পেতে নির্ভর করতে হ'ত আমেরিকা বা ইউরোপের স্যাটেলাইট পরিষেবার উপর। শীঘ্রই ভারতের নিজস্ব স্যাটেলাইট পরিষেবাতে সেই সুবিধা মেলার পথ তৈরি হয়েছে। প্রায় ছ'বছর ধরে আটটি স্যাটেলাইট দিয়ে 'ন্যাভিগেশন' প্রযুক্তি ব্যবস্থা (নাবিক) তৈরি করেছে ইসরো। যাকে সম্প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে মোবাইল প্রযুক্তি ও পরিষেবার মাপকাঠি নির্ধারণের আন্তর্জাতিক মঞ্চ। এতে মোবাইল যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সংস্থাগুলি বাণিজ্যিকভাবে ওই প্রযুক্তি ব্যবহারের ছাড়পত্র পেল।

মোবাইল পরিষেবায় অবস্থান জানার জন্য এখন আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া ও চিনের নিজস্ব স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ৩জিপিপি-র স্বীকৃতপ্রাপ্ত। এবার ইসরোর ইন্ডিয়ান রিজিওনাল ন্যাভিগেশনাল স্যাটেলাইট সিস্টেমও (নাবিক) সেই স্বীকৃত পেল। আপাত সেটি প্রতিরক্ষা-সহ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হলেও আমজনতার নাগালে ছিল না। এবার সকলের জন্য ৪জি, ৫জি ও ইন্টারনেট অব থিংস পরিষেবায় তা ব্যবহার করা যাবে।

- **শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর পুরস্কার :**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বা আবিষ্কারের জন্য প্রতি বছর মোট সাতটি বিভাগে শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর পুরস্কার দেয় কেন্দ্র। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। এবছর সাতটি বিভাগে ভাটনাগর পুরস্কার পাচ্ছেন মোট ১২ জন। তার মধ্যে ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল এবং ম্যাথম্যাটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে পুরস্কার পাচ্ছেন দু'জন করে। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইমিউনোলজির সৌমেন বসাক এবং পুণের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশান অ্যান্ড রিসার্চের কল্যাণ সাইকৃষ্ণন, কেমিক্যাল সায়েন্সে বেঙ্গালুরুর 'জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চ'-এর তাপসকুমার মাজি এবং আইআইটি বম্বের রাঘবন বি. সুনজ, অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সায়েন্সে সুবিমল ঘোষ, ফিজিক্যাল সায়েন্সে টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের শঙ্কর ঘোষ এবং বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অনিন্দ্য সিনহা, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে বেঙ্গালুরুস্থিত মাইক্রোসফট রিসার্চ ইন্ডিয়ার মানিক বর্মা, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সে চেন্নাইয়ের ইনস্টিটিউট অব ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সেস-এর দিশান্ত ময়ূরভাই পাঞ্চোলি এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের নীনা গুপ্ত, মেডিক্যাল সায়েন্সে নায় দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির ধীরাজ কুমার এবং হায়দরাবাদের এল. ভি. প্রসাদ আই ইনস্টিটিউটের মহম্মদ জাভেদ আলি।

এবছরের প্রাপকদের মধ্যে একমাত্র নীনা গুপ্তই রাজ্যে গবেষণারত। তিনি বরাহনগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) রাশিতত্ত্ব ও গণিত বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। বেথুন কলেজের এই প্রাক্তনী ইতোমধ্যেই 'জারিস্কি ক্যানসেলেশন প্রবলেম'-এর সমাধান বাতলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। রুশ গণিতজ্ঞ অস্কার জারিস্কির নামাঙ্কিত এই গাণিতিক সমস্যা সাত দশক ধরে অমীমাংসিত ছিল। দেশের নতুন প্রজন্মের গণিতজ্ঞদের মধ্যে অগ্রগণ্য নীনাদেবী পেয়েছেন রামানুজন পুরস্কারও। তিনিই শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর পুরস্কারের কনিষ্ঠতম বিজেতা।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

- **খরা নিয়ে নাসা-ইসরোর গবেষণা :**

এবার ভারতে খরা আরও ভয়াবহ হতে পারে। খরার গ্রাসে পড়তে পারে দেশের আরও অনেক এলাকা। এমনকী, ভারতের যে এলাকাগুলি

এতদিন 'খরাপ্রবণ' বলে চিহ্নিত হয়নি, সেইসব অঞ্চলেও এবার ফুটিফাটা হয়ে যেতে পারে মাটি। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-র এক যৌথ পর্যবেক্ষণে এই অশনি সংকেত দেওয়া হয়েছে। গত চার বছর ধরে গবেষণাটি চালানো হয়েছে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায়। তার প্রথম পর্বটি সবে শেষ হয়েছে। গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

গরমকালে দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুমণ্ডলে যে বিপুল পরিমাণে অ্যারোসল কণা জমা হয়, গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তার পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বায়ুমণ্ডলে অ্যারোসলের স্তর গত চার বছরে এতটাই পুরু হয়ে গিয়েছে যে, তা বায়ুমণ্ডলের একেবারে নিচের স্তর ট্রপোস্ফিয়ার থেকে পৌঁছে গিয়েছে তার উপরের স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও। যেহেতু বিষাক্ত গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন থেকেই অ্যারোসলের জন্ম হয়, তাই অ্যারোসলের মাধ্যমে দূষণ কণা প্রচুর পরিমাণে পৌঁছে যাচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও। দেখা গিয়েছে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যে মেঘগুলিতে বরফ কণা মিশে থাকে, ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা খুব কম হয় বলে, সেখানেও ঢুকে পড়েছে অ্যারোসল কণা। আর তাদের পরিমাণ, ঘনত্ব ও আকার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল নিনো'-র দরুন গত বছরেই ভয়াবহ খরার কবলে পড়েছিল পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। নাসা, ইসরোর যৌথ গবেষণার ইঙ্গিত, বায়ুণ্ডলে অ্যারোসলের স্তর অত্যন্ত পুরু হয়ে যাওয়ায় ভারতে এবার সেই খরা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে চলেছে।

গবেষণার একটি ধাপ সবে শেষ হয়েছে। গবেষকরা কাজ করেছেন 'এশিয়ান ট্রপোপোজ অ্যারোসল লেয়ার' বা 'অ্যাটাল' নিয়ে। বেলুনের মাধ্যমে কয়েকটি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিকে ট্রপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত পাঠিয়ে। বেলুনের মাধ্যমে এই পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে বলে এই পদ্ধতিকে 'ব্যাটাল'-ও বলা হয়। গবেষণা জানিয়েছে, গাছপালা পোড়ানো ও কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়ায় ওই অ্যারোসল্‌স কণাদের জন্ম হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির অতি ব্যবহারে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডলে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে অ্যারোসল কণাদের পরিমাণ। তার ফলে, অ্যারোসলের স্তর ভীষণ পুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রপোস্ফিয়ার ছাপিয়ে তা পৌঁছে গিয়েছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে।

বৃষ্টির জন্য মেঘ বানানোর প্রক্রিয়ায় অ্যারোসল কণাদের যথেষ্টই ভূমিকা রয়েছে। ফি-বছরই গরমকালে ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে জমা হয় জলীয় বাষ্প ও অ্যারোসল কণা। কিন্তু অ্যারোসল কণাদের উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া পরিমাণ যদি বায়ুমণ্ডলের অনেকটা উপরের স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও পৌঁছে যায়, তাহলে বিপদ কিছুটা বেড়ে যায়। যেহেতু মূলত দূষণ কণা থেকেই জন্ম অ্যারোসল কণাদের, তাই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে অ্যারোসল কণাদের পরিমাণ বেড়ে গেলে, তুলনায় হালকা জলীয় বাষ্পের চেয়ে মেঘ তৈরি করার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিতে শুরু করে অ্যারোসল কণারাই। তারাই অনেক সময় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জলভরা মেঘগুলিকে জমাট বাঁধতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তারাই জলভরা মেঘগুলির কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস)-টাকে গড়ে তোলে।

নয়ের দশকের একটি গবেষণাতেই দেখা গিয়েছিল, তিব্বতের মালভূমির ১০ থেকে ১২ মাইল উপরের বায়ুমণ্ডলের স্তরেও ঢুকে পড়েছে অ্যারোসল কণা। আমাদের 'অ্যাটাল' প্রকল্পে গবেষণার চৌহদ্দি আরও বাড়ানো হয়েছিল। দেখা হয়েছিল পশ্চিম চিন থেকে ভূমধ্যসাগরের উপরের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরও। মাপা হয়েছে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে অ্যারোসল কণাদের পরিমাণ, ঘনত্ব, আকার, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও ওজোন গ্যাসের পরিমাণ এবং ঘনত্বও।

● রাজ্যের কুমির প্রকল্পে কেন্দ্রের ১ কোটি :

আশির দশকের শেষে সুন্দরবনের কুমিরের সংখ্যা বাড়াতে ভগবতপুরে কুমির প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্যের বন দপ্তর। এতদিন পরে সেই প্রকল্পের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কেন্দ্র এতে সায় দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও থাকছে তাদের। আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতোমধ্যেই এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কুমির প্রজননের বাকি সব আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকারই। সুন্দরবনে নোনা জলে যে কুমির থাকে, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের 'বিপন্ন' প্রজাতির প্রাণী হিসেবেই দেখা হয়। বনকর্তাদের দাবি, ওই কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর কাজে দক্ষিণ ২৪-পরগণার ভগবতপুরের প্রকল্প অনেকাংশে সফল। ওই প্রকল্পে জন্মানো কুমির বড়ো হয়ে গেলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় সুন্দরবনের বিভিন্ন খাঁড়িতে। ওই প্রজনন কেন্দ্রের জন্যই সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা বেড়েছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কুমির। জল-বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর দায়বদ্ধতা আছে।

● রাষ্ট্রপুঞ্জকে ভারতের উপহার সৌর প্যানেল :

ভারতের উপহার দেওয়া সৌরচালিত প্যানেল বসল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিউ ইয়র্কের সদর দপ্তরে। রাষ্ট্রপুঞ্জ টুইট করে জানিয়েছে, ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম এই প্যানেলটি গোটা দপ্তরের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারবে। এর আগে পয়লা আগস্ট তানজানিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরে সৌর প্যানেল বসানো হয়। সেখানে ৬৯৬-টি সৌর প্যানেল ব্যবহার করে প্রচলিত শক্তিতে তৈরি বিদ্যুৎ ৭০ শতাংশ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। এপ্রিলে জর্জিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের দপ্তরে বসেছে ৩৬-টি প্যানেল। যার সাহায্যে প্রচলিত শক্তিতে তৈরি বিদ্যুতের ২০ শতাংশের ব্যবহার কমানো সম্ভব হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির পক্ষে সওয়াল করে আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের দূত সৈয়দ আকবরউদ্দিন জানান, ভারতের আর্থিক সহায়তায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে সৌর প্যানেল বসানো হবে। এর পাশাপাশি গাছগাছালি-সহ 'গ্রিন রুফ'-ও তৈরি করা হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১০ লক্ষ ডলার।

সম্প্রতি রাশিয়া সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ২০২২ সালের মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উৎসের মাধ্যমে (হাওয়া কল বা সৌর প্যানেল) ১৭৫ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করার লক্ষ্য নিয়েছে ভারত। বিশেষত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী নয়াদিল্লি। তিনি জানিয়েছেন, সৌর-ব্যাটারি তৈরির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হতে পারে ভারতকে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, সৌরশক্তিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হলে সৌর-ব্যাটারির চাহিদা বাড়বে।

সৌরশক্তি ব্যবহার নিয়ে মানুষকে উৎসাহী করতে ভারতে নানা রকম প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। যেমন, ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলা

হয়েছে। পিভি সিস্টেম বা ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর যে খরচ, তা ৩০ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। যদি কোনও বাড়িতে প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি সৌরশক্তি তৈরি হয় তাহলে তা বিক্রিও করে দেওয়া যাবে।

● **সুমেরু মহাসাগরের এক-তৃতীয়াংশ বরফ উধাও :**

এবছরের গ্রীষ্মে আর্কটিক (সুমেরু) মহাসাগরের উপরে ভাসা বরফের সাম্রাজ্য যেভাবে আকারে, আয়তনে ছোটো হয়ে গিয়েছে,তা চমকে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের। গলতে গলতে আর্কটিকের জলের উপরে থাকা বরফের স্তরের সাম্রাজ্যের চৌহদ্দিটা কমে পৌঁছেছে ১৬ লক্ষ বর্গমাইল বা ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটারে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যা সুমেরু মহাসাগরের উপরে থাকা বরফের স্তরের এক-তৃতীয়াংশ। ৪০ বছরে (সাতের দশকের শেষাশেষি থেকে) দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। সবচেয়ে বেশি কমেছিল ২০১২-য়। কিন্তু সে বছর সাইক্লোন হয়েছিল। এবার ওই সময় সাইক্লোন না হলেও, আর্কটিক তার বরফের এলাকা খুইয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে। শীতেও আগের মতো জমছে না আর্কটিক মহাসাগরের উপরে থাকা বরফের স্তর। এতদিন গরমকাল আর বসন্তে গলত মহাসাগরের উপরে ভেসে বেড়ানো বরফের স্তর। এখন ভরা শীতেও আর্কটিক মহাসাগরের উপরের বরফের স্তর দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছে। সুমেরুর ভয় পাওয়ানো শীতও আর্কটিকের উপরের জল স্তরকে আর জমিয়ে দিয়ে বরফ করতে পারছে না।

● **তিন ফুট বেড়ে যাবে সমুদ্রের স্তর :**

নিউ ইয়র্ক থেকে সাংহাই, উপকূলবর্তী শহরগুলো নিয়মিত বন্যার কবলে পড়বে। উত্তর মেরু ও নিকটবর্তী এলাকায় বরফ গলন ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পরে হিমালয় ও দক্ষিণ মেরুতেও হিমবাহ ও বরফের স্তর অত্যন্ত দ্রুতহারে গলে যাবে। সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মাছের ভাণ্ডার কমবে দ্রুতহারে, ফলে খাদ্য সংকট অবশ্যম্ভাবী। গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমনের এধরনেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব টের পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ সংক্রান্ত প্যানেলের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এই অশনিসংকেত রয়েছে। গত বছর অক্টোবরে রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্যানেলের প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে বড়ো জোর ২০৩০ পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। তার পরে ৩৬-টি দেশ থেকে একশো জনেরও বেশি বিজ্ঞানীকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। গত কয়েক মাসে দু'টি রিপোর্ট পেশ করেছেন তারা। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু সংক্রান্ত শীর্ষবৈঠকে তৃতীয় তথা চূড়ান্ত রিপোর্টটি পেশ করা হয়েছে।

পরিবেশবিজ্ঞানীরা বলছেন, বর্তমান হারেই যদি কার্বন গ্যাস নির্গমন চলতে থাকে, তাহলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রের জল স্তর তিন ফুটেরও বেশি বেড়ে যাবে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকায়, যেখানে আগে একশো বছরে একবার বন্যা হ'ত, সেখানে প্রতি বছরেই বন্যা হবে। বিপদে পড়বেন এইসব উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ৬৮ কোটি মানুষ। পৃথিবীতে যে কয়েকটি বরফের চাদরে (আইস শিট) ঢাকা অঞ্চল রয়েছে, তাদের মধ্যে ন্যতম গ্রিনল্যান্ড। যেটি ইতোমধ্যেই গলতে শুরু করেছে। গ্রিনল্যান্ডের বরফের চাদর যদি বেশি মাত্রায় গলে যায়, তাহলে চারপাশের জল স্তর কুড়ি ফুটেরও বেশি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরফ গলছে দুই মেরুতেও। উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফ গলনের হার সব থেকে বেশি।

প্রয়াণ

● **রবার্ট গেব্রিয়েল মুগাবে :**

শ্বেতাঙ্গ শাসন থেকে আফ্রিকার ছোট্টো দেশটিকে মুক্ত করতে যে মানুষ ১০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন, সেই মানুষই ক্ষমতায় এসে হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারী। সিঙ্গাপুরে জিম্বাবোয়ের সেই বিতর্কিত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রবার্ট গেব্রিয়েল মুগাবে প্রয়াত হলেন গত ৬ সেপ্টেম্বর। তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

জন্ম ১৯২৪ সালে। ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে ঘানায় একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মুগাবে। ১৯৬০ সালে রোডেশিয়ায় (জিম্বাবোয়ের পুরোনো নাম) ফেরেন শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়তে। ১০ বছরের কারাবাস মেলে তখনই। মুক্তি পেতেই লাগোয়া মোজাম্বিকে পালান। সেখানেই গেরিলা-যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেওয়া। অবশেষে মেলে জয়। ১৯৮০ সালে নির্বাচনে জিম্বাবোয়ের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন মুগাবে। প্রথম কয়েক বছর অর্থনৈতিক উন্নতি, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ সমস্ত কিছুর উপর নজর দেন তিনি।

এর পরেই শুরু বিতর্ক। আশির দশকের মাঝামাঝি জোশুয়ার নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তা দমনে তীব্র নৃশংসতার অভিযোগ ওঠে মুগাবের বিরুদ্ধে। এরই মাঝে ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্ট হন মুগাবে। প্রায় চার দশকের শাসনে কখনও নির্বাচেন রিগিংয়ের অভিযোগ, কখনও বিরোধীদের দমন করতে নির্বিচারে হিংসার ব্যবহার, সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গ্রেসকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী করার প্রাণপণ চেষ্টা। ক্ষমতা না ছাড়ার অদম্য চেষ্টা করে গিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত। তবে তাকে থামতেই হল স্বাভাবিক নিয়মে।

ক্ষমতায় থাকার জন্য নির্বাচনে রিগিং, নির্বিচারে হিংসা ও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর নৃশংসভাবে দমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জিম্বাবোয়ের এই 'মুক্তিদাতা'-র বিরুদ্ধে। সেই সূত্রে ক্রমেই নিজের দল 'জানু-পিএফ'-এও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন মুগাবে। ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে যখন একদা ঘনিষ্ঠ ও তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাঙ্গাগোয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করেন তিনি। সেটা ২০১৭ সাল। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ইস্তফা দিতে বাধ্য হন তিনি। তার পরেই ক্ষমতায় আসেন ম্যাঙ্গাগোয়া। তবে জিম্বাবোয়ের গঠনে এই বলিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গের অবদান ভোলার নয়।

● **জাক শিরাক :**

গত ২৬ সেপ্টেম্বর দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাক শিরাককে বিদায় জানাল ফ্রান্স। ৮৬ বছর বয়স হয়েছিল তার। ক্রমেই স্মৃতিশক্তি হারাচ্ছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা অ্যালঝাইমার্স বলে সন্দেহ করলেও, নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। কয়েক দশক বিস্তৃত রাজনৈতিক জীবনে দু'বার প্রেসিডেন্ট, দু'বার প্রধানমন্ত্রী এবং টানা ১৮ বছর প্যারিসের মেয়র ছিলেন তিনি। শুধু ফ্রান্স কেন, গোটা ইউরোপে তার মতো সফল রাজনীতিক খুব কম আছেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন শিরাক।

তবে তার আমলের সবথেকে আলোচিত অধ্যায় অবশ্যই ইরাক যুদ্ধ নিয়ে তার অবস্থান। আমেরিকাকে ইরাক অভিযানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়েছিল গোটা দেশ। সেসময় তার জনপ্রিয়তা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে

গিয়েছিল। তিনিই একমাত্র ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ইহুদি-নিধনে ফ্রান্সের ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাফল্যের আলো যতখানি, বিতর্কের আঁধার তার থেকে কিছু কম নয়। তিনি যখন আসন ছাড়েন, ততদিনে ফ্রান্স ঋণের বোঝায় ডুবে গিয়েছে। সমাজের সর্ব স্তর থেকে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। প্যারিসের মেয়র থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সে অভিযোগের একাংশ প্রমাণিতও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি।

● **রাম জেঠমলানী :**

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী রাম জেঠমলানী গত ৮ সেপ্টেম্বর মারা গেলেন ৯৫ বছর বয়সে। ছ'বার রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার এবং বাজপেয়ী সরকারে মন্ত্রীও হয়েছেন। রাম জেঠমলানীর জন্ম হয়েছিল তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সির সিন্ধ প্রদেশে, ১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। ৯৬ বছরের জন্মদিন পালন করতে আর মাত্র ৬ দিন বাকি ছিল। তার আগেই প্রয়াত হলেন। স্বাধীনতার আগে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ১৭ বছর বয়সে আইনের ডিগ্রি লাভ করেছিলেন জেঠমলানী। কিন্তু সাবালক না হওয়ায় প্র্যাকটিস শুরু করতে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় তাকে। স্বাধীনতার পরে বম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করা তরুণ জেঠমলানী নজর কাড়েন ১৯৫৯-এ সংবাদমাধ্যমে সাড়া ফেলা নানাবতী মামলায়। ইন্দিরা গান্ধী হত্যা মামলার অভিযুক্ত বলবীর সিং-কে বেকসুর খালাস করে আনতে পারলেও খেহর সিং-এর প্রাণদণ্ড আটকাতে ব্যর্থ হন তিনি। রাজীব হত্যা মামলার আসামি মুরুগনের হয়েও সওয়াল করেন আদালতে। সাম্প্রতিককালেও তাকে সংসদ হামলায় অভিযুক্ত আফজল গুরু এবং জেসিকা লাল হত্যার আসামি মনু শর্মার হয়ে আদালতে দেখা গিয়েছে।

● **আব্দুল কাদির :**

বিশ্ব ক্রিকেটে নক্ষত্র পতন। পাকিস্তানের কিংবদন্তি লেগস্পিনার আব্দুল কাদির আর নেই। ৬৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় তার। তার টপ স্পিন বোলিংয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন কাদির। ১৯৭৭-'৯০ পর্যন্ত মোট ৬৭-টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্টে তার মোট সংগৃহীত উইকেট ২৩৬। ১৯৮৩-'৯৩ পর্যন্ত মোট ১০৪-টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ১৩২-টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর পাকিস্তানের জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক হন। কাজ করেছেন ক্রিকেট কমেন্টেটর হিসেবেও। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে, তার প্রথম পাকিস্তান সফরের কাদিরের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন শচীন তেণ্ডুলকর। একটি ভেস্তে যাওয়া ওয়ান ডে ম্যাচে কাদিরের এক ওভারে চারটি ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রায়ান লারারও কাদিরের স্পিনের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছিল।

১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের লাহোরে তার জন্ম। পুরো নাম আব্দুল কাদির খান। পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম খেলতে আসেন ১৯৭৫-'৭৬ মরশুমে। হাবিব ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হয়ে শুরু তার ক্রিকেট সফর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন ১৯৭৭ সালে। ঘরের মাঠ লাহোরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। ড্র হয়ে যাওয়া ম্যাচে সেইভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি। ২২ বছরের কাদিরের প্রথম শিকার ইংল্যান্ডের বব উইলিস। টেস্টে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে ১৫ বার। ম্যাচে দশ উইকেট নিয়েছেন পাঁচবার। টেস্টে তার সেরা বোলিং ৫৬ রানে ৯ উইকেট। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৮৭ সালে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিজের এই রেকর্ড করেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে সেরা বোলিং ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ৪৪ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন সেদিন।

পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন পাঁচটি টেস্টে। যদিও সেই স্মৃতি সুখের ছিল না। পাঁচটির মধ্যে চারটি টেস্টেই হেরে যায় পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ১৯৯৩ সালে। যদিও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন ১৯৯০ সালে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলে। ২০০৮ সালে তাকে পাকিস্তানের মুখ্য নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মুম্বই হামলার ফলে বাতিল হয়ে যায় ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ। শ্রীলঙ্কার টিমবাসে সন্ত্রাসী হামলার জন্য খেলা হয়নি সেই সিরিজও। শেষ হয়ে যায় কাদিরের নির্বাচক হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসে।

● **মাধব আপ্তে :**

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাধব আপ্তে। তার বয়স হয়েছিল ৮৬। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গত ২৩ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের হয়ে সাতটি টেস্ট ম্যাচে ৫৪২ রান করেন আপ্তে। একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ। তার সর্বোচ্চ রান ছিল অপরাজিত ১৬৩। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আরও দাপট দেখিয়ে খেলে গিয়েছেন আপ্তে। ৬৭ ম্যাচে ৩,৩৩৬ রান। ছ'টা সেঞ্চুরি, ১৬-টি হাফ সেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১৬৫। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল আপ্তের। করেছিলেন ৩০ এবং অপরাজিত ১০। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মুম্বইয়ের অধিনায়কও ছিলেন। আপ্তের ক্রিকেট জীবনের একটি বিরল ব্যাপার হল তিনি ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত মুম্বইয়ের কাঙ্গা লিগে খেলে গিয়েছেন। যেখানে তিনি খেলেছেন শচীন তেণ্ডুলকরের বিরুদ্ধেও।

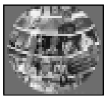

বিবিধ

● **ওয়ার্ল্ড স্কিলস, ২০১৯ :**

দেশবাসীকে গর্বিত করলেন মহারাষ্ট্রের শ্বেতা রতনপুরা। ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন থেকে প্রশিক্ষিত শ্বেতা যোগ দিয়েছিলেন ওয়ার্ল্ড স্কিলস, ২০১৯-এ। রাশিয়ার কাজানে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২২ থেকে ২৭ আগস্ট। এই প্রতিযোগিতায় থ্রি ডি গেম আর্ট, ওয়েব ডিজাইন, ওয়াটার টেকনোলজি, ফ্যাশন টেকনোলজি-সহ বিভিন্ন বিষয় থাকে। শ্বেতা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন গ্রাফিক ডিজাইন ক্যাটেগরিতে। এই প্রথম কোনও ভারতীয় মহিলা ওয়ার্ল্ড স্কিলস-এ পদক লাভ করলেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন মোট ৪৮ জন ভারতীয় প্রতিযোগী। তাদের হাত ধরে দেশে এসেছে ১৯-টি পদক। একটি সোনা, একটি রুপো এবং দু'টি ব্রোঞ্জ পদক। বাকিগুলি মেডেল অব এক্সেলেন্স। প্রতিযোগিতায় ৬৩-টি দেশ থেকে ১৩৫০ জনের বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান ১৩ নম্বরে। ২০১৭ সালে আবুধাবিতে এই প্রতিযোগিতায় মোট ১১-টি পদক নিয়ে ভারতের স্থান ছিল উনিশ নম্বরে। এবারের ওয়ার্ল্ড স্কিলস প্রতিযোগিতা ভারতের জন্য স্মরণীয় আরও একটি কারণে। তাহল এবছরই প্রথম এই মঞ্চে স্বর্ণপদক জয়ী হলেন কোনও ভারতীয়। ওয়াটার টেকনোলজি কনটেস্টে সোনা জিতেছেন ভুবনেশ্বরের অশ্বত্থ নারায়ণ।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

সরকারের একশ দিনের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করলেন শ্রী প্রকাশ জাভেড়কর

গত ৮ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভেড়কর দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর এই সরকারের প্রথম একশ দিনের মধ্যে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির খতিয়ান পেশ করেন। 'Jan Connect' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। উদ্বোধন করেন 'Furthering India's Development—100 Days of Bold Initiatives & Decisive Actions' শীর্ষক এক প্রদর্শনীর।

গত ৮ সেপ্টেম্বর। সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভেড়কর, দ্বিতীয়বার ক্ষমতার আসার পর এই সরকারের প্রথম একশ দিনের মধ্যে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির খতিয়ান পেশ করার ফাঁকে 'Furthering India's Development—100 Days of Bold Initiatives & Decisive Actions' প্রদর্শনীতে। সঙ্গে উপস্থিত আছেন প্রেস ইনফর্মেশান ব্যুরোর প্রধান মহানির্দেশক (সংবাদ মাধ্যম ও জ্ঞাপন), শ্রী সিতাংশু কর।

'Jan Connect'-এ উল্লিখিত কৃতিত্বগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল :

- জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখের সাধারণ মানুষের উন্নতিকল্পে **৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল;**
- **ভারতকে ৫ লক্ষ কোটির অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া পদক্ষেপ;**
- **সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কের ঐতিহাসিক সংযুক্তিকরণ** এবং এক্ষেত্রে টাকার জোগান বাড়ানো; ব্যাঙ্ক নয় এমন ঋণদানকারী সংস্থা ও গৃহ ঋণ প্রদানকারী সংস্থার জন্য সাহায্য; রেপো রেট-এর সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে গাড়ি-বাড়ির জন্য ঋণের ইএমআই-এর অঙ্ক কমানো; পরিকাঠামোর জন্য ঋণ;
- **ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য**-এর জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সামাজিক দায়বদ্ধতা) সংক্রান্ত নিয়মকানুনে নমনীয়তা; কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা; দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদের মূলধনী লাভের ওপর বার্ধিত অধিভার থেকে রেহাই; ক্রেতার সুবিধা; অতিক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ;
- **স্টার্ট আপের জন্য উৎসাহদান;** কর ব্যবস্থার সরলীকরণ; শ্রম আইন; পরিবেশগত ছাড়পত্র; কর্পোরেট বিষয়ক পদক্ষেপ; ভারতে বন্ডের বাজারের প্রসার; আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় সংস্থার প্রবেশ; কর্পোরেট করে হ্রাস; বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতির পর্যালোচনার জন্য সায়; কোম্পানি (সংশোধনী) আইন, ২০১৯; বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সংশোধনী) আইন, ২০১৯;
- **গাড়ি শিল্পের জন্য উৎসাহদান;**
- **মজুরি বিধি বিল, ২০১৯;** মজুরি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা; মহিলাদের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা;
- **সমাজের সর্বশ্রেণির জন্য সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ** যার মধ্যে অন্যতম তিন তালাক বিরোধী আইন; পকসো আইনের সংশোধনী; রূপান্তরকামী ব্যক্তি (অধিকারের সুরক্ষা) বিল, ২০১৯ ইত্যাদি;
- **উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের উন্নতিকল্পে নানা পদক্ষেপ;**
- **কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে পদক্ষেপ;**
- **জল সুরক্ষার নিমিত্তে জল শক্তি মন্ত্রক গঠন;** 'হর ঘর বিজলি যোজনা'; রান্নার গ্যাসের সংযোগের জন্য উজ্জ্বলা প্রকল্প; আয়ুষ্মান ভারত; 'জন ভাগিদারি' আন্দোলন; 'ফিট ইন্ডিয়া' এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অভিযান ইত্যাদি;
- **সুষ্ঠু প্রশাসন** সুনিশ্চিত করতে নেওয়া পদক্ষেপ;
- **উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর;**
- আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার;
- সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ওপর জোর;
- বিশ্ব দরবারে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব; প্রতিবেশি দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি 'নেবারহুড ফার্স্ট পলিসি';
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষমতায়ণ ইত্যাদি।❑

রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের হাতে তুলে দেওয়া হল ‘দ্য রিপাব্লিকান এথিক’ (খণ্ড-২) ও ‘লোকতন্ত্র কে স্বর’ (খণ্ড-২)-এর প্রথম কপি

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অমিত খারে ও প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ড. সাধনা রাউতের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের হাতে তুলে দিচ্ছেন তারই নির্বাচিত ভাষণের ওপর দু’টি বই—‘দ্য রিপাব্লিকান এথিক’ (খণ্ড-২) ও ‘লোকতন্ত্র কে স্বর’ (খণ্ড-২)।

গত ৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব শ্রী অমিত খারে ও প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক ড. সাধনা রাউতের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জাভড়েকর মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দের হাতে তুলে দিলেন তারই নির্বাচিত ভাষণের ওপর দু’টি বই—‘দ্য রিপাব্লিকান এথিক’ (খণ্ড-২) ও ‘লোকতন্ত্র কে স্বর’ (খণ্ড-২)-এর প্রথম কপি। এই বই দু’টির প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত প্রকাশন বিভাগের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন এদিন।

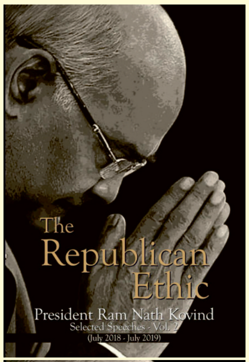

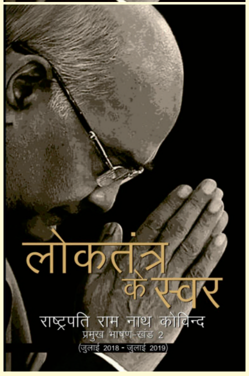

সময়ের মধ্যে এই নান্দনিক বিন্যাসে বই দু’টি প্রকাশ করার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ও প্রকাশন বিভাগকে সাধুবাদ জানান। শ্রী জাভড়েকর রাষ্ট্রপতিকে জানান যে বিশেষত অল্পবয়স্ক পড়ুয়াদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই বইগুলি ই-বুক আকারে অ্যামাজন ও গুগল প্লে-তেও পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রপতির দপ্তরে তার দ্বিতীয় বর্ষ চলাকালীন দেওয়া ভাষণগুলি সংকলিত আছে ‘দ্য রিপাব্লিকান এথিক’ ও ‘লোকতন্ত্র কে স্বর’ দ্বিতীয় খণ্ডে। এই খণ্ডে ৯৫-টি করে ভাষণ সংকলিত আছে, যা ভাগ করা হয়েছে আটটি শ্রেণিতে। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর ওপর একটি বিশেষ বিভাগের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগগুলি হল ‘অ্যাড্রেসিং দ্য নেশান’, ‘উইন্ডো টু দ্য ওয়ার্ল্ড’, ‘এডুকেটিং ইন্ডিয়া’, ‘একুইপিং ইন্ডিয়া’, ‘ধর্মা অব পাবলিক সার্ভিস’, ‘অনারিং আওয়ার সেন্টিনেলস’, ‘স্পিরিট অব দ্য কনস্টিটিউশান অ্যান্ড ল’ এবং ‘অ্যাকনলেজিং এক্সিলেন্স’।

প্রজাতান্ত্রিক মূল্যবোধে অন্তর্নিহিত ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার ও আত্মা, বৈচিত্র্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মাননীয় রাষ্ট্রপতির কথায় লিপিবদ্ধ হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে এই খণ্ডগুলি মারফত। মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের সংকলনের প্রকাশক হিসেবে প্রকাশন বিভাগ গর্বিত। এই বইগুলির প্রথম খণ্ডগুলিও তারাই প্রকাশ করে।

ক্রয় করতে আসুন আমাদের ঠিকানায় : ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯ (এসপ্ল্যানেড পোস্ট অফিস বিল্ডিং-এর এক তলায়)। অনলাইন কিনুন www.publicationsdivision.nic.in ও www.bharatkosh.gov.in থেকে; ই-বুক Amazon ও Google Play-তে উপলব্ধ।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

October, 2019
R.N.I. No. 19740/69

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের প্রধান মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।